কামনা বাসনা

কামনা বাসনা

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক
সাহিত্যশ্রী
৭৩, এম. জি. রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৭০

☐ লেজার টাইপ সেটিং
লেজার কাম্পাস
১ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩

☐ মুদ্রক : নিউ প্রিন্টার্স
১১২/১২ বেলেঘাটা মেন রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১০



খ্যাতনামা শিল্পপতি ঘনশ্যাম ঘোষাল, শিল্পগগনের উদীয়মান তারকা সনাতন সান্যাল ও তাঁদের বন্ধু হারাধন ওরফে হুটকো হালদারকে নিয়ে এবারের গল্প কামনা-বাসনা।

এই গল্পের নাম 'বিত্তবিভ্রাট' হতে পারতো। কিন্তু হারাধনবাবুর মতে, বাসনা থেকেই যত বিভ্রাট এই পৃথিবীতে। ঘনশ্যাম ঘোষালের কর্মজীবনের আদি পর্ব ও সনাতন সান্যালের বৈচিত্র্যময় জীবনের দ্বিতীয় পর্ব সম্বন্ধে যথাসময়ে আমাদের অনেক কথা নিবেদন করতে হবে পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্যে। কিন্তু এঁদের জীবনের গোড়ার কথা না-জানলে হুটকোর ভূমিকাও আমরা ঠিক বুঝতে পারবো না। কারও ধারণা হবে না, হুটকোর মতন কিছু মানুষ এ-সংসারে নিজের খেয়ালে বিচরণ না করলে এই পৃথিবী কত বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠতো।

হুটকোর কথা প্রথমেই এইভাবে আসছে বলে এবং হুটকো চিরদিনই কামিনী প্রভাবমুক্ত সাধক মহাপুরুষদের জয়গান গেয়েছেন বলে অযথা ভয় পাবেন না বা চিন্তিত হবেন না—আমাদের এই কাহিনী শেষপর্যন্ত স্ত্রীভূমিকা বর্জিত থাকবে না। গল্প শুরুর অনেক আগেই একালের প্রত্যেক লেখকই জানেন, কামিনীর স্পর্শ না ঘটলে কোনো কাহিনী মনোগ্রাহী হয় না।

এবারের কাহিনীর নানা পর্যায়ে যেসব জাঁদরেল মহিলা স্বমহিমায় আবির্ভূতা হবেন তাঁদের মধ্যে রয়েছে বিভাবতী, অচলা, বিভাবরী ইত্যাদি। এই তিন মহিলাই যে অসামান্য রূপবতী এবং কেউ কেউ যে বিশেষ ভাগ্যবতী ও গুণবতী তাও আগাম জানিয়ে দিচ্ছি। পারিবারিক প্রতিষ্ঠা, নিজেদের দেহসৌন্দর্য ও কোষ্ঠীর জোরে বিভাবতী ও অচলা যে যোগ্য পাত্রে অর্পিতা হয়েছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁরা যে বর্তমানে বিপুল বিক্রমে গৃহলক্ষ্মীর স্বর্ণসিংহাসনে আরোহণ করে দুইজন শক্তিমান পুরুষের অগ্রগতিতে অসামান্য ভূমিকা পালন করছেন তাও এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল।

কৌতূহলী পাঠকের অবগতির জন্যে আরও জানাই, শ্রীমতী বিভাবতী ঘোষাল কিছুদিন আগে শানাজ খামবাট্টার উর্বশী ক্লিনিকে নিয়মিত যাতায়াত করে বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সুখী শরীরকে কিছুটা সীমায়িত করেছেন। খামবাট্টার স্বহস্তে সংস্কৃত এই ক্ষীণতনুটিকে দেখেই সহাস্য ঘনশ্যাম ঘোষাল মন্তব্য করেছিলেন, "পুঁটু তুমি একলাফে পঁচিশ বছর পিছিয়ে গিয়েছো। ঠিক যেমন দেখতে ছিলে বিয়ের সময়। এর জন্যে উর্বশী ক্লিনিকের মিসেস খামবাট্টা আমার কাছ থেকে এক লাখ টাকা চার্জ করলেও সেটা বেশি হতো না।"

যথাস্থান থেকে পেলব শরীরের প্রশস্তি হলে ধর্মপরায়ণা সাধ্বী রমণীরাও বিশেষ পুলকিত বোধ করেন। বলা বাহুল্য বিভাবতী ঘোষাল স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে প্রশংসা গ্রহণ করেও স্বামীদেবতাকে মৃদু তিরস্কার জানিয়েছিলেন, "আজকালকার ছেলেরা বিয়ের পরে স্ত্রীকে নিয়ে কতো আমোদ-আহ্লাদ করে। তোমার ঘটে তো সেসব কোনোদিন হয়নি। বাবা-মায়ের ভয়ে তুমি তো বিয়ের পরে সিঁটকে থাকতে, বিজনেস ছাড়া কোনো মন্তর বাবার কাছে শিখলে না। ঘরে যে একটা বিয়ে-করা বউ রয়েছে তাও মাথার মধ্যে থাকতো কি না সন্দেহ!"

ঘনশ্যাম ঘোষাল মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, "রামকৃষ্ণদেব ছাড়া এমন কোনো বিবাহিত বাঙালি জন্মগ্রহণ করেননি যিনি গৃহিণীর গঞ্জনা সহ্য করেননি!"

"রাখো ওসব কথা !" ঝপ করে স্বামীকে থামিয়ে দিয়েছেন বিভাবতী দেবী। "আমার স্পোকেন ইংলিশ টিউটর মিস জুডিথ পিটার সেদিন পড়াচ্ছিলেন, হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে।" ইদানীং মাসিক মাইনে দিয়ে স্পোকেন ইংলিশ টিউটর রেখেছেন বিভাবতী। যা যুগের হাওয়া তাতে নারীকে দশভুজা, দশপ্রহরণধারিণী ও সর্বগুণান্বিতা হতে হবে স্বামীর নিত্যপ্রয়োজনে।

ঘনশ্যাল ঘোষাল প্রতিবাদ জানালেন। বিনীতভাবেই স্ত্রীর কাছে নিবেদন করলেন, "বিলিতি মেমসায়েবরা ভীষণ একরোখা হয় ! আমাদের এখানে স্বয়ং গদাধরও বলেছেন, যত মত তত পথ ! কিন্তু পুঁটু, তুমি ভালভাবেই জানো, সেসময়ে তোমার সঙ্গে অনেক সময় কাটানোর কোনো সুযোগ আমার ছিল না। শাশুড়ির ভয়ে তুমি ভোর পাঁচটায় ইষ্টদেবতার সেবার জন্যে স্বামীর বিছানা ছেড়ে চলে যেতে। আর বিজনেসম্যান বাবার অর্ডারে বিজনেস থেকে রাত ন'টার আগে বেরুবার কোনো উপায় আমার ছিল না। গদিতে প্রত্যেক দিনের ক্যাশ ছেলেকে গুনতে হতো। জীবনের শেষ কয়েক বছর বাবা টাকা স্পর্শ করতেন না। ঠাকুর স্বপ্নে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু কারেন্সি নোটের সম্পর্ক ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না—তাই কাঞ্চন স্পর্শের সুযোগটা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিয়ম বাঁচিয়েছিলেন।

"অশেষ ভাগ্যবান ছিলেন বাবা, স্বয়ং ঠাকুর স্বপ্নে নির্দেশ দিয়েছিলেন," বললেন শ্বশুরগর্বে গরবিনী বিভাবতী।

ঘনশ্যাম হাসলেন। পুরনো দিনের কথা মনে পড়লো—স্বপ্ন পেয়ে বাবা সেবার ভীষণ মুষড়ে পড়েছিলেন। আসলে ঠাকুর হয়তো চেয়েছিলেন, এবার কাঞ্চনে অনুরাগ কমাও, লাভলোকসান থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে দূরে সরিয়ে নাও। কিন্তু ওই যে বলেছে, হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে। বাবা শেষপর্যন্ত বড় ট্যাংরা চাটুজ্যের সঙ্গে জরুরি পরামর্শ করলেন। বাবার বাল্যবন্ধু এবং অ্যাটর্নি। ট্যাংরা অঞ্চলে ওঁদের অনেক বিষয়-সম্পত্তি ছিল বলে সবাই ট্যাংরা চাটুজ্যে বলে ডাকতো--বাপকে সবাই বলত বড় ট্যাংরা এবং তাঁর ছেলেকে ছোট ট্যাংরা। ছোট ট্যাংরাও আইনবিদ

এবং তখন নেহাত ছোট। যথাসময়ে তিনি অ্যাটর্নিপাড়ায় বাবার সুযোগ্য সহকারী হিসেবে অনেক অর্থ উপার্জন করেছেন।

বড় ট্যাংরা চাটুজ্যে তাঁর প্রিয় মক্কেলের প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দেননি। পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা চিন্তা করে, নানা বইপত্তর ঘেঁটে বাবাকে বলেছিলেন, "সুখবিলাস, তুমি আমাকে ফ্যাসাদে ফেলে দিলে। স্বয়ং ঠাকুর যখন স্বপ্ন দিয়েছেন তখন তোমাকে কাঞ্চনের স্পর্শ এড়াতেই হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে পৈতৃক ব্যবসায়ও তোমাকে রক্ষে করতে হবে। সুতরাং তুমি এবার রসদদার থেকে পাহারাদার হও, টাকার বাক্স সামলাতে গদিতে বসুক তোমার ছেলে। ঘনশ্যামই কারবারের ক্যাশটা নিজের হাতে সামলাক।"

বড় ট্যাংরা চাটুজ্যের ব্রিলিয়ান্ট বুদ্ধি পেয়ে পিতৃদেব সুখবিলাস ঘোষাল আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলেন। ঝট করে ট্যাংরা চাটুজ্যেকে তিনি প্রণাম করেছিলেন।

সেই থেকে সুখবিলাসের একমাত্র পুত্র ঘনশ্যাম ঘোষাল এতো বছর ধরে যে কত টাকার বান্ডিল গুনেছেন তার হিসাব নেই। লক্ষ লক্ষ টাকার নোট স্বহস্তে চেক করেছেন আর ঘনশ্যাম ভেবেছেন, ঘাড়ের ওপর চাপলে টাকা জিনিসটাও মোটেই আকর্ষণীয় থাকেনা। টাকা গুণে নেবার মধ্যে কোনো নাটকীয়তা নেই, হিন্দুস্থানের সব ছাপা নোট ঠিক একরকম দেখতে। কোথাও কোনো পার্থক্য নেই।

বাড়িতে বহু আশা নিয়ে নববিবাহিতা পুঁটু তখন সেজেগুজে স্বামীর জন্যে বসে আছে, আর বড়বাজারের গদিতে সমাসীন ঘনশ্যাম দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর সামনে আরও গোটা তিরিশেক নোটের বাণ্ডিল গণনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

টাকার পাহাড় দেখে চঞ্চল হয়ে উঠতেন ঘনশ্যাম। সন্ধ্যা সাড়ে-আটটার পরে ক্যাশ মিললে, ফতুয়ার পকেট থেকে সেফ ভল্টের স্পেশাল সাইজের জোড়া চাবিটা পিতৃদেব সুখবিলাস ঘোষাল ছেলের দিকে ছুড়ে দিতেন।

পৃথিবীতে যতরকম অশুভ শক্তি আছে—বার্গলার, ফায়ার, হ্যামার—সব থেকে ঘোষাল পরিবারকে দিনরাত রক্ষে করার জন্যে তৈরি হয়েছে

এই স্পেশাল বিলিতি সেফ। 'সেফ' মানেই তো নিরাপত্তা, যার ধন তার কাছেই যাতে থাকে তার জন্য সেই কোন যুগ থেকে বিলিতি কোম্পানির চিব সায়েব এই আলমারি বানিয়ে চলেছেন। এই আলমারি ছাড়া ধনতন্ত্র নিরর্থক। সকালে ও রাত্রে ঘনশ্যাম এই সেফকে নিয়মিত প্রণাম করতেন, আর ভাবতেন, এই সেফ ভাগ্যে কলকাতায় এসেছে, না হলে বড়বাজারের ব্যবসাদারদের ছেলেরা বাড়িই ফিরতে পারতো না। কর্তাদের নির্দেশে রাত জেগে তাদের যখের ধন পাহারা দিতে হতো এই রাজা উডমন্ট স্ট্রিটে। রাতেও দেখা হতো না গুণবতী বিভাবতীদের সঙ্গে।

তর্কাতর্কির প্রশ্নও উঠতো না। কারণ ঘনশ্যামের মা প্রিয়ংবদাদেবী প্রায়ই বলতেন, "ব্যবসাদারের বউকে অনেক কষ্ট স্বীকারের জন্যে তৈরি থাকতে হয়, বউমা। না-হলে মালক্ষ্মী তোমার ঘরে বাসা বাঁধবেন কেন ? ওঁর তো ঘরের তো অভাব নেই এদেশে।"

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিভাবতীর। যুবতী বয়সে মাঝেসাঝে অধৈর্য হয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করতেন, "স্রেফ টাকার বাণ্ডিল গুনতে গুনতেই একটা মানুষকে কাহিল হয়ে পড়তে হবে কেন ?"

তবুণ ঘনশ্যাম ঘোষাল তখন উদ্ভিন্নযৌবনা স্ত্রীকে নিজের শরীরের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বলতেন, "এ শহরে যার টাকা আছে তার শত্রুর শেষ নেই পুঁটু। ব্যবসায়ীকে ঠকাবার জন্যে সারা দুনিয়া তৈরি হয়ে আছে। যদি কেউ বুঝতে পারে কর্তার ছেলে সাবধানে বাণ্ডিল গুনবে না তা হলে আরও ঠকাবে—প্রতি বাণ্ডিলে অনেক কম টাকা থাকবে।"

বিভাবতী অত সহজে দমবার পাত্রী তখনও ছিলেন না। তাঁর দাদু দীনবন্ধু ব্যানার্জি স্বয়ং সায়েববাড়িতে বেনিয়ন ছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ পর্ব সম্বন্ধে বিভাবতী তাঁর মায়ের কাছে অনেক গল্প শুনেছে।

বিভাবতী তাই সুযোগ পেয়েই স্বামীকে বড় ঘরের বড় কথা শুনিয়ে দিয়েছেন : "সায়েবরাও তো বিজনেস করে, কিন্তু তাঁরা কখনও নিজের হাতে টাকা গোনেন না, লক্ষ্মী তো তাঁদের ছেড়ে যান না। দীনু ব্যানার্জি বলতেন যতদিন চন্দ্রসূর্য উঠবে ততদিন এই দেশে সায়েবরা থাকবেন—যাবৎচন্দ্রদিবাকর।"

সেবার বোকার মতন পিতৃদেব সুখবিলাসকে এই প্রশ্ন রিলে করেছিলেন ঘনশ্যাম ঘোষাল। ছেলের মুখে এ ধরনের প্রশ্নটা বাবার মোটেই ভাল লাগেনি। তাও তো তিনি জানতেন না, এই প্রশ্নের মূলে রয়েছে স্বামীসান্নিধ্যকামিনী আঠারো বছরের একটি মেয়ে।

সুখবিলাস তখন গদিতে বসে একটা থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে গুনতেন, তবে টাকা নয় জপের মালা। টাকা না ছুঁলে কী হয়, জপমালার মাধ্যমে নোটের বান্ডিলের হিসেব রাখতেন দূর থেকে, কুড়ি-পঁচিশটা বান্ডিল জড়ো হলেই ফতুয়া থেকে চাবি বার করে ছেলেকে নির্দেশ দিতেন, "পুরে রাখ। কাঁচা টাকায় বাইরের হাওয়া বেশি লাগাতে নেই হ্যাদা।"

হ্যাদা শব্দটির আদিতে রয়েছে হৃদয়, যা এই ঘনশ্যামের রাশি নাম। হ্যাদা তখন বাবার সুগোল মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। বাবা বলছেন, "টাকা হচ্ছে আতরের মতো। হাওয়া খাইয়েছো তো মরেছো—কখন হুশ করে সব উবে যাবে বুঝতেই পারবে না!"

সেবার হ্যাদা ঘোষাল তখন গদিতে বসে তুফান মেলের স্পিডে হাত চালিয়ে যাচ্ছেন। নোটগুলো ফরফর করে তাঁর হাতে মধুর স্পর্শ লাগিয়ে হাতের তলায় চলে যাচ্ছে—হিসেবে ভুল হবার কোনো উপায় নেই। জাল নোট ছুঁলেই বুঝতে পারতেন সুখবিলাস! দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের কারেন্সি নোট ছোঁবার উপায় ছিল না, হাত বেঁকে যেতো। আর সুখবিলাসের ঠিক উল্টো, ভাল নোটে শরীরের অমঙ্গল হয় না। কিন্তু জালনোট স্পর্শ করলেই আঙুলের মধ্য দিয়ে শরীরে কী একটা বিদ্যুৎধারা প্রবাহিত হতো। এই স্পর্শশক্তি পেতে গেলে সাধনা করতে হয়। ছেলেকে সে গুপ্তবিদ্যা দিতে চেয়েছিলেন সুখবিলাস ঘোষাল। কিন্তু রাত্রি আটটার সময় পুঁটুর মুখটা স্মরণ করলেই নোটের বান্ডিলের প্রতি টান কমে যেতো ঘনশ্যামের। টাকায় কেন মানুষের অরুচি হয় তা যেন কিছুটা বুঝতে পারতেন বিভাবতীর তরুণ স্বামী।

বাপের মুখের ওপর কথা বলার কালচার নেই হাওড়ার এই ঘোষাল বংশে।

অনেকদিন পরে বন্ধু হুটকো হালদারের কাছে ঘনশ্যাম শুনেছিলেন, "যতো বড়লোক ততো বিনয়, বুঝলে ঘনশ্যাম। বড়লোকের ছেলে সাধারণত কম বয়সে বাবার মুখের ওপর কথা বলে না। সে তো জানে পিতৃদেবের টু-পাইস শেষ পর্যন্ত কার কাছে যাবে তা নির্ভর করছে তাঁর মেজাজ এবং মর্জির ওপর। বড়লোক বাবার ওপর বংশধরের যত তম্বিগম্বি সব জীবন নাটকের শেষ অঙ্কে, বাবা তখন বিছানায়, তাঁর শেষযাত্রার জন্যে কোথায় ভাল অথচ হাল্কা খাট পাওয়া যায় তার খোঁজখবর গোপনে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।"

"গরিবের ওসব হাঙ্গামা নেই," বলেছিলেন হুটকো হালদার। "গরিবের তো জন্মাতে ধার, অন্নপ্রাশনে ধার, বিয়েতে ধার, মরতে ধার, গয়ায় বাপের পিণ্ডি দেবার সময় ধার। টাকা বানাবার কথা মাথায় রেখে গরিব তেমন কোনো কাজ করে না, তাই যে কোনো কাজে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, বুঝলে ঘনশ্যাম।"

ঘনশ্যাম সেবার দেখেছেন সাঁঝের কলকাতায় রাজা উডমান্ট স্ট্রিটে ঘড়ির কাঁটা পৌনে নয়তে পৌঁছেছে। সুখবিলাস তখন পুত্রকে বলছেন, "সায়েবদের কথা যখন তুললে তখন শুনে রাখো, ওদের পিছনে স্বয়ং রাজলক্ষ্মী রয়েছেন। কিন্তু যে ভাবে ওরা সুখের পিছনে এবং ভোগের পিছনে পাগলের মতন ছুটছে, তাতে শেষপর্যন্ত ওদের কিছু থাকলে হয়। টাকার বাণ্ডিল নিজের হাতে না গোনবার ফল ওরা হাতে-হাতে পাবে—ওদের সব ঐশ্বর্য হাতছাড়া হবে। তুমি দেখে নিও, এই কলকাতা শহরে একটা সাহেবি দোকানও থাকবে না।"

বাবার ভবিষ্যদ্বাণী শেষপর্যন্ত কড়ায়গণ্ডায় ফলে গিয়েছে! সারা কলকাতায় সায়েবদের দোকান এখন একটাও নেই। হাওড়াতেও নেই। অথচ একসময় অনেক ছিল।

রাজলক্ষ্মীর বাড়তি প্রশ্রয় ছাড়া ইংরেজ যে ব্যবসা করতে অক্ষম ইতিহাস তা প্রমাণ করে দিয়েছে ঘনশ্যাম ঘোষালের চোখের সামনে।

তবে একটা ব্যাপারে এখনও দুঃখ লাগে ঘনশ্যামের—সায়েবদের

স্মৃতিজড়িত ব্যবসাগুলোতে ওঁদের স্মৃতিটুকু সামান্য রক্ষে করলে মন্দ হতো না। এই কাজটা নতুন প্রজন্মের স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আদৌ করেননি। আসলে, টাকা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে ভাববার সময় নেই এ যুগের বিজনেসম্যানের। টাকা ভীষণ জিনিস, আসলেও মুশকিল, না-আসলেও মুশকিল। থাকলেও মুশকিল, না-থাকলেও মুশকিল। দক্ষিণেশ্বরের ওই পুরোহিত ভদ্রলোক টাকা স্পর্শ না করেও টাকার মোদ্দা কথাটা বুঝে গিয়েছিলেন। ওই যে তিনি বলেছিলেন, টাকা হলো গেরস্তর বুকের রক্ত।

ঘনশ্যাম কোথায় যেন একবার টাকার জয়গান শুনেছিলেন। অর্থ হলো পেট্রোল অফ লাইফ। ট্যাঙ্কে ওই জিনিস না থাকলে দুনিয়ার কোনো গাড়ি সচল থাকবে না। সাধু, সন্ন্যাসী, বৈরাগী তো দূরের কথা, স্বয়ং দেবতারাও অচল উইদাউট মানি। আমেরিকানরা বলে গ্রিনব্যাক, বাবা বলতেন ছোটপাত্তি, বড়পাত্তি। দুনিয়ার কত লোক কত নাম দিয়েছে এই নোটের বাণ্ডিলকে।

ঘনশ্যাম সেবার আরও হেসেছিলেন হুটকো হালদারের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে।

বন্ধু হুটকো সেবার বলেছিলেন, "বুঝেছো ঘনশ্যাম, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের টাকার ওপরে আদৌ রাগ ছিল না! তাঁর রাগ ছিল টাকার অপব্যবহারের ওপর। সবটা নির্ভর করছে, টাকাটা কী ভাবে রোজগার হয়েছে তার ওপর—অথচ টাকার ওপর তো ভালমন্দের ছাপ দেওয়া থাকে না। পুরোহিতের নোট আর কসাইয়ের কারেন্সি নোটের মধ্যে তো কোনো পার্থক্য নেই। তবে পরমহংসদেবের গভীর সন্দেহ ছিল উকিলের ওপর, ডাক্তারের ওপর, দালালের ওপর—এবং এঁদের রোজগার করা নোটের ওপর। এখন বেঁচে থাকলে ঠাকুর নিশ্চয় মতামত কিছুটা পরিবর্তন করতেন। সব রাগটা বেচারা উকিল এবং ডাক্তারের ওপর পড়তো না।"

"আর দালাল?" ঘনশ্যাম রসিকতা করে ইস্কুলের পুরনো বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

কম বয়সে হুটকো হালদার বলতেন, "বিশ্বসংসারে দালালেরও দরকার

আছে, ঘনশ্যাম। দালাল না থাকলে দুনিয়ার অনেক কাজ আটকে যেতো স্রেফ যোগাযোগের অভাবে ! দালাল কথাটা কেমন করে যে বাংলায় নোংরা হয়ে গেলো তা ভগবানই জানেন। অথচ দালাল তোমাকে একটা স্পেশাল সার্ভিস দিচ্ছে। আমি বিলিতি দালাল কোম্পানিতে কাজ করেছি, বুঝেছি, উইদাউট দালাল আমাদের এই পৃথিবী অচল। ওর আসল বাংলা হলো ঘটক—অঘটনই বলো, ঘটনাই বলো, ঘটকের প্রয়োজন রয়েছে সৃষ্টির পদে পদে। বৈজ্ঞানিকরাও তাই ক্যাটালিস্ট বলে একটা শব্দ ঘরে তুলেছেন, যার বাংলা হলো অনুঘটক।"

কী আশ্চর্য, টাকা গোনার ধৈর্য না থাকলে বিজনেসে কী অঘটন ঘটতে পারে তা পিতৃমুখে শ্রবণ করেও ঘনশ্যামের মনের সন্দেহ কাটতো না।

তার কারণ বোধ হয় বিভাবতী। ওইটুকু মেয়ে তখনই বলেছিল, "যাই বলো সায়েবরা তোমাদের থেকে অনেক এগিয়ে যাবেন। ওঁরা যদি বিজনেস না বুঝতেন তা হলে দুনিয়াজোড়া ব্যবসা ফাঁদতে পারতেন না।"

ঘনশ্যামও তখন নিজের মনে হিসেব করতে বসেছিলেন, সায়েবের ব্যবসার সঙ্গে তাঁদের বিজনেসের কোথাও একটা পার্থক্য রয়ে গিয়েছে।

"তুমি বলছো, সায়েবরা পাল্টাচ্ছে ?" জিজ্ঞেস করেছেন বিভাবতী সেই কতদিন আগে।

ঘনশ্যাম উত্তর দিয়েছিলেন, "সময়ই সব পাল্টে দিচ্ছে, পুঁটু। শুধু সায়েবরা পাল্টাচ্ছে না, আমরাও সময়মতো পাল্টে যাবো।"

পুঁটু ম্যাট্রিকে পাশ করে কলেজে কিছুদিন পড়েছে। পড়াশোনায় বেশ ভাল ছিল। লেগে থাকলে অনেক দূর যেতে পারতো। ঘনশ্যামের ঠিক উল্টো ; ইস্কুল কলেজে ছাত্রাবস্থায় পড়ার বইতে তেমন টান ছিল না। বি এ পরীক্ষা দেবার পরেই অদ্ভুত স্বপ্নাদেশ পেয়ে বাবা টেনে নিলেন ছেলেকে দৈনন্দিন ব্যবসায়। ওপর থেকে ওপরওয়ালার কী নির্দেশ এসেছিল তা ঘনশ্যাম বুঝতে পারেননি। শুধু জানলেন, স্বপ্ন দেখার পরে পিতৃদেব তাঁর গৃহিণীর সঙ্গে নিভৃত আলোচনা করেছিলেন।

এই স্বপ্নটপ্নে তখন বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না ঘনশ্যামের। মাকে বলেও ফেলেছিলেন, "ঠাকুর শুধু বাবাকেই নির্দেশ দেন কেন? কই আমি তো কখনও কোনো ঠাকুরের সঙ্গে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কথা বলি না।"

মা প্রিয়ংবদা জিভ কেটেছিলেন। "ছিঃ বাবা! ওরকম কথা মুখে আনতে নেই। তুই হবার আগে আমি কেষ্টঠাকুরের স্বপ্ন পেয়েছিলাম, তাই শাক্ত বংশের ছেলে হয়েও তোর নাম রাখা হলো ঘনশ্যাম।"

"তুমি কি বলতে চাইছো, হাওড়া কাসুন্দেতে কার কী নাম হবে এবং হবে না তা নিয়ে ঠাকুরেরা স্বর্গে বসে বসে সারাক্ষণ মাথা ঘামাচ্ছেন?"

মায়ের মন নরম হয়নি। তিনি বলেছেন, "নিশ্চয় হয়, না হলে তোর নাম কালিকাপ্রসাদ না হয়ে ঘনশ্যাম হলো কেন?"

আর তর্ক বাড়ানো যায়নি। স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী ঘনশ্যাম ঘোষাল বাবার বিজনেসে বেরুতে শুরু করেছিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া তাঁর হলো না।

প্রথমে একটু আপত্তি ছিল, কিন্তু ক্রমশ সব বাধা ও দ্বিধা সওদাগিরি কাজের স্রোতে ভেসে গেলো। বিজনেসের গভীরে ঢুকে পড়লেন ঘনশ্যাম।

বাবা বলতেন, "বিজনেসের মতন জিনিস নেই, হ্যাদা। ক্যাশ বাক্সর সামনে বসে ঠিকমতন নজর খুলে রাখলে তোর বিশ্বরূপদর্শন হয়ে যাবে। গয়াগঙ্গা কাশী কাঞ্চি দর্শনের প্রয়োজন হবে না।"

চুপ করে সব কথা শুনেছেন ঘনশ্যাম ঘোষাল। বাবা সুখবিলাস বলেছেন, "বিজনেসটা হলো মন্দিরের পুজোর মতন। স্বয়ং লক্ষ্মী এখানে গণেশের সঙ্গে অবস্থান করছেন। তুমি-আমি সামান্য সেবায়েত মাত্র। মন্দির যেমন পবিত্র রাখতে হয়, পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, কারবারের জায়গাটুকুও মন্দির মনে করতে হবে। স্নান না করে, পবিত্র না হয়ে এখানে কখনও বসবে না।"

সেই থেকেই পুরনো অভ্যাস। ঘনশ্যাম ঘোষাল ভোরবেলায় উঠেই স্নান সেরে নেন। সাতসকালে স্নানের কারণ, কখন মনের মধ্যে বিজনেস

শুরু হবে তার ঠিকঠিকানা নেই। কত দিন আগেকার পিতৃনির্দেশ, ভাঙতে ইচ্ছে করে না।

আসলে, কঠিন পিতৃনির্দেশ হলে ঘনশ্যাম হয়তো গোঁয়ার্তুমি করে তা ভেঙে বসতেন। কঠোরভাবে শাসন করলে বশ্যতা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কিন্তু ভালবাসার বশ্যতা শেষপর্যন্ত টিকে থাকে। তাই ঘনশ্যাম মনে করেন, বাবার অনেক মূল্যবান নির্দেশ স্রেফ তাঁর নিজস্ব বাসনার প্রতিফলন।

হাজার হোক ঘোষালদের এই বিজনেসের পত্তন তো ঘনশ্যাম ঘোষাল করেননি। করেছিলেন চার্টার্ড ব্যাংকের কনিষ্ঠ কেরানি সুখবিলাস ঘোষালের পিতৃদেব চারুবিলাস ঘোষাল। চার নম্বর নেতাজী সুভাষ রোড ব্রাঞ্চে ব্যাংকের কেরানিগিরি করতে-করতে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন চারুবিলাস। তারপর একদিন তিনি কোথায় পড়লেন, স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরও তাচ্ছিল্য করে 'কেরানি-মেরানি' বলেছেন, যাদের কোনো আর্থিক মুরোদ নেই। সুখবিলাস এই সময় ঠাকুরের শিষ্য বসুমতীর উপেন মুখুজ্যের জীবনী পড়েছিলেন। বটতলার বৃন্দাবন বসাকের বইয়ের দোকানে সামান্য চাকরি থেকে উপেন মুখুজ্যে বইয়ের বিজনেসে নেমে সহজেই টু-পাইস করে ফেললেন।

চারুবিলাসও বলতেন, "বিজনেস শুধু বেনের জন্যে এমন কথা কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই। উপেন মুখুজ্যে যদি 'রাজভাষা' বলে বই প্রকাশ করে টু-পাইস করতে পারেন, আমিও পারবো ক্যানিং স্ট্রিটে ঘোরাঘুরি করতে, জেনারেল অর্ডার ধরতে এবং পয়সা কামাতে।"

তাই হলো। চার্টার্ড ব্যাংকের কেরানি চারুবিলাস বিজনেস থেকে টু-পাইস করলেন। কেরানিজাতটা অবহেলা করার নয়। কেরানি, মাস্টারমশাই এবং ইস্কুলের দিদিমণিরা চান্স পেলেই দুনিয়া জয় করতে পারেন। দেখো না, রামকৃষ্ণ মঠমিশনের প্রেসিডেন্ট শিবানন্দ (তারক ঘোষাল) কী ছিলেন? মহাপুরুষ মহারাজ, কিন্তু ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির কেরানি। কর্মসঞ্চিত বিত্ত ৫০০ টাকা বলরাম বসুর কাছে জমা রেখেছিলেন।

বিবেকানন্দর প্রথম শিষ্য গুপ্তমহারাজ (সদানন্দ) ছিলেন রেলের কেরানি। আরে বাপু, স্বয়ং বিবেকানন্দ জীবন শুরু করেছিলেন অ্যাজ মেট্রোপলিটন ইস্কুলে মাস্টার হিসেবে। নিবেদিতাও ছিলেন দিদিমণি। দুনিয়া আজও এইসব সামান্য কর্মচারীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। সুতরাং চারুবিলাস চটপট বিজনেসে টু-পাইস করতে লাগলেন। যথাসময়ে ইস্তফা দিলেন ব্যাংকের কাজে। কিন্তু বংশের সব অ্যাকাউন্ট এখনও ওই চার্টার্ড ব্যাংকের নেতাজী সুভাষ ব্রাঞ্চে, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার টাকাও এসেছিল সুইডেন থেকে।

নিজের কথা আবার ভাবতে বসলেন শান্ত স্বভাবের ঘনশ্যাম ঘোষাল। তিনি জানেন, বিজনেস জিনিসটা আম গাছের মতন—আজকে পুঁতলাম আর আগামী কাল ফল হলো তা সম্ভব নয়। ফল ধরতেই দু'একটা প্রজন্ম লেগে যায়। যারা অধৈর্য তাদের জন্যে অবশ্যই এই বিজনেস লাইন নয়।

বেশি দূরে যাবার প্রয়োজন নেই, কলকাতার বড় বড় মাড়ওয়ারি পরিবারগুলোর ইতিহাস দেখলেই লোকশিক্ষা পাওয়া যাবে। দেড়শো-দুশো বছর আগে ঢাকঢোল না বাজিয়েই এলাহাবাদ থেকে নৌকো করে তাঁরা কলকাতায় হাজির হয়েছেন। হিসেব নাও, কারও সাতপুরুষ, কারও আট পুরুষের ব্যবসা। তবে না জমেছে ব্যাপারটা। একটা পারিবারিক বিজনেস কালচার তৈরি হতে যথেষ্ট সময় এবং ধৈর্য লাগে—ঘরানা কি একদিনে গড়ে ওঠে?

ঘনশ্যামের কিছু অবাঙালি ব্যবসায়ী বন্ধু আছেন। বাঙালিদের ভুল ধারণা, এঁদের সবাই স্রেফ লোটা কম্বল সম্বল করে কলকাতায় হাজির হয়েছিলেন কোটিপতি হবার স্বপ্ন নিয়ে। কয়েকজন ডেয়ারডেভিল অবশ্য তেমন আছেন, ফাটকা খেলেই রাতারাতি রাজা হতে চেয়েছেন তাঁরা, দু'একজন হয়েওছেন, কিন্তু অনেকে পারেননি। যাঁরা তলিয়ে গিয়েছেন, বিজনেসে বংশের ইজ্জত না রাখতে পেরে গলায় দড়ি দিয়েছেন, তাঁদের কথা এখন কারও মনে নেই। এইসব গল্প হলেও সত্যি কলকাতায় কেউ সংগ্রহ করে না।

এই যে লোটাকম্বলের রূপকথা, এ নিয়েও লোকে কত কথা বলে। কিন্তু ঘনশ্যামের পিতৃদেব সুখবিলাস বলতেন, "বাঙালিরা যে ব্যবসা করলো না মন দিয়ে এটা তো আর ডালমিয়া, কানোরিয়া, জালানদের অপরাধ নয়! এটা আমাদের স্বভাবের দোষ, ভাগ্যের দোষ। আমরা ভুলে যাই, সে যুগে কলকাতা আজকের মতন প্রায় মফস্বল শহর হয়ে ওঠেনি। কিছুদিন আগেও কলকাতা ছিল সেকেন্ড সিটি অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার। তার ওপর সারা ভারতের রাজধানী! সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে বিত্তের সন্ধানে লোক এখানে ছুটে তো আসবেই।"

বাবার বন্ধু সিনিয়র ট্যাংরা চাটুজ্যে বকুনি দিয়েছিলেন, "তুমি বহিরাগতদের হয়ে ওকালতি করছো সুখবিলাস!"

বাবা তখন চুপ করে গিয়েছিলেন। আর ঘনশ্যাম ঘোষাল আজকাল তো ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারেন।

দিল্লির কথাই ভাবা যাক। স্বাধীনতার পরে ওই শহরটা হুড়মুড় করে বেড়ে চলেছে—এমন বাড় ইতিহাসে হয়নি কখনও। কমপ্লান খাওয়া বালকের মতন বড় হচ্ছে, জিরাফের মতন সকলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্যে। আর কে না আসছে দিল্লিতে ভাগ্যসন্ধানে! বিজনেস করে টু-পাইস কামাবার রস পেয়ে গিয়েছে সমস্ত ইন্ডিয়ার জনতা। শিখ পাঞ্জাবি হরিয়ানির সঙ্গে বাঙালি বিহারি ওড়িয়া রাজস্থানি মাদ্রাজি হিন্দুস্থানি সবাই ছুটেছে দিল্লির দিকে, একদিন যেমন জনস্রোত ধাবিত হয়েছিল চার্নক সাহেবের স্থাপিত শহর কলকাতার দিকে।

শহর হিসেবে দিল্লির সঙ্গে এখন আর কলকাতার তুলনা চলে না। বিত্তবৈভব এবং বিজনেসে দিল্লির পালে লেগেছে নতুন যুগের হাওয়া। কলকাতা সে তুলনায় বেশ মিইয়ে গিয়েছে। সাধে কি আর দূরদর্শী নেতাজি সুভাষচন্দ্র এ দেশের সমস্ত নতুন লোককে নতুন স্লোগান দিয়েছিলেন, চলো দিল্লি। দিল্লির পথই যে স্বাধীনতার পথ তা তো অনেক আগেই সর্বজনের স্বীকৃতি পেয়েছে। এখন যা নতুন করে প্রমাণিত হচ্ছে তা হলো দিল্লির পথই সমৃদ্ধির পথ। শুধু চলো দিল্লি

নয়, বসবাস করো দিল্লিতে। দিল্লি এখন কেবল মোসাহেব এবং স্তাবকের শহর নেই ; দিল্লি হয়ে উঠেছে সমৃদ্ধির শহর, সৃষ্টির শহর, আপাতবিরোধী বহু সংস্কৃতির সমন্বয়ের শহর। সমালোচক বাঙালিরও মুখ ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই। মনে রাখতে হবে দশ লাখের বেশি বঙ্গভাষী ওই মহানগরীতে জীবনযাপন করে ; সুতরাং দিল্লি অবশ্যই বাঙালির শহরও বটে। ঘনশ্যাম ওখানেও ব্যবসা ফেঁদেছেন।

ঘনশ্যাম কম বয়সে কয়েকজন অভিজ্ঞ কালোয়ার ও মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর প্রসন্ন সঙ্গলাভ করেছিলেন।

অনেক প্রয়োজনীয় শিক্ষা পেয়েছেন ঘনশ্যাম তাঁদের কাছ থেকে। বিত্তবান বাঙালির বিষয়বুদ্ধি নিতান্তই কম। পকেটে কিছু পয়সা হলেই তাঁরা হয় কামিনী, না হয় সাধুসঙ্গ কামনা করেন। অর্থ পেয়েই কেউ কেউ ছুটছেন ভোগের বাগানবাড়িতে। আর না হয় ত্যাগের যোগোদ্যানে। অথচ এই জাতের প্রয়োজন ছিল শ্রেষ্ঠী সংসর্গ। মানুষের সঙ্গে মিশে মিশে শ্রেষ্ঠীরা জীবন সম্পর্কে যে জ্ঞান আহরণ করেন সত্যিই তার কোনো তুলনা নেই। শিবজ্ঞানে যেমন জীবের পূজার কথা বলেছেন সাধকরা, তেমনি খরিদ্দারকে শিবজ্ঞানে সেবা না করলে যে লক্ষ্মী দেবী সন্তুষ্ট হন না তা সুখবিলাসের মতন শান্তবুদ্ধি ব্যবসায়ী শিক্ষা পেয়েছেন অবাঙালি বন্ধু ব্যবসায়ী মহলে।

ঘনশ্যাম ঘোষাল সেসময় মিশতেন শিউপূজন সাউ নামে কলাকার স্ট্রিটের এক গদিওয়ালার সঙ্গে। শিউপূজন এক সময়ে সিটি কলেজের কমার্স বিভাগে পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকা ছাপ মেলেনি, তার আগেই বিজনেসের অতল সমুদ্রে তাঁকে নিত্য অবগাহন করতে হয়েছে।

অশেষ ধৈর্যের মানুষ ছিলেন এই শিউপূজন। শ্যামপুকুর থেকে সকাল সাড়ে আটটায় এসে গদি খুলতেন সবার আগে যাতে শিউপূজনের দোকানেই প্রথম লক্ষ্মীর পাদস্পর্শ ঘটে। তাঁর দোকানটা পায়রার খোপের মতন—মানুষের নড়বার চড়বার উপায় নেই, ভিড়ের

সময় বাথরুমে যাওয়ারও সুবিধে নেই। কিন্তু সীমাহীন ধৈর্য শিউপূজনের। তাঁর দোকানে লেনদেন চলেছে তো চলেছেই। ওরই মধ্যে যখন একটু হাল্কা অবস্থা হলো তখন ঝটপট কয়েকটা যৌগিক আসন সেরে নিতেন শিউপূজন। বলতেন, "এটা শিখে এসেছি লুধিয়ানা থেকে। এক জায়গায় পাথরের মতন বসে থাকতে হয় যোগীকে এবং দোকানিকে। লুধিয়ানার এক হোলসেলার শিখিয়ে দিলেন কয়েকটা দুর্লভ যৌগিক আসন। বললেন, ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম যখন আলাদা বিষয় নয়, গৃহীদের সবকটার জন্যেই একসঙ্গে কাজ করতে হবে।"

যখন গদিতে একজনও খরিদ্দার নেই সেই সময় শিউপূজন মায়ের নাম করে একবার শীর্ষাসনও সেরে নিতেন। মাথাকে পায়ের মতন এবং পাকে মাথার মতন ব্যবহার করলে বিজনেসের বুদ্ধি ডবল হয়ে যায় ঘনশ্যাম শুনেছিলেন তাঁর বন্ধুর কাছেই। আর আসে ধৈর্য। জপেতপে যত ধৈর্য লাগে বিজনেসে লাগে তার তিনগুণ। যোগী চোখ বুজে স্থির হয়ে জপের আসনে বসলেন, ভগবান তো তাঁর কপালের কাছে ঝিলিক দেবেন, আর কাউকে সামাল দেওয়ার প্রয়োজন নেই যোগীর। কিন্তু বিজনেস-যোগীর হাজার হাঙ্গামা। কাউন্টারের সামনে নররূপী নারায়ণ খরিদ্দার সেজে উপস্থিত হবেন। কিছু কেনাবেচা হবে কি না তা সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করছে—ইংরিজিতে যাকে বলে সুইট উইল। তার মানে ইচ্ছেটুকু মিষ্টি হওয়া চাই ; ইচ্ছে না হয়েছে তো ফেঁসেছেন দোকানদার। তখন মাছি তাড়াও, অথবা হা-পিত্যেশ করে বসে থাকো, কিন্তু শূন্যদাঁড়ে একটা পাখিও বসবে না।

শিউপূজন বলতেন, "টাকা পেট্রোল অফ লাইফ নয়, ঘনশ্যাম। পেট্রোল না থাকলে তুমি সাইকেল চালাতে পারো, রিকশা টানতে পারো, ঠেলাগাড়ির মজুর হতে পারো, জীবন তোমার থেমে যাবে না। আসলে, ইন্ডিয়াতে টাকা হলো গেরস্তর শরীরের রক্ত—যদি সারাক্ষণ সার্কুলেশন না হয়, বাঁইবাঁই করে আসা-যাওয়া, যাওয়া-আসা না করে তাহলে সমস্ত বাজারটা অকেজো হয়ে যাবে!"

হেসেছিলেন ঘনশ্যাম। বলেছিলেন, "শিউপূজন, তুমি গপ্পো লেখো না কেন?"

চাঁচাছোলা উত্তর শিউপূজনের, "গপ্পো লিখে বড়বাজারে কেউ এক পয়সা কামাই করতে পারেনি, ঘনশ্যাম। ওসব বাঙালিদের বদখেয়াল। থিয়েটার, ফুটবল আর গপ্পো পেলে বাঙালি আর কিছু চায় না।"

"বেশি লেখক সাপ্লাই করে বিপদ বাড়িয়ে কী লাভ ঘনশ্যাম? যা তুলসীদাস লিখে গিয়েছেন, তাই আমরা সারা জন্ম ধরে পড়ে ওঠার সময় পাবো না। আরও বই সাপ্লাই মানে তো আরও দাম পড়ে যাওয়া। পড়তায় না এলে আমরা কিছু করি না, ঘনশ্যাম। তোমরা তো আমাদের কাছে কিছু শিখলে না। অন্যকে যারা ছোট করে দেখে নিজের দোষ ঢাকবার জন্যে তারা এই বড়বাজারে কখনও বড়লোক হতে পারবে না, তুমি দেখে নিও।"

শিউপূজনের ফ্যামিলি পরবর্তী জীবনে পুনেতে গিয়ে মস্ত শিল্পপতি হয়েছে। কিন্তু সেকথা এ গল্পের প্রসঙ্গ নয়।

তবু শিউপূজনের অনেক কথা এই এতোদিনেও ভোলা যায় না। ঘনশ্যামের মনে আছে, শিউপূজন চমৎকার স্বাস্থ্য রেখেছিলেন এই যোগাসনের বলে। সেই সঙ্গে বলতেন, "যেমনভাবে ভগবানকে খোঁজে যোগী ঠিক সেইভাবে অর্থকে খুঁজতে হয় বিজনেসম্যানকে। দুটোর মধ্যে কোনো তফাত নেই। এই যে টাকা আসে তাকে কখনও নিজের টাকা ভাবতে নেই। এ তো মহাজনের টাকা, আমি আর ক'টাকা নিয়ে এই বিজনেসে এসেছি? সবই তো পরের ধনে পোদ্দারি। অন্য লোকে ভরসা করে ধার দিয়েছে, আগাম মাল দিয়েছে। তারা বসে আছে শিউপূজন কবে বিক্রিপাতি করে দেনা শোধ দেবে। আসল শোধ দিয়ে, সুদ গুনে তারপর যা থাকবে তাও তোমার নয়, এই কথা শিউপূজনকে সারাক্ষণ মনে রাখতে হয়।"

শিউপূজনেরও বউ আছে, সেও কম সুন্দরী নয়, তার নাকেও হীরের নাকছাবি কম মানাবে না। কিন্তু বউকে সাজানো-গোছানোর চেয়েও বড় কাজ আছে শিউপূজনের মতন ব্যবসায়ীর। কামনা-বাসনা আছে,

কামিনীকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার মতন ক্ষমতাও নেই। লক্ষ্মী যাকে ভালবাসেন তাকে সুলক্ষণা কামিনী জুটিয়ে দেন।

এই ধরো দময়ন্তীর কথা। স্বামীর বিজনেস ভাল হোক জীবনে এ ছাড়া তাঁর কোনো সাধ নেই। সংসারটা স্ফূর্তি করার জায়গা নয়। স্বামী তো কৃষ্ণঠাকুর নন যে সারাক্ষণ রাধার সঙ্গে প্রেম করবেন। তাঁকে বিজনেসে বড় হতে হবে, তবে তো সমাজে প্রতিষ্ঠা হবে, দুটো লোক তাকিয়ে দেখবে। স্বামীকে বিজনেসে যেতে বাধা দেওয়া আর রাজার বউয়ের স্বামীকে যুদ্ধে যেতে বারণ করার মধ্যে কোনো তফাত নেই। স্বামীর বিজনেস যতো বাড়ছে ততো আনন্দ হচ্ছে দময়ন্তীর। এর থেকে বেশি আনন্দ সতীসাধ্বীর কী হতে পারে?

দময়ন্তীর ধৈর্যের কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ঘনশ্যাম। মনে মনে তুলনা করেছিলেন বিভাবতীর মানসিকতার সঙ্গে। স্বামীর সান্নিধ্যে সময় কাটানোর বড় সাধ ছিল বিভাবতীর। বড়বাজারের বিজনেসম্যানদের বউরা যদি বিভাবতীর মতন স্বামীর মূল্যবান সময় দাবি করতো তা হলে কী ফল হতো কে জানে?

কিন্তু বিভাবতী প্রশ্ন করতেন, "বড়বাজারেই শুধু ব্যবসা হয়? আর কোথাও হয় না।"

সায়েবদের স্টাইলটা বিভারতীর মনে গেঁথে বসে আছে। জীবনটা নানা ঘটনার মশলামুড়ি—অনেককিছু করার মতো সুযোগ রেখেছেন সৃষ্টিকর্তা। "সায়েবরা অনেক বেশি বোঝেন, তাই তাঁরা কাজের সময় কাজ করেন, খেলার সময় খেলেন, সামাজিকতার সময় সামাজিকতা করেন—পার্টিতে যান, নাচেন, গান ধরেন। সাধনা ও উপভোগ দুটোর জন্যেই সমান আগ্রহ আছে বলেই সায়েবরা দুনিয়া জয় করেছেন।"

বাবাকে এ-বিষয়ে একবার জিজ্ঞেস করবেন ভেবেছিলেন ঘনশ্যাম। কিন্তু সাহস হতো না।

ছেলের মনের অবস্থা না জেনেই সুখবিলাস বলতেন, "বিজনেসে হাজিরা ব্যাপারটা খুবই ইম্পর্টান্ট! যে-কারবার ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী খোলে না তার

সমৃদ্ধি নেই এই শহরে।" আরও বলতেন, "যাঁরা এ-লাইনে বড় হয়েছেন তাঁরা কাজের মধ্যেই বিনোদন খুঁজে পেয়েছেন। আমার বাবা বলতেন, ব্যবসা থেকে যারা খেলার আনন্দ পায় তারাই শেষ পর্যন্ত বড় হয়।"

যে কোনো গল্প লেখক থেকে শিউপূজন অবশ্য আরও এগিয়ে ছিলেন। চমৎকার কথা বলতেন। যেমন, "কম বয়সে ব্যবসা শুরু হয় খেলার মতন, কিন্তু তারপর বিজনেস হয়ে ওঠে পুজোর মতন।"

অনেক খোঁজখবর রাখতেন শিউপূজন। তিনি বলতেন, "যারা জাত বিজনেসম্যান তারা সব মুনাফা বিজনেসেই ঢালতে চায়। আর তোমাদের মধ্যে যারা বিজনেসে দুটো পয়সার মুখ দেখলো তারা অমনি কলকাতায় পটাপট বাড়ি কিনতে আরম্ভ করলো। কলেজ স্ট্রিটের এক বোস মশাই ছিলেন, এইভাবে সাতাশিখানা বাড়ি কিনেছিলেন। দশ বছরে প্রত্যেক দিন সন্ধেবেলায় অ্যাটর্নি পাড়ার আপিস ঘুরে যেতেন কোথায় সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে তার খবর নেওয়ার জন্যে।"

"রিয়েল এস্টেট তো ভাল ইনভেস্টমন্ট, শিউপূজন। কলকাতায় যাঁরা বাড়ির মালিক হয়েছেন তাঁরা তো খারাপ করেননি, তাঁদের ভ্যালুয়েশন তো কম নয়।"

শিউপূজন হেসেছেন। "এই জমিদারি প্রথা এসে তোমাদের বারোটা বাজিয়েছে। তোমাদের সবচেয়ে ক্ষতি করেছেন লর্ড কর্নওয়ালিশ চিরস্থায়ী প্রথার পত্তন করে এবং বাঙালির চোখে জমিদারির স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিয়ে।"

শিউপূজন যা বলতে চায়, প্রত্যেক বিত্তবান বাঙালির মধ্যে একজন মহারাজ ঘুমিয়ে রয়েছেন। আসলে কয়েক হাজার বিঘের জমিদারি, কিন্তু বাঙালিরা চেষ্টা করেছেন, রাজা মহারাজার টাইটেল বাগাতে। সফলও হয়েছেন। ফলে, রাজা মহারাজা শব্দগুলোর বেজায় অবমূল্যায়ন ঘটেছে এই অঞ্চলে। রাজা মহারাজা কাকে বলে তা জানতে হলে বাঙালিকে যেতে হবে রাজস্থানে, পাঞ্জাবে, মধ্যপ্রদেশে, গুজরাতে, কেরালায়।"

ঘনশ্যাম নতুন দৃষ্টিকোণ খুঁজে পেয়েছিলেন শিউপূজনের কথায়। হেসেছিলেন যখন শিউপূজন বলেছিলেন, "জমিদারি প্রথা উঠে যাওয়ার

পরেও জমিদার হবার সুপ্ত বাসনা থেকে গিয়েছে প্রত্যেক বাঙালির মনে—সবাই একের পর এক বাড়ির মালিক হতে চাইছেন এই কলকাতা শহরে।"

পিতৃদেব সুখবিলাসও সম্পত্তি কেনার অনেক সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু হাওড়ায় প্রাসাদোপম বাসস্থান এবং কলকাতায় বালিগঞ্জ পার্কে ছোট্ট একখানা দোতলা বাড়ি ছাড়া সম্পত্তিতে তিনি কিছুই বিনিয়োগ করেননি। তিনি বলতেন, "ক্যাপিটাল হল শরীরের রক্তের মতন, বিজনেস থেকে রক্ত টেনে নিলে লক্ষ্মীর শরীর খারাপ হতে বাধ্য।"

এই কলকাতার বাড়িখানাও বাবা জীবনের শেষপর্বে কিনলেন। বলতেন, "হাওড়ার পথঘাট সব যেন ক্রমশ সরু লিকলিকে হয়ে যাচ্ছে। যাতায়াতের কষ্ট এখানে খুব বাড়বে, তুমি দেখে নিও।"

বাবা বলেছিলেন, "পয়সার মূল্য কমছে, কিন্তু ইন্ডিয়াতে এবার সময়ের দাম হুহু করে বেড়ে যাবে। সময়ের পরিমাণ তো আর বাড়বে না, সেই দিনে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় কোনোকালে কেউ পাবে না। অথচ প্রচণ্ড চাহিদা বাড়বে সময়ের।"

তাহলে কী হতে পারে? জানতে আগ্রহী হয়েছিলেন ঘনশ্যাম ঘোষাল।

সুখবিলাস তাঁর বন্ধু বড় ট্যাংরা চাটুজ্যের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। "কম সময়ে অনেক বেশি কাজ করার শিক্ষা আমাদের বংশধরদের দরকার হবে। যে কাজে লাভ হবে না তার জন্যে সময় ব্যয় করাও চলবে না।"

আসলে, কর্মক্ষেত্রে যাবার জন্যে পথে বেরিয়ে জ্যামে জড়িয়ে পড়া চলবে না কাজের লোকদের। রাস্তাগুলো শহরের শিরা-উপশিরার মতন, যানবাহনগুলো রক্তের মতন—ড্যালা পাকিয়ে ধমনী আটকে জ্যাম করে দিলেই তো মহাবিপর্যয়। হাওড়ার নাগরিকদের জন্যে এসব কথা ভাববার লোক নেই। সেকালে সায়েবরাও হাওড়ার কথা ভাবেননি, একালে সরকারী কর্তাব্যক্তিদেরও ও ব্যাপার নেই। শক্তিমানদের ধারণা, কলকাতার রাজভবন থেকে বেরিয়ে রেড রোড

ধরে হুস করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে পৌঁছতে পারলেই সমস্ত বাংলা প্রাণবন্ত থাকবে।

বিভাবতী তখনও কলকাতায় ঘুরে যেতে ভালবাসতেন। সুযোগ পেলেই শ্বশুরের সঙ্গে বালিগঞ্জ পার্কে চলে আসতেন।

শান্ত জায়গাটা তখনও ধনবান কেষ্টবিষ্টুদের পদধূলিতে বিখ্যাত হয়ে ওঠেনি। দূর থেকে যদিও বাবা বলতেন, "ওই দ্যাখো বউমা, বিড়লাদের প্রাসাদ। মালক্ষ্মী দলবল নিয়ে ওখানে চিরদিনের বাসা বেঁধেছেন। ওঁরা যাতে হাত দেন তাতেই সোনা ফলে।"

হাওড়ায় ফিরে তরুণী বিভাবতী রাত্রে স্বামীকে জিজ্ঞেস করতেন, "হ্যাঁগো, এতো জায়গা থাকতে মা লক্ষ্মী এই বালিগঞ্জে বিড়লাদের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন কেন?"

ঘনশ্যাম ঘোষাল উত্তর খুঁজে পেতেন না। "নিশ্চয় তেমন কোনো কারণ খুঁজে পেয়েছেন মালক্ষ্মী, না হলে ওঁদের ওপর এতো আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন কেন?"

বিভাবতী অনেক খোঁজ রাখতেন। জিজ্ঞেস করতেন, "হ্যাঁগো, ওঁদের এই সব সম্পত্তি নাকি একসময়ে রবি ঠাকুরের ছিল?"

"রবি ঠাকুর কি না জানি না, কিন্তু ঠাকুরবাড়ির অনেক সম্পত্তি বিড়লা এবং অন্য ধনীরা বহুদিন ধরে কিনে নিয়েছেন। সরস্বতী পুজো করবার আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠাকুর্দা প্রিন্স দ্বারকানাথ বিজনেসে নেমে টু-পাইস করেছিলেন। তার থেকে হলো জমিদারি তবেই না ছেলে দেবেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্তে মহর্ষি হতে পারলেন, টাকাকে তুচ্ছ জ্ঞান করলেন। জমিদারদের মস্ত সুবিধা, রোজ খদ্দের সামলাতে হয় না, রাত্রে ক্যাশমেমোর সঙ্গে ক্যাশবাক্স মিলোতে হয় না। সুখের স্রোতে শরীর ভাসিয়ে দিলেও অনেকদিন নিরাপদে সংসার চলে যায়।"

"মালক্ষ্মীর কি কোনো দয়ামায়া নেই?" ঠাকুরবাড়ির সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যাওয়ায় দুঃখ করেছিলেন বিভাবতী।

ঘনশ্যাম বলেছিলেন, "পুঁটু, ছোট ট্যাংরা চাট্যুজ্যে বলতেন, মালক্ষ্মী বড়

চঞ্চলা—কোথাও স্থিতু হতে চান না। এক বাড়িতে পা দিয়েই অন্য কোথাও যাবার জন্যে খোঁজখবর আরম্ভ করেন। তাই বিচক্ষণ লোকরা মালক্ষ্মীকে সারাক্ষণ সোনার শিকলে বেঁধে রেখেও রাতজেগে পাহারা দেন। বিড়লা বাড়ির ছেলে, বউ, নাতিরা ও কাজটা নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছেন।"

"আর ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের কী হলো ?"

"ওঁরা বিজনেস লাইনে থাকলে আজ টাটা-বিড়লা হতেন—মস্ত ব্যাংক, বহু কোলিয়ারি, বিরাট জাহাজ কোম্পানির ভাগ্যবিধাতা থাকতেন। কিন্তু দেবেন ঠাকুর নিজের খেয়ালে মা লক্ষ্মীকে অপমান করে নিজের সাধনায় মগ্ন হলেন। ঘর আলো করে চোদ্দটি ছেলেমেয়ে হলো। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির বংশধররা নিশ্চয়ই বিজনেসম্যানকে অপছন্দ করতো, ছোট ভাবে দেখতো, তাই মালক্ষ্মী অপমানের প্রতিশোধ নিলেন। বাইরের সম্পত্তি তো দূরের কথা, ভদ্রাসনও রক্ষে হলো না।"

বিভাবতী চুপচাপ শুনতেন। ইদানীং তিনি বইপত্তরে একটু নজর দিয়েছেন। কিন্তু ঘনশ্যাম বলতেন, "পুঁটু, তুমি বাঙালির লেখা বই পড়ে বিজনেসের ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলো না। বাঙালিরা ঠাকুরবাড়ির, দত্তবাড়ির এবং বোসবাড়ির কোনো সমালোচনা এখনও সহ্য করে না।"

মুচকি হেসেছিলেন পুঁটু। ঘনশ্যাম আবার ট্যাংরা চাটুজ্যেকে কোট করেছিলেন, "আমার তো ক'অক্ষর গোমাংস—বই পড়বার সময়ই নেই। যা বিদ্যে সব কানে শুনে। ট্যাংরা চাটুজ্যে এলে বাবা সব কাজকর্ম ফেলে বন্ধুর সঙ্গে গল্পগুজবে মেতে উঠতেন, আমি দূর থেকে কান পেতে রেখে কথামৃতের প্রসাদ নিতাম।"

ট্যাংরা চাটুজ্যের বক্তব্য : "সুখবিলাস, বাঙালিদের স্বভাবটাই পিক্যুলিয়র—নতুন কিছু দেখলে প্রথমে তা নেবে না। প্রথম পর্বে শুধু নিন্দে, সমালোচনা এবং যে নতুন কথা বলেছে তাকে যত রকমের কষ্ট দেওয়ার প্রচেষ্টা। সেইসব আঘাত ও অপমান সহ্য করে মানুষটা যদি কোনোরকমে টিকে রইলো, আর ভাগ্যক্রমে যদি কিছু সায়েবের তারিফ জোগাড় করলো, তখন বাঙালিরা তাকে গ্রহণ করবে এবং তারপর তাকে নিয়ে বাঙালিদের দু'হাত

তুলে নাচানাচি শুরু হবে। একবার কেত্তন শুরু হলে বাঙালিরা থামতেই চায় না, তারপর অবশ্য আবার মুশকিল।"

"কী মুশকিল, ট্যাংরা ? যা একবার বাঙালির ঠাকুরঘরে উঠলো তাকে নিয়ে তো কোনো মুশকিল হওয়ার কথা নয়," বলেছিলেন সুখবিলাস ঘোষাল।

বড়বাজার দেশপ্রিয় মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের নেবু রাজভোগ আর খাঁটি ঘিয়ে ভাজা মিহিদানা খেতে খেতে ট্যাংরা চাটুজ্যে উত্তর দিয়েছিলেন, "এখানকার জল হাওয়াটা যে ভাল নয়, সুখবিলাস। একদিন ফেলে রাখলে এই নেবু রাজভোগও টক হয়ে যায়, তিনদিন ফেলে রাখলে এই দেবভোগ্য মিহিদানাতেও গন্ধ হবে। শোনো সুখবিলাস, একবার ভক্তি উছলে পড়বার পরেই তুমি যদি দুধ ফোটানো বন্ধ করো তা হলে এ দেশে আসবে অবহেলা। ইংরিজিতে যাকে বলে ইনডিফারেন্স—তুমি আছো কি না আছো তা মানুষের খেয়ালেই থাকবে না। তাই মাঝে মাঝে বুস্টার ডোজ ইঞ্জেকশন না দিলে সব ভাল জিনিস এ দেশে মিইয়ে যায়।"

সুখবিলাস বললেন, "ট্যাংরা, তোমার কথা শুনলেই আনন্দ।"

ট্যাংরা উত্তর দিলেন, "প্রথম পর্বে বাঙালিরা ঠাকুরকে বলতো 'পরমহংস মশাই'—মরার পরে তিনি খেতাব পেলেন পরমহংসদেব ! রবীন্দ্রনাথ একসময়ে ছিলেন, 'দেবেন ঠাকুরের ব্যাটা' ; নোবেল প্রাইজ পেয়ে হলেন গুরুদেব। 'রবিবাবুর গান' হলো রবীন্দ্রসঙ্গীত।"

কলকাতার বালিগঞ্জ পার্ক থেকে বেরিয়ে এখনকার গুরুসদয় রোড ধরে যেতে যেতে ঘনশ্যাম তাঁর স্ত্রীকে অনেকদিন আগে বলেছিলেন, "বিড়লাদের এইসব বাড়িই এ যুগের তীর্থস্থান বলা চলে। অদ্ভুত এঁদের শক্তি, কুবেরের ভাঁড়ারেও বোধ হয় এতো বিত্ত নেই। ঐশ্বর্যের মাত্রায় ইন্ডিয়ার একনম্বর এই বিড়লারা। এঁরা নিত্য পুজো করেন মালক্ষ্মীর, তবু মা সরস্বতী পাশেই ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ এক অদ্ভুত পরিবার। ইংরেজ এঁদের সম্মান করতো, প্রয়োজনে গোল টেবিল বৈঠকে ডেকে পাঠাতো, আবার গান্ধীজি এঁদের মস্ত ভক্ত। এঁদের বাড়িতেই তিনি দেহ রাখলেন দিল্লিতে—নেক্সট পাঁচহাজার বছরের হিসট্রিতে অনায়াসে স্থান হয়ে গেলো বিড়লাদের।"

বিড়লাবাড়ির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ঘনশ্যাম। আর বিভাবতী কোথা থেকে কিছু গুজব শুনেছেন। তাই জিজ্ঞেস করলেন, "এঁদের বাড়ির বউদের পরমায়ু কেমন ?"

ঘনশ্যাম ঠিক উত্তর দিতে পারেননি। বলেছেন, "জন্ম-মৃত্যু কারও হাতে নয়, পুঁটু। দু'একজন কর্তার বউ হয়তো অসময়ে মারা গিয়েছেন। এখন কিন্তু আর এসব গল্প শুনবে না। বিড়লাবধূরা এখন রীতিমত আধুনিকা।"

আদ্যিকালের সেই উত্তর এসেছে বিভাবতীর দিক থেকে। "ভাগ্যবানেরই তো বউ মরে !"

"সেসব অন্য যুগে, পুঁটু, এখন আর নয়। শুনেছি স্ত্রী বিয়োগের পর জি ডি বিড়লা দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে রাজি হননি।"

পুঁটু উপন্যাস পড়ে বয়সের তুলনায় একটু বেশি পরিণত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যে-যুগের যে-ধর্ম ! এই তো সেদিন পর্যন্ত আমাদের মহাপুরুষরাও বালিকা বিবাহ করতেন। কোথায় যেন গতকালই পড়লাম, পরমহংসদেব যখন তেইশ বছর বয়সে বিবাহ করলেন তখন সারদামণির বয়স ৫ বছর। ১৫ বছর বয়সে যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিয়ে করলেন তখন তাঁর বউয়ের বয়স ৬ বছর। রবীন্দ্রনাথের বিয়ের সময় মৃণালিনী দেবীর বয়স ১১। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিয়ে করেছিলেন ৮ বছরের মেয়েকে, আর বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম বিয়ে করেছিলেন ৮ বছরের বালিকাকে।"

ঘনশ্যাম বেশ অবাক হয়েছিলেন গৃহিণীর জ্ঞানচর্চায়। স্ত্রীকে পরম আদরে বলেছিলেন, "পুঁটু, ব্রাহ্মবাড়িতে বিয়ে হলে এতদিনে তোমার নামযশ ছড়িয়ে পড়তো। সমাজসেবিকা হয়ে মস্ত কিছু করতে পারতে তুমি।"

পুঁটু মুখে কোনো তর্ক করেননি, কিন্তু নিঃশব্দে এবং আচমকা স্বামীকে এমন একটি চিমটি কেটেছিলেন যার অম্লমধুর স্বাদ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও অম্লান হয়নি।

সেই চিমটি কাটার সময়ে আরও কথাবার্তা হয়েছিল তরুণ-তরুণীর

মধ্যে। ঘনশ্যাম বলেছিলেন, "বই পড়লে কতো কী জানা যায়! আজকাল এক এক সময় দুঃখ হয়, বাবা বড় অল্প বয়সে পড়াশোনার জগৎ থেকে সরিয়ে এনে আমাকে কারবারে ঢুকিয়ে দিলেন।"

পুঁটু রসিকতা করেছিলেন, "মেয়েদের জন্যে বাল্যবিবাহ আর ছেলেদের জন্য বাল্যব্যবসা।"

"ওঁদের কেমন ধারণা ছিল কম বয়সে সংসারে না-ঢুকলে মেয়েদের হেঁসেলে তেমন মন বসবে না। তাই মেয়েদের ক্ষেত্রে গৌরীদান, রোহিণীদান এবং কন্যাদান।"

লোক ঠকাবার জন্যে সুন্দর সুন্দর নাম দেওয়া হতো—গৌরী মানে আট বছর, রোহিণী মানে ন' বছর এবং দশ হলেই কন্যা!"

এতো দিন পরে ঘনশ্যাম ভাবলেন, "ছেলের ব্যাপারে বাবা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর নিজের শরীর অচিরেই ভেঙে পড়বে। অর্থসংক্রান্ত আগাম স্বপ্নাদেশ পেয়ে ছেলেকে নিজের কারবারে না-বসালে তাঁর বিজনেসের কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না।"

বিজনেসের এই বিপদ, ভাবলেন ঘনশ্যাম। এখানে ঢোকা সহজ, কিন্তু বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। ওয়ান্স এ বিজনেসম্যান অলওয়েজ এ বিজনেসম্যান!

বিজনেসে যখন টাকা আসছে তখন প্রাণ ধরে খরচের উপায় নেই। বিজনেস বাড়াতে গেলে মূলধন বাড়াতে হবে। মাছের তেলে মাছ ভাজাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ। কিন্তু আচমকা কিছু ঘটে গেলে, ভাঁটার টানে সব একসঙ্গে ভেসে যাবে। অবাঙালিরা তবু বিধবার ব্যবসারক্ষা সামাজিক দায়িত্ব মনে করে কিছুদিন চালিয়ে দেন যাতে নাবালক সময়মতো এসে ব্যবসায় বসতে পারে। বাঙালি ব্যবসায়ীদের ওসব কালচার নেই। বাঙালিদের বক্তব্য, "কেরানি হয়ে সন্তুষ্ট থাকো, স্ত্রীপুত্রর জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমুক, অতি লোভে তাঁতি কেন নষ্ট হবে?"

এই তাঁতির ব্যাপারটা ঘনশ্যাম ভালভাবে জানতেন না। বন্ধু হুটকো হালদার বহু দিশি গল্পের স্টকিস্ট! তিনি বলেছিলেন, "হ্যাদা, তোমাকে

মনে রাখতে হবে পুরনো একটা ছড়ায় বলছে—খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, হাল হল তাঁতির এঁড়ে গোরু কিনে।"

মানেটা তখনও ঠিক মাথায় প্রবেশ করছিল না। রসিক হুটকো হালদার ব্যাখ্যা করলেন, "বাঙালির সেই পুরনো ব্যাপার ! রিস্ক নেবে না বঙ্গসন্তান। ওটা ওদের রক্তে নেই, বাঙালি সব সময় নিরাপত্তা খুঁজছে, ফলে পড়ে যাচ্ছে চরম বিপদে।"

"হুটকো, আমার বাবাও বলতেন, ঝুঁকি না নিলে জীবন চলে না। দুনিয়ায় এতো লোককে তো দেখলে। ক'জন ঝুঁকির ধাক্কায় না খেয়ে মরছে ? বরং যারা ধুঁকছে তারা কখনও ঝুঁকি নেবার সাহস দেখাতে পারেনি।"

ছুটির দিনে হুটকো যখন বন্ধুর কাছে হাজির হতেন তখন বিভাবতী জানতেন যে বন্ধুটি অনেকক্ষণ থাকবেন। দুপুরবেলায় না খাইয়ে মানুষটিকে ছাড়ার কথাই ওঠে না। হুটকোকে এ-বাড়ির সবাই খুবই পছন্দ করে।



হুটকোর মস্ত হিস্ট্রি আছে। হাওড়ার বিবেকানন্দ শিক্ষালয়ে হুটকো এবং ঘনশ্যাম একই ক্লাসে পড়াশোনা করতেন। পৈতৃক নাম হারাধন হালদার।

হুটকো প্রায়ই আচমকা ক্লাস কামাই করতেন। অন্য মাস্টারমশাইরা হারাধনকে তেমন কিছু বলতেন না। কে হাজিরার আইন মানলো, কে

কামাই করলো, তাতে তাঁদের কি এসে যায় ? কিন্তু অঙ্কের মাস্টারমশাই যুগলকিশোর দাস কাউকে ছাড়বার পাত্র নন।

তিনি একদিন জিজ্ঞেস করলেন, "হারাধন, হুট করে কামাই কেন বাপধন ?"

হারাধনের ঝটিতি উত্তর, "হুট করে গায়ে জ্বর এসে যায়, স্যর।"

যুগলবাবু স্যারের মন্তব্য, "ও ! ঠিক ইস্কুলে যাবার সময় হলেই হুটকো জ্বরটা এসে যায় ! দেখি তোমার পিলেটা কতখানি বেড়েছে।"

হারাধনকে এগিয়ে আসতে হলো, আর যুগলবাবু স্যর পেটে একটা মারাত্মক খোঁচা দিলেন। পিলের সাইজ নির্ধারিত মাপেই আছে বলে মন্তব্য করলেন যুগলবাবু স্যর। তারপর সানন্দে ঘোষণা করলেন, 'আজ থেকে তোমার নাম হল হুটকো বাবাজি।"

আসলে স্যারের রাগের কারণ ছিল। স্যর শুনেছেন নিজের পড়াশোনা অবহেলা করে হারাধন সম্প্রতি পৈতৃক বাড়ি রিমডেল করছে, ফলে অঙ্কে শোচনীয় অবস্থা।

এই হুটকো বাবাজিই শেষপর্যন্ত হুটকো হালদারে পর্যবসিত হলেন। এর জন্যে হারাধনের মনে অবশ্য কোনো দুঃখ নেই। "আমার কোনো কাজে প্ল্যানিং নেই, সব হুট করে করে বসি। ক্লাস টেনে হুট করে ইস্কুল ছেড়ে বেনারসে চলে গেলাম ; ওখানে হুট করে কাশী বিদ্যাপীঠ থেকে পরীক্ষা দিলাম। চাকরির সন্ধানে বেরিয়ে হুট করে বাপের বিনা অনুমতিতে চলে গেলাম বিদেশে। চাকরি যিনি যোগাড় করেছিলেন তাঁর শর্ত ছিল বিবাহ, সুতরাং বিয়ে ঠিক করলাম। পাঁচ বছর পরে বাপ ক্ষমা করে বাড়ি ফিরে আসার অনুমতি দিলেন, কিন্তু অতো সুখ সহ্য হলো না। হুট হুট করে কর্মস্থলের পরিবর্তন চলতে লাগলো ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে।"

এ বাড়ির অন্দরমহলেও যে হুটকোর এতো খাতির তার অন্যতম কারণ, শত প্ররোচনাতেও হুটকোর বিষয়সম্পত্তি বাড়ানোর কোনো আগ্রহ নেই।

চাকরির প্রয়োজনে হুটকো বেশ কয়েকবার বাংলার বাইরে বাইরে ঘুরেছেন। তারপর হুট করে আবার কলকাতায় ঘুরে গিয়েছেন।

মধ্যমপর্বে একবার বিভাবতী বলেছিলেন, "হুটকোবাবু, আপনি বেশ আছেন! বিষয়সম্পত্তিতে আপনার বিতৃষ্ণাও নেই, টানও নেই।"

হাতজোড় করে হুটকো বলেছিলেন, "সবাই লগনচাঁদা হয়ে জন্মায় না। ঘোষাল মেমসায়েব, আমি দিন আনবো, দিন খাবো, আমাকে কখনও সম্পত্তির হিসেব রাখার হাঙ্গামায় পড়তে হবে না, বলে গিয়েছেন এক নাগা সন্ন্যাসী।"

একসময় হুটকো স্মৃতিচারণ করেছেন। "জানেন মেমসায়েব, ইস্কুলে এই হুটকো, আপনার সায়েব এবং সনাতন সান্যাল ছিল হরিহর আত্মা। ক্লাসে বসে গপ্পো করার জন্যে কতবার যে বিভিন্ন স্যারের গাঁট্টা খেয়েছি, এবং ওয়ার্নিং পেয়েছি তার হিসেব নেই। আমাদের অন্য বন্ধু ছিল সনাতন। আমরা তাকে ওর গায়ের টকটকে রঙের জন্যে রূপসনাতন বলে ডাকতাম। আবার কখনও বলতাম, বাঙাল সনাতন। কারণ আমাদের ক্লাসে আর এক ঘটি সনাতন ছিল, যার বাড়ি আঁটপুর। আঁটপুর জানেন তো মেমসায়েব, বড় পবিত্র জায়গা। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের নিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন ওই আঁটপুরে।"

বাঙাল সনাতনের প্রসঙ্গ আচমকা ওঠায় সেবার হঠাৎ যেন অস্বস্তি নেমে এসেছিল ঘরের মধ্যে। বিভাবতী কিছু বলতে পারছেন না। ঘনশ্যামও কথাটা যেন শুনেও শোনেনি।

হুটকো হালদার নিজেই বুঝতে পারছেন এই সনাতনের কথাটা না ওঠালেই ভাল হতো। সব বুঝতে পারছেন তিনি। সব ব্যাপারে মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে না পরিস্থিতির ওপর।

হুটকো হালদারের মনে পড়ছে, এই বাঙাল-ঘটি ব্যাপারটা ওঁদের ছাত্রাবস্থায় হাওড়ার ইস্কুলে বেশ প্রবল ছিল। ঘটিপ্রধান অঞ্চল এই দিকটা। বাঙালদের সম্বন্ধে তেমন বিদ্বেষ ছিল না সে যুগে, কিন্তু প্রচণ্ড কৌতুকবোধ ছিল।

বন্ধুকে হুটকো বলেছেন, "জানো ঘনশ্যাম, এই বাঙাল ঘটি নিয়ে

রসরসিকতা বহু বছর ধরে চলে আসছে। অমন যে অমন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন ওখানেও বাঙাল ঘটি নিয়ে রসরসিকতা চলতো। পড়ে দেখো, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিকথা। একনম্বর বই বলতে যা বোঝায়। 'স্বামীশিষ্য সংবাদ' বইটা মুখস্থ না করলে নরেন দত্তকে বোঝাই যায় না। কিন্তু বেলুড় মঠেও তাঁর প্রিয় শিষ্যকে সবাই বাঙাল বলে ডাকছে। ব্রহ্মানন্দের মতো বিশ্বপ্রেমী সাধু বলছেন, 'বাঙালের জ্বালায় একটু ঘুমোবার উপায় নেই !' কারণ বিবেকানন্দর নির্দেশে বেলুড় মঠে সাধুদের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙাবার ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন পূর্ববাংলার শরচ্চন্দ্র।"

হুটকো হালদার বললেন, "ঘনশ্যাম, তোমার মনে আছে, বিজনেস সম্বন্ধে তোমার মনে তখন আগ্রহ ছিল না। তুমি তখন নদের নিমাই পালায় পার্ট নিয়ে অ্যাক্টো কথার কথা ভাবছিলে।"

"অ্যাক্টো করাটা কিছু অন্যায় নয়, হুটকো। বউয়ের সামনে তুমি এমনভাবে কথাটা পাকাচ্ছো যেন মহাপাতক হতে-হতে বেঁচে গিয়েছি।"

"বালাই যাট ! হাওড়ার ছেলে হয়ে কেমন করে পালা গাওয়ার নিন্দে করবো ? যাত্রা জগতের গুরুদেব পালাসম্রাট বড় ফণী তো কেষ্টকমল ভট্চাজ্যি লেনেই থাকতেন। ওঁর মেয়ে রেবাদি আমার দিদির সঙ্গে পড়তো, আর নাট্যসমাজের নদের নিমাই পালা দেখেনি এমন মানুষ একসময় ছিল না। একসময় হাওড়ার সব ছেলে নদের নিমাই পালায় হিরো হবার স্বপ্ন দেখতো। আমিও স্বপ্ন দেখেছি—কিন্তু ওই যে আমার মাঝে-মাঝে কথা আটকে যাওয়া—থেকে-থেকে তোতলামিভাব আমার নাটুকে ভবিষ্যৎটা নষ্ট করে দিল। না-হলে হারকাটা লেনের সন্তোষ দত্তদের ধরে আমিও পালায় চান্স পেয়ে যেতাম। দত্তরা আমাদের যজমান।"

মিটমিট করে হাসছেন ঘনশ্যাম। সেই হাসিতে বিভাবতীও যোগ দিচ্ছেন। তবু ওই বাঙাল সনাতনের প্রসঙ্গটা যেন মুছে যাচ্ছে না। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন হুটকো হালদার—সামান্য ভুল করে ফেলেছেন। কিন্তু যা হয়ে গিয়েছে তার চারা নেই। মানুষের জিভ অনেক সময় কারুর কথা না ভেবেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে !

হুটকো হালদার যদি সনাতনের প্রসঙ্গ তুলে ভুলও করে থাকেন তা ডবল পুষিয়ে দিচ্ছেন এই ঘনশ্যাম ঘোষালের পালাগানের কথা তুলে। সেবার মস্ত উপকার করেছিলেন এই হুটকো হালদার। সবাই জানে যাত্রার নেশা একবার মাথায় তেমনভাবে ঢুকলে কেউ ঘনশ্যামকে অভিনয় থেকে আটকাতে পারবে না। সুখবিলাসবাবুর সব সুখ ব্রহ্মতালুতে উঠে যেতো যদি তাঁর আদরের সন্তানের মন হঠাৎ বিজনেস থেকে সরে যেতো।

হুটকো হালদার নিজেও তখন মানসিক সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। ঘনশ্যামের জানতে বাকি নেই, একসময় অনেক অশ্লীল বই পড়তেন হুটকো হালদার।

হাতে তখন কাঁচা পয়সা ছিল, এক টাকা জমা দিলেই হলদে মলাটের বই পাওয়া যেতো হাওড়ার হাটে প্রতি মঙ্গলবার। বই পড়ে পরের মঙ্গলবার ফেরত দিলে চার আনা রিবেট! বত্রিশ পাতার অশ্লীল বই, পড়তে আর কতক্ষণ লাগবে? হুস করে তা পড়া হয়ে যেতো।

দু'একখানা বই ঘনশ্যামকেও পড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন হুটকো। ঘনশ্যামের লোভ যে হয়নি এমন নয়, হলদে মলাটের গল্পগুলো হুড়মুড় করে এগিয়ে যায়, উত্তেজিত শরীরের রক্তচলাচল বাড়িয়ে দেয়। কিছুক্ষণ ভীষণ ভাল লাগে, নিজের ওপর সেইসময় কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মনে হয়, কেউ নাকে দড়ি পরিয়ে অধঃপতনের দিকে টানছে তোমায়।

"মেমসায়েব, ইউ সুড বি প্রাউড অফ ইওর হাজব্যান্ড। পিওর অ্যাজ গোল্ড। ১৮ ক্যারাট নয়, বাইশ ক্যারাট, কিংবা আরও সুপার কোয়ালিটির সোনা যদি কিছু থাকে। নিখাদ বলতে যা বোঝায়।" বিভাবতীকে বলেছেন হুটকো হালদার।

ব্যাপারটা যা ঘটেছিল, গল্পের বইয়ের কথা শুনে প্রথমে আগ্রহ দেখিয়েছিল ঘনশ্যাম। তার পরের দিন নোংরা বইটা বন্ধুর কাছ থেকে নেবার সময় ঘনশ্যাম অ্যাবাউট টার্ন করেছে। এইধরনের বই নিতে মোটেই রাজি নয় ঘনশ্যাম। কিছুদিন আগে তার পৈতে হয়েছে। সে প্রতিদিন সন্ধ্যা-আহ্নিক করে, গায়ত্রী মন্ত্র পড়ে।

ঘনশ্যাম তার বন্ধুকে বলেছিল, "না ভাই, খারাপ বই পড়ে এখন মায়ের অমঙ্গল করবো না। মায়ের হাত থেকে আমি নিজে ভিক্ষে নিয়েছি। পুরো একটি বছর সন্ন্যাসীর মতন থাকবার কথা। একে তো পৈতে হতে একটু দেরি হয়েছে, তার জন্য স্বস্ত্যয়ন করতে হয়েছে বাবাকে।"

হুটকো হালদার তখন আর কিছু বলেননি। তার নিজের উপবীত ধারণ অনেক দিন আগে হয়ে গিয়েছে, তখন তার বয়স মাত্র আট বছর। অত কম বয়সে উপবীতধারী হলে উপনয়ন অনুষ্ঠানটার কোনো চার্ম থাকে না, মনে হয়েছে হুটকো হালদারের।

নৈতিক সঙ্কটের সেই দিনগুলোর কথা হুটকো হালদার এখনও ভুলে যাননি। মন টানছে অশ্লীল বইয়ের দিকে, আবার ভিতর থেকে কে যেন সাবধান করে দিচ্ছে, দূরে থাকো, দূরে থাকো। সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকবাস কথাটা তখনই বিবেকানন্দ ইস্কুলের হেডমাস্টারমশায়ের কাছ থেকে শুনেছিলেন হুটকো হালদার।

মনটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবার জন্যে তখন ঠাকুরের বই, বিবেকানন্দর বই পড়তে শুরু করলেন হুটকো। সে এক অদ্ভুত অবস্থা, একই সিটিং-এ ধর্মের বই এবং হলুদ মলাটের বই পড়ার ব্যবস্থা। ঠাকুরের বই প্রথমে ভালো লাগেনি। ঠিক মাথায় ঢোকেনি। মনে হয়েছে গ্রামের একটা বোকাসোকা লোক নিজের খেয়ালে কীসব বকে চলেছে! তারও অনেক পরে ঠাকুরের বইয়ের গভীরে কিছুটা প্রবেশ করতে পেরেছেন হুটকো হালদার।

তারপর সমস্ত জীবন এই ঠাকুরই ছাতা দিয়ে ঝড়-বাদলে রোদে-বৃষ্টিতে রক্ষে করে এসেছেন এই হুটকোকে। অসীম দয়ার শরীর এই পরমহংসমশায়ের। শুধু অপরকে দেওয়ার জন্যেই যেন মানব শরীর ধারণ করেছিলেন। পাপীতাপীদের অপরাধ নিজের শরীরে টানতে-টানতে শেষ পর্যন্ত কঠিন অসুখে পড়ে গেলেন। সর্বনাশা রোহিণী রোগে কত দিন ভুগলেন, কোনো চিকিৎসক কিছু করতে পারলেন না। কিন্তু ঠাকুরের দেওয়ার কোনো বিরাম নেই। অথচ তাঁকে প্যালা দিতে হয়

না ! এসো, শুধু নাও, নাও। তৃষিত হৃদয় স্নেহ প্রেমরসে জুড়িয়ে যাও। নতুন করে বিশ্বাস ফিরে পাও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, অবগাহন করো বিশ্বভুবনের আনন্দধারায়।

হুটকো হালদার কম বয়সে প্রথমে ঠাকুরকে তেমন বুঝতে না পেরে বিবেকানন্দের দিকে ঝুঁকেছিলেন। সব নয়, তাঁর কয়েকখানা বই বেশ ভাল লাগলো।

"বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলতেন স্বামীজী, বুলেটের মতন বুকে বিঁধে যায়। তখন মনে হয়, নরেনবাবু, আমরণ আপনার গোলামি করতেই আমার জন্ম। আমাকে দলে নিয়ে নিন দত্তমশাই, আমার সব দ্বিধা, সব হাঙ্গামা চিরতরে মিটে যাক। দত্তমশাই, আপনি তো বিশ্বভূমণ্ডলের সব সত্য গুলে খেয়ে, পাঁচ হাজার বছর ধরে এই পৃথিবীর যেখানকার যত মানুষ যা ভেবেছে তা সব বিচার করে তার স্বর্গীয় নির্যাসটুকু সংগ্রহ করে সযত্নে রেখে গিয়েছেন অপগণ্ড বাঙালিদের জন্যে। সেই বাঙালি, যারা আপনাকে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছে, সুযোগ পেলেই আপনার নিন্দে করেছে, আপনার নামে মামলা রুজু করতে দ্বিধা করেনি। আপনাকে কথায় কথায় সন্দেহ করেছে। মহাশয়, আমি শুধু বাঙালি বলছি এই জন্যে যে আপনার মূল বাংলা লেখাগুলো থেকে যেন সারাক্ষণ গনগনে আগুন ঝরছে। ওই যে পাঁজিতে বিজ্ঞাপন দিতো—মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়, প্রোফেসর হাজরার ইলেকট্রিক সলিউশন, স্বামীজী আপনি তাই। সমস্ত দুনিয়ায় এমন একটা বাঙালি মড়া নেই যে আপনার অমৃতবচনে বেঁচে উঠবে না, জেগে উঠবে না।"

"অথচ, আপনি নিজেকেই কয়েকটা বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন না নরেনবাবু। অমাবস্যার ঘন অন্ধকারে দু'একবার বিদ্যুতের চমক দিয়ে আপনি নিজেই মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেলেন, চল্লিশে পর্যন্ত পা দেবার অভিরুচি হলো না। আর এই অধমের বাঁ পকেটে নামহীন অশ্লীল বই—হাওড়া হাট থেকে সংগৃহীত, আর ডান পকেটে আপনি রয়েছেন ইস্কুলের সংগ্রহশালা থেকে প্রধানশিক্ষক কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে।"

হুটকো হালদার নিজের মনেই খাতায় লিখেছেন, "কী আশ্চর্য মহাশয়ের মহিমা ! এতো দিন পৃথিবীতে পচা জিনিসের সংস্পর্শে টাটকা জিনিসেও পচন ধরেছে। আর এবার উল্টো হলো, আমার মনের পচা কালো কালো দাগগুলো আমার চোখের সামনেই উঠে যেতে লাগলো। আমি এখন আর বকে যাওয়া হুটকো হালদার নই, আমি আর পাপীতাপীও নই, স্বয়ং ঈশ্বর পরম আদরে আমার অমলিন কপালে রাজতিলক এঁকে দিচ্ছেন। মানুষ কখনও চিরদিনের জন্যে মলিন হয় না। শ্বেতপাথরে কখনও কখনও কাদা জমে, কিন্তু তা কত সহজে মুছে দেওয়া যায়। মুছে ফেলাটা কোনো কাজই নয়—প্রেম বৎস প্রেম ! বিশ্বাস বৎস বিশ্বাস ! তুমি ওঠো, জাগো ! নিজেকে আবিষ্কার করো। নিজের আলোকেই নিজেকে আলোকিত করো, আত্মোদীপো ভব।"

এই শেষ কথাটা তরুণ বয়সেও মনে ভীষণ দাগ কেটেছিল হুটকো হালদারের। দুনিয়াতে কেউ কাউকে লাইট দিতে পারে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কোনো মিউনিসিপ্যাল লাইটপোস্ট নেই আত্মার পথ আলোকিত করার জন্য। কিন্তু রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট প্রয়োজন নেই, তুমি নিজেই নিজের আলোকবর্তিকা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো বিশ্বচরাচরে।

শুধু মহাবিশ্বের চরম উপলব্ধির রহস্য নয়, প্রতিদিনের মানুষের যন্ত্রণার সঙ্গেও যে বিবেকানন্দর নিবিড় পরিচয়। তাই কীভাবে চাকরি খুঁজতে হবে, কী ভাবে গলায় টাই বাঁধতে হবে, উনুনের সামনে বসে কী ভাবে রান্না করতে হবে, কী ভাবে বাণিজ্য করতে হবে, সব সাবজেক্টে কিছু না কিছু জ্ঞান রেখে গিয়েছেন।

"মন দিয়ে ভাইভেকানন্দ পড়ো ব্রাদার, অ্যাকাউনটেন্সি থেকে আরম্ভ করে ডান্সিং পর্যন্ত সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভে বলবান হবে।" হুটকো একবার বলেছিলেন ঘনশ্যামকে।

যে যাই বলুক, ঘোষালবাড়ির সবাই জানে, ঘনশ্যাম ঘোষালের জীবনে হুটকো হালদার মস্ত বড় ভূমিকা পালন করেছেন।

ঘনশ্যাম তখন বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে সবে এম.এ. ক্লাসে ঢুকেছেন।

তখনও এইসব মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকের হাঙ্গামা হয়নি। ম্যাট্রিক ক্লিয়ার করে ঘনশ্যাম টপাটপ আই.এ. করে নিয়েছেন, তারপর কপাল ঠুকে বি.এ.। কিছু দিন পরে একদিন কলেজ স্ট্রিটে গাউন ভাড়া নিয়ে সমাবর্তন উৎসবে যোগ দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের কাছ থেকে ডিগ্রির কাগজখানা সংগ্রহ করে, আর্ট স্টুডিও থেকে ফটো তুলিয়ে এম.এ. ক্লাসে ঢুকে যাও।

তারপর তো নিউ লাইফ—তার মানেও অবশ্য ওল্ড লাইফ—সেই আবহমান কাল থেকে যার জন্য বাঙালির জন্ম সেই কেরানিগিরি করা। ওয়ার্ল্ডে এত ভাল কেরানি আর কোনো জনপদ থেকে উৎপাদিত হয়নি। বাংলার পাট আর বাংলার কেরানি। সায়েবের হয়ে সারা জন্ম মাছি মারার জন্য বাঙালি নিজেকে নিয়োগ করেছে এবং উৎসর্গ করেছে।

তবু সেসময় চাকরিতে কিছু গ্ল্যামার ছিল, যার অর্ধেকও ছিল না বিজনেসে। যারা কারবারে যেতো তারা হাড়েহাড়ে তফাতটা বুঝতো। ক্লাসের কয়েকজন ছাত্র ক্লাস এইটে দু'তিনবার ঠোক্কর খেয়ে পৈতৃক বিজনেসে চলে গেলো।

দিবাকর সাহার ছিল পৈতৃক দিশি মদের দোকান। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর ওই দোকানে সে ঢুকে গেলো, আর নারায়ণ সাধু গেলো—গোলদারি মশলার দোকানে। তারা দু'জনেই দুঃখ করেছে, 'আমাদের বংশে লেখাপড়া হয় না হুটকো।'

একমত হননি হুটকো হালদার। "কী যা তা বলছিস? মেঘনাদ সাহার নাম শুনিসনি? আর রায়বাহাদুর তারকনাথ সাধু বিখ্যাত আইনজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিক।"

ঘনশ্যাম ঘোষাল যা ভয় পাচ্ছিলেন তাই হলো। বাবা উঠেপড়ে লাগলেন ছেলেকে বিজনেসে বসাবার জন্যে। ওই যে রাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন, নির্দেশ হয়েছে, সুখবিলাস আর কাঞ্চন স্পর্শ কোরো না।

"সেকেলে লোকগুলো একটু বয়স বাড়লেই স্বপ্নাদেশ পেতে আরম্ভ করে কেন বল্ তো? যখন রক্ত গরম থাকে, শরীর তাজা থাকে তখন তো এইসব

স্বপ্নাদেশ আসে না।" ঘনশ্যামের মনে তখন এ-বিষয়ে গভীর সন্দেহ।

মানুষের নিজস্ব স্বাদ আহ্লাদগুলোই কি রাতের অন্ধকারে স্বপ্নাদেশ হয়ে ফিরে আসে ? আর মানুষ ভয় পেয়ে গিয়ে নিজেকেই মেনে নেয় ?

তখন বেপরোয়া চ্যালেঞ্জ জানাবার দুঃসাহস নেই হুটকোর। স্বপ্নাদেশ পেয়ে কতো বড় বড় মন্দির প্রতিষ্ঠান এদেশে গড়ে উঠেছে। আসলে ঈশ্বর যখন অন্যভাবে ব্যর্থ হন তখন অগতির গতি এই স্বপ্নাদেশ ! হুটকো লক্ষ্য করেছে, স্বপ্নাদেশে অন্যায় আদেশ বড় একটা থাকে না। অমুক তোমার পথের কাঁটা, ওকে পথ থেকে সরাও, এমন আদেশ স্বপ্নে বড় একটা হয় না। বেশিরভাগ আদেশ হয় কিছু গড়ে তোলবার জন্যে, কারও ভাল করার জন্যে, মানুষের মঙ্গলের জন্যে।

কিন্তু ছাত্র ঘনশ্যাম তখন পুরো বেঁকে বসে আছেন। সিনেট হল এবং দ্বারভাঙা বিল্ডিংস ছেড়ে তিনি কিছুতেই কারবারে যোগ দিচ্ছেন না। প্রয়োজন হলে পৈত্রিক কারবারে তিনি আদৌ থাকবেন না। তিনি চাকরি করবেন ম্যাকিনন ম্যাকেনজিতে, কিংবা দাদামশায়ের স্মৃতিবিজড়িত চার্টার্ড ব্যাঙ্কে।

কে বলেছে চাকরিতে সুখ নেই ? ম্যাকিননে উইডো পেনসন পর্যন্ত আছে।

ব্যাপারটা তখনও ঠিক বুঝতে পারতেন না ঘনশ্যামের মা। ঘনশ্যাম তখন প্রিয়ংবদাদেবীকে বুঝিয়েছেন, "কেউ মরে গেলে তার বউকে উইডো বলে, মা। কর্তা যেমনি চলে গেলেন সেইসঙ্গে তো কোম্পানির মাসমাইনেও বন্ধ হয়ে গেলো ? তখন অসহায় বিধবাকে দেখবে কে ? অ্যাদ্দিন আমাদের দেশে সব নির্ভর ছিল ভগবানের ওপর, কিংবা আত্মীয়দের দয়ার ভিক্ষার ওপর। ভাল সায়েবরা আজকাল তাঁদের বাবুদের ভবিষ্যতের কথা ভাবেন, তাই পেনসনের ব্যবস্থা হচ্ছে। পেনসন বড় মিষ্টি জিনিস মা, কাজে হাজরে নেই অথচ মাস পয়লায় মাসোহারা আছে।"

হুটকো হালদার ব্যাপারটা আরও ব্যাখ্যা করলেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরও এই পেনসনের কথা জানতেন। সরকারি অফিসে পেনসনের হার ভাল, তাই ঠাকুর নিজেই অনেক ভক্তকে পরামর্শ দিতেন সরকারি চাকরি নিতে।



কোথায় হুটকো ? ঘনশ্যাম ঘোষালের বাড়ি থেকেই সেবার খোঁজ পড়েছে ঘনঘন।

আগে প্রায়ই এ বাড়িতে আসতেন হুটকো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে যেতেন। কিন্তু কোনো এক পর্বে যাতায়াত একটু কমে গিয়েছিল।

ঘনশ্যামের মা যে শেষপর্যন্ত হুটকোর বাড়িতে বিশেষ দূত পাঠাবেন তা হুটকো আশা করেননি। একটু চুপিচুপি আসতে অনুরোধ জানিয়েছেন মাতৃদেবী।

ব্যাপারটা কী তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না হুটকো। নিশ্চয় বন্ধুবর ঘনশ্যাম কোনো হাঙ্গামায় জড়িয়েছেন। কিন্তু বন্ধুকে তো চেনেন হুটকো, আজেবাজে বিপদে অযথা জড়িয়ে পড়বার পাত্র তো নন ঘনশ্যাম !

সেই সময় একদা ইস্কুলের সহপাঠী সনাতন সান্যালের সঙ্গেও নিয়মিত দেখা হতো হুটকো হালদারের। সনাতন সান্যালও তখন সিটি কলেজে কমার্স পড়ছে। দু'জনে প্রায়ই একসঙ্গে কলেজে যায়, একই বাসে ফিরে আসে হাওড়ার গোপাল ব্যানার্জি লেনে। ওইখানেই সনাতন সান্যাল একটা জীর্ণ ভাড়াটে বাড়িতে বসবাস করেন।

তখন এই সনাতনের সঙ্গে কতো বিষয়ে যে কথা হতো তা হিসেব করে লাভ নেই। কেউ যদি সেসব আলোচনা লিখে রাখতো তাহলে

খানদুয়েক কথামৃত হয়ে যেতো। আসলে, প্রত্যেক মানুষের যা শ্রেষ্ঠ তা অন্তরঙ্গ আলোচনার সময় সহজেই বেরিয়ে আসে, তখন পরীক্ষা পাশের ভয় থাকে না, পণ্ডিত লোকদের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা থাকে না, মানহানির ভীতিও থাকে না, কারও মান খোয়ানোর সম্ভাবনা থাকে না। চোখের সামনে বেশি লোক থাকলেই ভিতরের মানুষটা বাইরে বেরিয়ে আসতে সাহস পায় না।

কথাচ্ছলে দুনিয়ার কত লোক যে মহামূল্যবান হীরে-মানিক ছড়িয়ে গিয়েছেন তার হিসেব নেই। কিন্তু মুশকিল হলো, কেউ সেসব যত্ন করে টুকে রাখে না, রাখলে কত জ্ঞানের স্বর্ণখনি সাধারণ মানুষের হাতের গোড়ায় থাকতো।

এই ব্যাপারে হুটকো অনেক ভেবেছেন। রামকৃষ্ণ মঠের পূজ্যপাদ একজন সাধুর সঙ্গেও কয়েকবার কথা বলেছেন।

পৃথিবীর ক'জন মহাপুরুষ আর শ্রীম নামক ভক্ত কথাকারকে সেবকরূপে পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন? এতো নিষ্ঠা নিয়ে কে দিনের পর দিন মৌমাছির মতন স্বর্গীয় কুসুম থেকে মধু সংগ্রহ করে রেখে গিয়েছেন অনাগত কালের মানুষের জন্যে? তাও দেখো ব্যাপারটা, একটা কথামৃত ঠিকমতন হজম করতে, তার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে, তা স্মৃতিতে ঠিকমতো সাজিয়ে রাখতে বেশ কয়েক বছর লেগে যায়। শ্রীমর কাজের ব্যাপ্তি ও গভীরতা দেখে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই। যে-মানুষটার মুখনিঃসৃত বাণীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে আমরা তার তল খুঁজে পাই না।

কিন্তু আমাদের তো মনে রাখতে হবে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন মাস্টারমশাই—ইস্কুলে সপ্তাহে ছ'দিন চাকরি করতে হতো, আর তাঁর বসত বাড়ি থেকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ছিল বেশ দূর। তখন ঘোড়ায় টানা ট্রাম থাকলেও বাস ছিল না, মোটর গাড়ি ছিল না, ট্যাক্সি ছিল না। পদযুগল ভরসা, না হয় নৌকা, না হয় ঘোড়ার গাড়ি।

টেলিফোনও ছিল না যে ডায়াল করে নিত্য যোগাযোগ হবে। ফলে

যখন দীর্ঘ অবসর মিলতো কেবলমাত্র তখনই শ্রীম যেতে সক্ষম হতেন ঠাকুরের কাছে, চুপ করে শুনতেন সব কথাবার্তা, ফিরে এসে নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ঠাকুরের সঙ্গে যতো কথাবার্তা হয়েছে, যতো মানুষ এসেছে নানা ভূমিকায়, তার অতি সামান্য অংশই কথামৃতের রেকর্ডে স্থান পেয়েছে। তা ছাড়া রয়েছে প্রিয়শিষ্যদের জন্যে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ কথা। একান্তে প্রিয় চেলাদের ঠাকুর কখন যে কী উপদেশ দিয়েছেন তার হিসেব হারিয়ে গিয়েছে চিরদিনের জন্যে। বোধহয় সেসব আর কোনোদিন উদ্ধার হবে না।

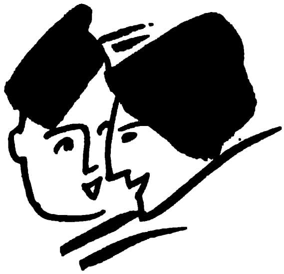
রাস্তায় যেতে যেতে সেবার হেসেছিলেন হুটকো হালদার। অনেকদিন আগে একবার এক পরমশ্রদ্ধেয় প্রাচীন সাধুকে ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার তেমন উল্লেখ নেই কেন কথামৃতে?"

এই শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "আমরা যে সময় যেতাম, যে সময় শ্যামপুকুরে, কাশীপুরে রাত জেগে রোগীর সেবা করতাম তখন মাস্টারমশায় উপস্থিত থাকতে পারতেন না।" তার মানে, সে সময় ঠাকুর মুখ বুজে বসে কালীনাম জপ করতেন তা নয়, হতো হাজার রকম কথা, যার কোনো হিসেব রইলো না এবারের লীলায়। পরের বার ঠাকুর আবার আসবেন এমন ইঙ্গিত তিনি দিয়ে গিয়েছেন। অবিশ্বাসী হলে ভাবুন, তিনি আশা প্রকাশ করে গিয়েছেন আবার আসবার। পরের বারে বোধহয় কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ বিজ্ঞান ইতিমধ্যে মানুষের অনেক বোঝা নিজের মাথায় নিয়ে নিয়েছে—ইচ্ছে হলে এখন একটা মানুষের জীবনযাত্রার সব দৃশ্য সব বাক্য অনন্ত সময় ধরে যন্ত্রবদ্ধ করে রাখা যায়।

কোথা থেকে কোথায় চলে আসছেন হুটকো হালদার। ইদানীং এই তাঁর দোষ। মাঝে মাঝে কারণে অকারণে কামারপুকুরের চাটুজ্যেমশাই এবং সিমলের দত্তমশায়ের জ্যোতির্ময় ছবি দুটো সমস্ত পার্থিব ঘটনার ওপর সুপার ইমপোজ হয়ে যায়। হুটকো হালদার দু'খানা চলচ্চিত্র একসঙ্গে দেখতে পান—একখানা সদ্য ঘটছে, আর একখানা বহু পুরনো

ছবি, যা অনেকদিন আগে যেন এই কলকাতা এবং হাওড়া শহরে তোলা হয়েছিল।

"বাপধন, কলকাতার সঙ্গে হাওড়ার নাম করছি বলে হেসো না। মনে রেখো, কলকাতায় যেমন দক্ষিণেশ্বর আছে হাওড়ায় তেমন বেলুড় মঠ আছে, একালের একমাত্র মহাতীর্থ বেলুড় মঠ যা মাত্র সেদিন সবার চোখের সামনে জন্ম নিল।"



ঠাকুরের সঙ্গে হুটকো হালদারও ভাবছেন সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কথা। সংসারের পাঠশালা থেকে মানুষ যে নিত্য পাঠগ্রহণ করে তার কোনো তুলনা নেই। একান্ত কথাবার্তায় তাই ছায়া পড়ে মহাজীবনের, স্পর্শ থেকে যায় মহাস্রষ্টার।

বন্ধুবর সনাতন সান্যালও ভেবেচিন্তে দেখেশুনে একসময় অনেক মজার কথা বলতো। কিন্তু পরে সেসব নিয়ে ভাবা একদম ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। সনাতনের ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত এতো দূর গড়াবে এবং এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে তা হুটকো বুঝবেন কেমন করে?

পরবর্তী সময়ে কেউ কেউ হুটকোর ওপর কিছু দোষ এবং দায়িত্ব চাপাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আরে বাপু, তোমাদের মনে রাখতে হবে এই হুটকো সাধুসঙ্গ করলেও তিনি নিতান্তই একজন অর্ডিনারি মানুষ।

মনে রাখতে হবে, দুনিয়ার সব লোককে অন্তর্দৃষ্টি দেবার জন্যে ঠাকুর কোনো আবেদনও মায়ের কাছে করে যাননি। শুধু মাঝে মাঝে প্রার্থনা করেছেন, ওদের চৈতন্য হোক। তা চৈতন্য হয়েছে কিছুটা হুটকো হালদারের। কিন্তু অনেক ঘটনা ঘটে যাবার পর। আগাম চৈতন্য যাঁদের হয় তাঁরা মহাপুরুষ, তাঁদের সংখ্যা এই চরাচরে আর কত জন ?

তবে হুটকো হালদার অস্বীকার করবেন না, তিনি সহপাঠী সনাতন সান্যালকে সেবার বলেছিলেন আমি একবার ঘনশ্যামের বাড়ি যাচ্ছি।

"না ডাকলে বড়লোকের বাড়ি বেশি যেতে নেই। ডেকেছে তাই যাচ্ছো।" বড়লোকের বাড়ি সম্পর্কে তির্যক মন্তব্য করেছিলেন সনাতন সান্যাল।

হুটকোর মাথায় অতশত বক্তব্য ঢোকে না। ভগবান বেশি বুদ্ধি দেননি বলে মাঝে মাঝে দুঃখ হয়েছে হুটকোর, আবার কখনও কখনও মনে হয়েছে, "ঠাকুর এই করেছ ভাল। আমার তুলনায় আমার প্রিয়জনরা যদি বোকা হয় তা হলে কী করে সংসারে শান্তি পাবো ? আর কার কাছেই বা যাবো বুদ্ধি নিতে ?"

হুটকোর স্থির ধারণা, এই সংসারে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা সবচেয়ে নিঃসঙ্গ।

বহুদিন আগে হাওড়া স্টেশন থেকে চাটুজ্যেহাটের বাসে চড়ে গোপাল মণ্ডল লেন স্টপেজে নেমে ঘনশ্যাম হালদারের জননী প্রিয়ংবদা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন হুটকো। ঘনশ্যামের মা যত্ন করে তাঁকে স্পেশাল মিষ্টি খাওয়ালেন, বিহার থেকে কে যেন খাজা এনেছে।

খাওয়াতে খাওয়াতে বললেন, "তোমাকে রোগা দেখাচ্ছে বাবা। খাওয়াদাওয়া ঠিক সময় করো তো ?"

হুটকো উত্তর দিয়েছেন, "খাওয়াটাই আমার 'দুর্বলতা' মাসিমা। খাইখাই করেই তো সময়টা কাটিয়ে দিই। কিন্তু আজকাল খাদ্যগুণের বড় অভাব—যা ভেজাল।"

ঘনশ্যামের আগামী জন্মদিনে বন্ধুদের কব্জি ডুবিয়ে খাওয়াবেন কথা দিলেন মাসিমা।

তারপর তিনি প্রসঙ্গ তুললেন। "হ্যাদাকে নিয়ে কী করি বলো তো ?

ওর বাবার ইচ্ছে কারবারে বসুক, বেশি পাশ করে ও কী করবে ? ও নিজেই তো ওর কোম্পানিতে কত বি.এ. এম.এ.-কে চাকরি দেবে।”

মাসিমা দুঃখ করলেন, তিনি পড়েছেন দোটানায়। একদিকে স্বামী ভোরবেলায় স্বপ্ন দেখেছেন নিজের কাজ গুটিয়ে আনতে। আর একদিকে ছেলের ধারণা, বিজনেসে ভাল লোকের জায়গা নেই। টাকার জন্যে দুনিয়ার সব লোকের কাছে ব্যবসাদারের সারাক্ষণ মাথা নিচু করতে হয়। কড়া আত্মসম্মান জ্ঞান থাকলে বিজনেসে সফল হওয়া যায় না।”

খান তিনেক খাজা ফিনিশ করে এবং এক গেলাস গরম দুধ খেয়ে হুটকো হালদার সেদিন বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তারপর ক'দিন ধরে নিজস্ব প্রস্তুতি চালিয়েছেন।

জানাশোনা লোককে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, “হ্যাঁগা, বিজনেস মানেই কি খারাপ ?”

অনেকে সোজাসুজি উত্তর দিতে পারেননি। অঙ্কটা তাঁদের গুলিয়ে যাচ্ছে—চোররাই ব্যবসাদার হয়, না ব্যবসাদাররা লোভে পড়ে চোর হয়, এ এক কঠিন প্রশ্ন।

এই সময়েই হুটকো হালদার একদিন বিবেকানন্দ ইস্কুলের মাস্টারমশাই কাসুন্দের হিমাংশুবাবু স্যারের সঙ্গে দেখা করেছেন। ওঁর ডাক নাম গুঁইরাম।

তিনি মধুর হেসে জানতে চাইলেন, “হায়ার এডুকেশন নেওয়ার পরে কী করবে হুটকো ?”

চান্স বুঝে হুটকো জিজ্ঞেস করে বসেছেন, “এই বিজনেস জিনিসটা কেমন, স্যর ?”

“আমি কী বলবো ? স্বয়ং ঠাকুর এবং বিবেকানন্দ এ-বিষয়ে মুখ খুলে গিয়েছেন। তুমি তো জানো, ঠাকুর একবার অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বড়বাজারের মাড়োয়ারি ব্যবসাদারদের অভিনন্দন নিয়েছিলেন। কারবারের বিরুদ্ধে তিনি তো তেমন মুখ খোলেননি। ব্যবসায়ে অমত থাকলে ঠাকুর নিশ্চয় বড়বাজারে যেতেন না।”

তারপর বিবেকানন্দর কথা উঠলো। গুঁইরামবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে

টুক করে একটা বই বার করে আনলেন। হুটকোকে বললেন, "আমাদের দু'কপি আছে, এক কপি আমার, এক কপি হেডমাস্টারের।" অর্থাৎ তাঁর সন্ন্যাসীসম দাদা সুধাংশুশেখর ওরফে হাঁদুদার।

"বইটা পড়ে তেমন ভাল লাগলে রেখে দিও—জীবনে অনেক কঠিন কোশ্চেনের সোজা উত্তর পেয়ে যাবে। অনেক জায়গায় পেন্সিলে আন্ডারলাইন করা আছে। কিছু মনে কোরো না।"

মনে করবেন কী ? দাগ দেওয়া বই পড়তে অনেক সময় মজা লাগে। লেখকের সঙ্গে অগ্রবর্তী একজন পাঠককেও চেনা যায় কিছুটা। যদিও পাঠককে চেনবার জন্যে কেউ বই পড়ে না। কিন্তু লেখকের মনের হাওয়া সত্যিই কোনদিকে বইছে তা আন্দাজ করা এক একসময় প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

বইয়ের নাম স্বামী-শিষ্য সংবাদ। আজকাল স্বামীর উল্লেখ থাকলেই লোকে স্ত্রীকে প্রত্যাশা করে, শিষ্যর ভূমিকা ক্রমশই স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গুঁইরামদার দাগ দেওয়া অনেকগুলো লাইন হুটকোর কাছে মহামূল্যবান হয়ে উঠলো।

ঘনশ্যামের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানের জন্যে ছুটির দিনে হুটকো নিজেই তার বাড়িতে হাজির হয়েছেন। মাসিমা ইতিমধ্যেই চিড়েভাজা পাঠিয়েছেন উইথ বাদাম। ছাঁকা ঘিয়ে ভাজা চিড়ের স্বাদ অন্যরকম ! মাসিমার. ভাজার পদ্ধতিও স্পেশাল, তেল জবজব করছে না অথচ চিড়েগুলো সাইজে ডবল হয়ে উঠেছে। এর পরে যে কি আইটেম আসবে সে খবর আগেই ফাঁস হয়ে গিয়েছে।

হুটকো হালদার দেখলেন, ঘনশ্যাম এই পারিবারিক বিজনেসের ব্যাপারে তখনও মনস্থির করেনি। ব্যাপারটা সত্যিই ঝুলে রয়েছে। এই ত্রিশঙ্কু ব্যাপারটা আজকাল হুটকোর তেমন ভাল লাগে না। স্বয়ং ঠাকুর বলেছেন, "হচ্ছে-হবে ওসব মেদাটে ভাব।" সংসার ত্যাগ করার সময়েও ওই ভাব চলে না।

বিবেকানন্দ এক প্রিয় শিষ্যকে বলেছিলেন, "পিপাসা পায়নি তাই বসে আছিস। বিবিদিষা প্রবল হয়নি, তাই মাগ ছেলে নিয়ে সংসার করছিস।"

ঘনশ্যামকে আজ প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবেন হুটকো। সুখে থাকতে ভূতে কিলোনো কেন? বাপের হাতেগড়া ব্যবসা রয়েছে, সাজানো বাগানে ঢুকে পড়ে গাছপালার ফল তারিয়ে তারিয়ে খাও।

কিন্তু বন্ধুবরের উদ্দেশে হুটকোর প্রথম প্রশ্নটি একটু অন্যরকম। বোলিং-এ বেশ স্পিন আছে। "হ্যাঁরে হ্যাদা, বি.এ. ডিগ্রি পকেটে পুরে এখন কী করতে মন চায়?"

সামনে আদর্শের অভাব নেই। বিবেকানন্দ ইস্কুলের হেডস্যার সুধাংশুবাবু যা করছেন, হিমাংশুবাবু যা করছেন, বাদলবাবু যা করছেন, তাই করা যেতে পারে। অর্থাৎ মাস্টারি। নিজের পেটও চলবে, দেশের ভবিষ্যৎও তৈরি হবে। ইংরিজিতে অত ভাল রেজাল্ট করে দ্বিজেন মিত্তির নিশ্চয় শখ করে এই ইস্কুলে মাস্টারি করে না।

"শোন্ হ্যাদা। দ্বিজেন মিত্তির শখ করে মাস্টারি করেন না, অর্ধেক সময় তো তিনি স্বদেশি করে জেলে থেকেছেন। কে তাঁকে চাকরিতে রাখবে এই ইস্কুল ছাড়া?"

চুপ করে রইলো ঘনশ্যাম। তখন হুটকো হালদার সাহস পেয়ে বললেন, "তুই তো জানিস, স্বামী বিবেকানন্দ একসময় বিদ্যাসাগরমশায়ের মেট্রোপলিটান ইস্কুলে মাস্টারিতে ঢুকেছিলেন, কিন্তু শিক্ষকতা-কার্য সম্পর্কে ওঁর মতামত শোন্: 'অনেকদিন মাস্টারি করলে বুদ্ধি খারাপ হয়ে যায়; জ্ঞানের বিকাশ হয় না। দিনরাত ছেলের দলে থেকে থেকে ক্রমে জড়বৎ হয়ে যায়।' স্নেহাস্পদ এক প্রাইভেট মাস্টারকে বিবেকানন্দ বুদ্ধি দিচ্ছেন, 'আর মাস্টারি করিস না।' যেখানে বসে তিনি এই কথা বলেছিলেন সে-জায়গা আমাদের এই খুরুট রোড থেকে বেশি দূরে নয়, খোদ বেলুড় মঠে, কাল ১৮৯৮।"

মাস্টারির নিন্দে একটু ঘাবড়ে দিয়েছে ঘনশ্যামকে। "বোঝা ভার, হুটকো। নিজে তো সারাক্ষণ মাস্টারি করে গিয়েছেন, জগতে লোকশিক্ষার দায় যেন পুরোটাই নিজের ঘাড়ে নিয়েছিলেন, অথচ মাস্টারির মধ্যে সুদূরপ্রসারী ভাল দেখতে পাচ্ছেন না।"

একটু থামলেন ঘনশ্যাম ঘোষাল। বললেন, "ভাই হুটকো, যখন

জন্মেছি তখন তো জড়ভরত হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা চলবে না। কিছু একটা তো করতে হবে!"

সেইটাই তো মহা সমস্যা, হুটকো হালদার বুঝতে পারছেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলছেন, "ওকালতি ভাল নয়, ডাক্তারি ভাল নয়, দালালি ভাল নয়।" ঠাকুরের এক নম্বর চেলা বলছেন, "মাস্টারি ভাল নয়।" সবাই তো আর জমিদারের বংশে জন্মায়নি।

একটু থেমে চিড়েভাজার বাটি শেষ করতে-করতে হুটকো তাঁর প্রিয় বন্ধুকে বললেন, "যাঁর নামে আমাদের ইস্কুল তিনি শ্রীমুখে চাকরির নিন্দা করছেন, বলছেন : 'কী হবে আর চাকরি করে? না-হয় একটা ব্যবসা কর্।' তারপর মোক্ষম চাল ছেড়েছেন, এই আমেরিকান এন আর আই হবার ধুয়ো উঠবার বহু বছর আগে। 'যদি তোর অর্থ-উপায়ের স্পৃহাই থাকে, তবে যা—আমেরিকায় চলে যা। আমি ব্যবসায়ের বুদ্ধি দেব। দেখবি পাঁচ বছরে কত টাকা এনে ফেলতে পারবি।'"

"বলিস কি হুটকো। শুধু মুক্তি নয়, টুপাইস কামাবার মতলবও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ দিয়ে যেতে উদগ্রীব হতেন।"

হুটকো তখন সাহস পেয়ে বই খুলে পড়তে লাগলেন : "...এতো বিদ্যা শিখে পরের দোরে ভিখারির মতো 'চাকরি দাও, চাকরি দাও' বলে চেঁচাচ্ছিস। জুতো খেয়ে—দাসত্ব করে করে তোরা কি আর মানুষ আছিস। ... ভারতে যেসব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তাই নিয়ে তার উপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিস তৈয়ের করে বড় হয়ে গেল ; আর তোরা বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে 'হা অন্ন হা অন্ন' করে বেড়াচ্ছিস!"

ঘনশ্যাম উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "আঃ হুটকো! তুই এমনভাবে আমার বুকে খোঁচা মারিস না। যতই নীচ হই, আমিও তোর মতন হাঁদু ভটচাজ্যির কাছে ইস্কুলে পড়েছি। ওঁর শিক্ষার ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে, কিন্তু এখনও উনুনের ছায়ের মধ্যে একটু আঁচ আছে। এসব শুনতে ভাল লাগে না।"

হুটকো বললেন, "বিবেকানন্দ ছিলেন, কলকাতার লাট্টু ছেলে, তার ওপর কায়েতের শাণিত বুদ্ধি। কামিনীকাঞ্চন সব ছেড়েছুড়েও সংসারের আসল খেলাটা খোলাখুলি ধরতে পেরেছিলেন। শোন্, গুঁইরাম ভট্‌চাজ্যি কোথায় কোথায় বক্তব্য আন্ডারলাইন করেছেন। 'চোখে কাপড় বেঁধে বলছিস, আমি অন্ধ, কিছুই দেখতে পাই না! চোখের বাঁধন ছিঁড়ে ফেল্...টাকা না জোটে তো জাহাজের খালাসি হয়ে বিদেশে চলে যা। দিশি কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় করে আমেরিকা-ইউরোপে পথে পথে ফেরি করগে। দেখবি ভারত-জাত জিনিসের এখনও কত কদর। আমেরিকায় দেখলুম, হুগলি জেলার কতকগুলি মুসলমান ঐরূপে ফেরি করে ধনবান হয়ে পড়ছে।'"

"লোকটা বলে কি!" বিস্ময় প্রকাশ করলেন ঘনশ্যাম ঘোষাল। "আমার দাদু চারুবিলাসের সঙ্গে কিংবা হাওড়ার মোটর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা অতীন দে'র সঙ্গে ওঁর দেখা হলে খুব খুশি হতেন। অতীনবাবু ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে ডানলপের কেরানি ছিলেন, তারপর ক্লান্ত হয়ে পার্টটাইম ব্যবসা খুললেন হাওড়া মোটর কোম্পানি।"

হুটকো বললেন, "তাহলে বুঝতেই পারছো ব্রাদার, সিচুয়েশন ইজ কেলেংকেরিয়াস। আত্মত্যাগ, আত্মশুদ্ধি, জপতপের কথা না তুলে আমাদের স্পিরিচুয়াল লাইফের খোদ কর্তা বুদ্ধি দিচ্ছেন বেনারসী শাড়ি কেটে সেই কাপড়ে মেমদের গাউন তৈরি করে বিদেশে ছাড়তে। প্রয়োজনে তিনিই বাজারে ইনট্রোডিউস করে দেবেন। সাফসোফ কথা বাবা। দুনিয়াটায় কেবল গিভ অ্যান্ড টেক—আদান এবং প্রদান। কর্তা চটিতং হয়ে উঠেছেন, তোরা কিছুই করবিনি, তোদের লোকে অন্ন দেবে কেন? এরপর কর্তা চড়বড় করে ফুটছেন। বলছেন, 'একটা ছুঁচ গড়বার ক্ষমতা নেই, তোরা আবার ইংরেজদের দোষগুণ বিচার করতে যাস—আহাম্মক। ওদের পায়ে ধরে জীবনসংগ্রামোপযোগী বিদ্যা, শিল্পজ্ঞান, কর্মতৎপরতা শিখগে।'"

এই কর্মতৎপরতা শব্দটা নিয়ে বহু বছর পরে হুটকো হালদারের সঙ্গে ঘনশ্যামের আবার কথা হয়েছিল।

কিন্তু সেসব অনেক পরের কথা। হ্যাদা ঘোষাল ততক্ষণে গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ হয়ে উঠেছেন। নিজের মনেই কী সব ভাবছেন।

ইতিমধ্যে গরম জিলিপির সাপ্লাই এসে গিয়েছে অন্দরমহল থেকে। সেই জিলিপির গুষ্টি নাশ করতে করতে হুটকো হালদার বলেছিলেন, "আমি শালা আর এইসব লিটারেচর পড়বো না। মাথাটা থরথর করে কাঁপে, শরীরটা কী করবে বুঝে উঠতে পারে না।"

"জানিস হুটকো, লোকটা মরে গিয়েও জ্বালাচ্ছে। দেখ্, কী বলছেন—যা হয় একটা কর। হয় কোনো ব্যবসায়ের চেষ্টা দেখ, নয়তো সন্ন্যাসের পথে চলে আয়।"



সেই থেকে ঘনশ্যাম ঘোষালের পরিবর্তন শুরু হলো। আর কোনও অনিচ্ছা প্রকাশ না করে ঘনশ্যাম ঘোষাল তার পৈতৃক কারবারে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেছেন। যদিও তাঁর ইচ্ছে বইপত্তর পড়ার অভ্যাসটা চিরকাল রেখে দেবেন।

হুটকো বলেছেন, "বিজনেসে নামলে পড়াশোনা চলবে না এমন দিব্য তো কেউ দেয়নি, হ্যাদা। বরং যতো চোখ খুলে রাখবে ততো কারবারের উন্নতি হবে। মালক্ষ্মীর সঙ্গে মা সরস্বতীর ঝগড়া ওসব সেকেলে কথা, এ যুগে তার কোনও মূল্য নেই।"

হ্যাদা ঘোষালের মা প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছেন ছেলের বন্ধুকে। বলেছেন, "বেঁচে থাকো, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তোমার কথাতেই আমার ছেলেটার মতি ফিরল। এখন খুব মন দিয়ে কারবার করছে।"

এমন মন দিয়ে কারবার চলেছে ঘনশ্যামের যে, বন্ধুদের সঙ্গেই দেখা হয় না। পিতৃদেব সুখবিলাসবাবুও কতকগুলো নিয়ম মেনে চলেন।

তিনি বলেন "কর্মস্থলে বন্ধুদের আসতে দিতে নেই। এটাও তো এক ধরনের মন্দির, স্বয়ং মালক্ষ্মী এখানে বিরাজ করেন। এখানে ইয়ার্কি ফচকেমির কোনো স্থান নেই।"

ওখানে ঘন ঘন আসবার মধ্যে ওই ট্যাংরা চাটুজ্যে জুনিয়র। কিন্তু ট্যাংরা চাটুজ্যে ওঁদের অ্যাটর্নিও বটে—মাঝে মাঝে কর্মস্থলে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। বিজনেসের পুরুত নাপিত হলো এই উকিল এবং অ্যাকাউন্টেন্ট। এঁদের বাদ দিয়ে কাজ করেছো তো মরেছো। কলিকালে হিসেবই নারায়ণ—যার হিসেবে ঠিক নেই তার পরমায়ু বেশি দিন নয়।"

ট্যাংরা চাটুজ্যে মাঝে মাঝে অন্য সুরে কথা বলেন। "সুখবিলাসবাবু আপনি অনিল ব্যানার্জির লাইন ফলো করতে চান না। স্টিভেডরের ব্যবসাকে সামনে রেখে ব্যানার্জিমশাই সময় থাকতে থাকতে গুছিয়ে নিচ্ছেন। এক একবার মোটা টাকা আসছে আর এক একখানা বাড়ি কিনছেন টালিগঞ্জে। ভাবতে পারেন, একই লেনে এগারোখানা বাড়ি পর পর একই লোকের ? এই লোক একসময় পরের বাড়িতে থেকে অপরের দয়ায় পড়াশোনা চালিয়েছেন। এখন এমন নেশা, অন্য কোনো রাস্তায় বাড়ি কিনবেন না। ওই রাস্তায় আরও সাড়ে চারখানা বাড়ি কেনবার জন্যে ভদ্রলোক উদগ্রীব হয়ে আছেন।"

"সাড়ে চারখানা কেন ?" জিজ্ঞেস করেছেন সুখবিলাস।

"আরে একটা বাড়ির অর্ধেক দলিল করে মর্টগেজ নিয়ে রেখেছেন। বাকি অর্ধেকটা এক বুড়ি আঁকড়ে বসে আছেন। বুড়িকে এত লোভ দেখালাম, বাড়তি টাকা দিচ্ছি, অন্য একখানা ছোট ফ্ল্যাট দিচ্ছি

সারাজীবনের জন্যে লিজ। কিন্তু বুড়ি কোন এক খেয়ালে শ্বশুরের ভিটে আগলে বসে আছেন—শাশুড়ি নাকি তাই বলে গিয়েছিলেন। শ্বশুর মরেছে, স্বামী মরেছে, এমনকী সমর্থ ছেলে মরেছে, তবু বুড়ির মতের পরিবর্তন হচ্ছে না।"

ব্যবসা বড় জটিল বিষয়। এ বিষয়ে হুটকো হালদারের কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। সম্পত্তি থাকা ভাল, না কাঁচা টাকা ভাল তাও হুটকো জানেন না। শুধু আনন্দ, বন্ধুটার ক্রমশই কারবারে মন বসছে। ধৈর্য, অশেষ ধৈর্য না থাকলে সোজা উডমন্ট স্ট্রিটে ব্যবসায়ী হয়ে টিকে থাকা যায় না।

ব্যবসার ফাঁকে-ফাঁকে ঘনশ্যাম কিছু কিছু পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। বন্ধুকে বলেন, "দিও দু' একখানা বইয়ের খোঁজ।"

আবার কখনও দুঃখ করেন, "স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া আর কোনও মহাপুরুষ বিজনেসের প্রশস্তি গান নি।"

"না রে, গান্ধী মহারাজ করেছেন," হুটকোর বিনীত নিবেদন।

"নিজে বেনে তো, তাই বিজনেসের গুরুত্ব ভালই বুঝেছেন।" রসিকতা করেছেন ঘনশ্যাম। "কিন্তু বড় কঠিন পথ দেখিয়েছেন তিনি। বিজনেস করে যদি কেউ টু পাইস করলো, তখন ওঁর কথা শুনতে হলে মনে কোনো শান্তি থাকবে না।"

"উনি কি সাধু হতে বলেছেন কোটিপতিকে?"

"তার থেকেও শক্ত পথ। সাধু তো ঝাড়া হাত-পা, টাকাপয়সার হিসেব রাখার কোনো দায় নেই তাঁর। কিন্তু এই গুজরাতি ব্যারিস্টার টাকার রহস্যটা খুব ভালভাবে তলিয়ে দেখেছেন। গান্ধি বলছেন, যত পারো রোজগার করো, বড়লোক হও। কিন্তু নিজের সুখের পিছনে কিংবা ভোগের পিছনে একটি টাকাও ঢেলো না। টাকার পাহাড়ের ওপরে সাধু সেজে বসে থাকো, মনে করো, তুমি এই সম্পদের ট্রাস্টিমাত্র।"

"এই অছি বা ট্রাস্টি ব্যাপারটা কী হ্যাদা?" জানতে চেয়েছেন হুটকো।

ঘনশ্যাম বলেছেন, "আমিও পরিষ্কার বুঝি না। তবে আন্দাজ করি, ট্রাস্টির পিছনে ট্রাস্ট বা বিশ্বাস কথাটা সারাক্ষণ উঁকি মারছে। অর্থাৎ তুমি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে টাকার খবরদারির জন্যে রয়েছো। এসব বিত্ত তোমার হয়েও তোমার নয়। তোমার কাজ শুধু দেখা গচ্ছিত সম্পদ আরও বাড়ছে কি না। যে যত সম্পদ বাড়াবে তার তত সুনাম হবে মানুষের সমাজে।"

হুটকো হালদার বলেছেন, "খুব চালাক লোক, মাইরি। সবাই তো ভালভাবেই জানে, দু দিনের জন্যে বই তো নয়। এই দুনিয়ায় আসা। সেই সময় একটু ভোগসুখে থাকা—তাও গান্ধি মহারাজের নির্দেশে বাতিল করো।"

এই সময়েই মস্ত একটা ব্যাপার নীরবে ঘটে গিয়েছে। ওই যে সনাতন সান্যাল। যাকে ছাড়া ঘনশ্যাম ঘোষালের এই কাহিনী সম্ভব নয়।

সনাতনকে এক সময় ইস্কুলে বাঙাল বলে ডাকতো সবাই, হুটকো হালদারও বাদ যাননি।

কিন্তু তারপর বন্ধুত্ব নিবিড় হয়েছে। বাঙাল বলে চটালে কী হয়, সনাতন ক্লাসের ব্রাইট বয়। রূপ এবং গুণ দুইতেই সেরা। তার ওপর আছে খেলাধুলো। সনাতন সান্যাল ক্রিকেটেও ক্লাসের মণি। কে যেন একদিন বললো, "বিবেকানন্দ ইস্কুলে ক্রিকেটে ভাল করে লাভ নেই। বেলুড় মঠের সাধুরা তো ক্রিকেট খেলেন না।"

কথাটা কীভাবে হিমাংশুবাবু স্যারের কানে গিয়েছিল। তিনি হুটকো এবং সনাতনকে ডেকে একদিন বললেন, "কে বললে স্বামীজি ক্রিকেট খেলা ভালবাসতেন না ? রবিঠাকুর ক্রিকেট খেলতেন বলে শুনিনি। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরও কখনও ক্রিকেটে আগ্রহ দেখাননি। কিন্তু বিবেকানন্দর কথা আলাদা। ছোটবেলায় নিজের পাড়ায় খেলতেন মার্বেল। দুর্দান্ত টিপ ছিল। তারপর পাড়ায় আরম্ভ করলেন ক্রিকেট, যার তখনকার নাম ছিল ব্যাটবল, তারপর সবাই বলতে আরম্ভ করলো ব্যাটম্বল। আমরা স্বামীজীর মেজোভাই মহিনবাবুর মুখে শুনেছি, ইটের উইকেটের সামনে দাঁড়িয়ে পিটিয়ে খেলতেন নরেন্দ্রনাথ।

বিলেতে যখন ছিলেন তখন স্টেনোগ্রাফার গুডইন ও গুরুভাই স্বামী সারদানন্দকে টিকিট কেটে ক্রিকেট খেলা দেখতে মাঠে পাঠিয়েছিলেন।"

জয় হোক মহিনবাবুর। উচিত ছিল হাওড়ার এই ইস্কুলে এসে সনাতনকে একটা প্রাইজ দিয়ে যাওয়া।

ছেলেধরা মাস্টার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত কোথাও ক্রিকেটের কথা কিছু লিখেছেন কি ? কথামৃত তো সাগর বিশেষ, ওতে ডুব দিলে পাওয়া যায় না এমন বিষয়ই নেই।

হিমাংশুবাবু সেবার মৃদু হেসেছিলেন। বলেছিলেন, "এই যে খেলাধুলা ও কথামৃত নিয়ে রসরসিকতা, এতেও আনন্দ। বোঝা যায় নিরস ভক্তদের খপ্পরে পড়ে এখনও বইটার বারোটা বেজে যায়নি। কিন্তু এটা আমাদের মনে রাখতে হবে, ঠাকুর জীবনের শেষ চার বছরে মাত্র পঞ্চাশটির মতন দেখাসাক্ষাতের বিবরণ তিনি ডায়রিতে লিখেছিলেন। অর্থাৎ গড়ে বছরে মাত্র বারোদিনের খবর ! বাৎসরিক দুটো সপ্তাহও নয়। কথামৃতে ঠাকুরের কিছু ভাবনাচিন্তার দু'একটু নমুনা পাওয়া যাচ্ছে এইমাত্র। কিন্তু সমুদ্র থেকে এক ভাঁড় জল তুলে রাখা মহাকালের জন্যে। যেমন রয়েছে কাঁকুড়গাছিতে এবং বেলুড়ে তাঁর ভস্মাধার। পূতাস্থি দেখে কি আর আসল মানুষটার হিসেব পাওয়া সম্ভব ?"

ইস্কুলে একেবারে অলরাউন্ডার বলতে যা বোঝায় তা এই সনাতন সান্যাল। পড়ায় ভাল, খেলায় ভাল, ছবি আঁকায় ভাল, গানে ভাল, লেখায় ভাল।

"সনাতন, ভগবান তো সব সাবজেক্টে ফুল মার্কস দিয়ে তোকে ধরায় পাঠিয়েছেন।"

সনাতন হেসেছে হুটকোর কথায়, কিন্তু বোধহয় একমত হতে পারেনি।

কারণ সনাতনের তেমন বিত্ত নেই। দেশভাগ হবার আগেই পিতৃদেব সেই ঢাকা শহর থেকে এই হাওড়ায় হাজির হয়েছিলেন ভাগ্যসন্ধানে। সনাতন সান্যাল-এর পিতৃদেব ওকালতি করতেন, থাকতেন সবুগলির

ভাড়াবাড়িতে। সনাতনরা দরিদ্র নয়, কিন্তু সাবেকি অবস্থাপন্ন বলতে এ-অঞ্চলে যা বোঝায় তা তাঁরা অবশ্যই নন।

সনাতন ক্রমশ তার আগ্রহের সীমানা কমিয়ে আনছিল। কারণ হিসেবে সে ব্যাখ্যা করেছিল, "তুমি নিজেই তো স্বামীজি থেকে কোটেশন দিলে হুটকো—সফল হবার জন্যে জীবনে ফোকাস প্রয়োজন। কোথাও নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। তাই আমি গান ছেড়েছি, ছবি আঁকা ছেড়েছি। কারণ আমাকে পড়াশোনায় ভাল করতে হবে। প্রয়োজনে আমাকে আরও ছাড়তে হবে, হুটকো।"

"ওরে আমার লগন চাঁদা ছেলেরে! তুমি দয়া করে অমন সুন্দর বাংলা লেখার অভ্যাস ছেড়ো না। ভগবানের আশীর্বাদ না থাকলে কেউ অমন গুছিয়ে ভাবতে পারে না।"

"লেখা জিনিসটা অত সহজ নয় হুটকো। ওটা লটারির মতন—কারও কারও ভাগ্যে লেগে যায়।"

"কেন আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ? বলতেনও ভাল, লিখতেনও ভাল।"

"ওসব আজকাল আর হবে না, হুটকো। এখন আমাদের এক একটা বিষয়ে স্পেশালাইজ করতে হবে। কেবল একটা দিকে মনটাকে নিবদ্ধ করতে হবে, কারণ তাতেই সমস্ত সঞ্চিত শক্তি ব্যয় হয়ে যাবে।"

সেসময় হুটকোর নিজের মধ্যেই টানাটানি চলেছে। যখন হাওড়াহাট থেকে অশ্লীল বই নিয়ে লুকিয়ে পড়ছে তখনও সনাতনকে ওইসব গছাবার সাহস জোটেনি।

ছেলেটার মুখের মধ্যে কোথাও ভীষণ পবিত্রতা ছিল। কোনোদিকে আর তখন নজর নেই। পরীক্ষায় ভাল করতে হবে।

সনাতন বলতো, "আমার ভীষণ চিন্তা হয় হুটকো। নিজের জন্যে নয়, ওই হাঁদুবাবু এবং গুঁইরামদার জন্যে। ওঁরা ঘরসংসার বিসর্জন দিয়ে আমাদের মানুষ করছেন। বড় আশা করে বসে আছেন বড় পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট নিয়ে এসে আমরা ওঁদের মুখ উজ্জ্বল করবো।"

হুটকো হালদার তখনও তেমন মজেননি। তিনি ভেবেছেন, সনাতন ছোঁড়াটা খোদ মক্কেলের খপ্পরে পড়েছে! খোদ মক্কেল মানে, হেডমাস্টার হাঁদুদা। তাঁর মাথায় মাত্র একটা মন্ত্র, যেটি ইস্কুলের যাত্রারম্ভের সময় লিখে দিয়েছিলেন বেলুড়মঠের প্রেসিডেন্ট স্বামী শিবানন্দ—'অনওয়ার্ড, অনওয়ার্ড, ডোন্ট লুক ব্যাক।'

আরে বাপধন! অতো অনওয়ার্ড হয়ে লাভ কী? মাঝে মাঝে একটু থমকে দাঁড়াও, প্রাণ খুলে বিশ্বভুবনের দিকে তাকিয়ে দেখো। পিছনদিকে তাকালেও মহাভারতের দোষ কি? আরে বাপু, যুদ্ধের সময় আচমকা এগোবার জন্যেও পিছু হটতে হয় কখনও কখনও।

হাঁদুদা আর যাই হোন, কাউকে টাকার মেশিন হবার জন্যে উৎসাহ দেননি। নিজে থেকে বিজনেসের কথা তেমন তিনি বলতেন না। আসলে নিজেই স্বীকার করতেন, ব্যবসায়ের ব্যাপারটা তিনি তেমন বোঝেন না।

হাঁদুদা বলতেন, "বিজনেস মানেই হিসেব। আর হিসেব জিনিসটাই ভয়াবহ। ছোট্ট একটা ইস্কুলের হিসেব রাখতে গিয়েই তো হিমসিম খাচ্ছি। হিসেবের ব্যাপারে বিবেকানন্দর গায়ে লেগেছিল খোদ বিদেশের হাওয়া। বাঙালি জমিদারি সেরেস্তার স্টাইলে পরের টাকা নিয়ে যা-খুশি করার কোনো উপায় নেই রামকৃষ্ণমিশনে। যেখানে হিসেবের অব্যবস্থা আছে সেখানে ঠাকুর স্বামীজির নাম থাকলে শেষপর্যন্ত মহাপাপ হতে বাধ্য। সামান্য ইস্কুলেই যখন এতো হিসেব, তখন বিজনেসে কী ভীষণ ব্যাপার।"

হাঁদুদার প্রিয় ছাত্র সনাতন সান্যাল, সুতরাং বিজনেসে আসবে না এটাই স্বাভাবিক।





কিন্তু কোথা থেকে যে কী হয় ! এবং এইরকম হয় বলেই তো দুনিয়াতে এতো গল্প তৈরি হয়। মানুষ যা প্রত্যাশা করে এবং যা প্রত্যাশা করে না তা মাঝপথে মাঝেমাঝে ধাক্কা খেয়ে বিপদ ঘটায়।

"বিভিন্নমুখী শক্তির এই সঙঘর্ষটাই তো গল্প," বলতেন সুধাংশুবাবু স্যর। "বিবেকানন্দর জীবনটা দেখো। ইংরিজি কালচারে দুঁদে শিক্ষিত ছোকরা একজন গ্রাম্য পুরোহিতের প্রেমে পড়ে গেলেন—এই আকর্ষণ সমস্ত প্রত্যাশার বাইরে। তাই গল্প। নরেন দত্ত বাপের পথ ধরে উকিল হলে, অ্যাটর্নি হলে তেমন কোনো গল্প হতো না।"

"বিখ্যাত ব্যারিস্টার স্যার ডবলু সি বনার্জির জীবনটা তা হলে গল্প নয় ?" প্রশ্ন করেছিলেন সনাতন গম্ভীরভাবে।

খুশি হয়েছিলেন হাঁদুদা। বইটা বন্ধ করে, চাপা হাসিতে মুখ ভারিয়ে ক্লাশে তিনি বলেছিলেন, "বনার্জি লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছেন, জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হয়েছেন, এটা গল্প, কিন্তু তেমন জোরদার গল্প নয়। ওটাকে শক্তভাবে গল্পের দড়িতে বাঁধতে হলে তোমাকে বলতে হবে, বিলেত যাবার জন্যে বনার্জি রক্ষণশীল বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। কিন্তু মাকে তিনি [illegible] বাসতেন। অসুস্থ মাকে দেখবার জন্যে প্রায়ই তিনি বাড়ি যে[illegible] কিন্তু কখনও

ঘরে ঢুকতেন না। সারাদিনে কোর্টের বিশাল রোজগার মায়ের জন্যে দরজার চৌকাঠের সামনে রেখে দিয়ে তিনি চলে আসতেন। এবার বোধহয় একটা গল্প পাওয়া গেলো। তোমার কী মনে হয় সনাতন ?"

এই ধরনের ক্লাশ করতে ছেলেদের খুব ভাল লাগতো। আড্ডাকে আড্ডা, জীবনীকে জীবনী। ইতিহাসকে ইতিহাস। সনাতন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, "আর একটা উদাহরণ দিন না স্যর।"

মিষ্টি হেসে সুধাংশুবাবু স্যর বললেন, "বড়লোকের ছেলে বিবেকানন্দ। ছোটবেলায় দাসদাসী পরিবৃত হয়ে থাকতে অভ্যস্ত ছিলেন। বাবার অঢেল উপার্জন। তিনি নিজেও মস্ত ব্যারিস্টার হতে পারতেন। কিন্তু সব সুখ, সব সমৃদ্ধি বিসর্জন দিয়ে বেছে নিলেন চরম দারিদ্র্য। বরানগর ভূতের বাড়িতে সন্ন্যাসজীবনের প্রথম পর্বে ওঁরা যখন থাকতেন তখন গুরুভাইদের আর্থিক কষ্ট বর্ণনা করা যায় না। প্রথমে সব গুরুভাইয়ের একখানা করে কাপড় ছিল এবং কয়েকজোড়া চটিজুতো। কিছুদিন পরে সকলের খালি পা। কাপড় দুটুকরো করে বহির্বাস করে পরতেন, ভিতরে একটা কৌপীন। ক্রমে বহির্বাস ছিঁড়ে গেলো। মোটা দু'খানা বহির্বাসে ঠেকলো। যে গুরুভাই বাড়ির বাইরে যেতেন তিনি কৌপীনের ওপর বহির্বাস পরে বেরুতেন। শেষে কৌপীনও ছিঁড়ে গেলো। বিবেকানন্দর ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখছেন, প্রথম প্রথম সকলকে উলঙ্গ দেখে লজ্জিত হতাম। শিবানন্দ বললেন, 'কিরে ! আমাদের ন্যাংটো দেখে তোর লজ্জা হচ্ছে ? আমরা সাধু হয়েছি, আমাদের লজ্জা বলে কিছু নেই।' বিবেকানন্দর নিজেরও সেই একই অবস্থা। দাদা উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছেন, আর ভাইকে বলছেন, 'গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দে তো।'—এটাও এক ধরণের অসাধারণ গল্প বলা চলতে পারে।"

হাঁদুদা বলতেন, "দেখবে, আমাদের সকলের জীবনেই আমাদের অজান্তে সারাক্ষণ কোনো-না-কোনো গল্প তৈরি হচ্ছে।"

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। হাঁদুদারা তিন ভাই আজন্ম বহ্মচারী, অথচ কেউ সন্ন্যাসী হলেন না। মঠের মন্দ অভ্যাসগুলোও হাঁদুদা নিয়েছেন। যেমন কড়া চা-পাতার প্রতি টান, ধূমপানে আনন্দ। জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা শশাঙ্ক একসময় মেজভাই সুধাংশুকে বুঝোচ্ছেন, 'ওরে তুই বিয়ে কর।' মেজ সুধাংশু তাঁর ছোটভাই হিমাংশুকে বোঝাচ্ছেন, সংসার আশ্রমের মূল্যবান ভূমিকা এবং প্রয়োজন। ছোট তাঁর ভাইকে বলছেন, "বিয়ে করার উপকারিতা সম্বন্ধে স্বামীজির মস্ত লেকচার আছে। মায়ের ইচ্ছে অনুযায়ী তিনি ভাইকে বিয়ের কথা বোঝাচ্ছেন।"

"আসলে, এঁরা পিকুলিয়র লোক, বুঝলি প্যাটারসন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর চিরকাল চোরকে বললেন চুরি করতে এবং গেরস্তকে বললেন ঘর সামলাতে!" এই ধরনের সহাস্য মন্তব্য করতেন মেজ ও ছোট ভাই।

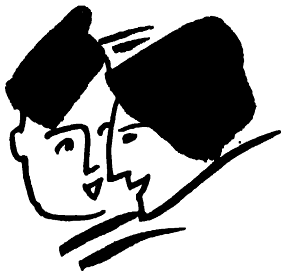
ছাত্র সনাতন সান্যাল সেসময় অনেক বই মন দিয়ে পড়তো। সে চুপি চুপি বলতো, "কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর অনেক ছাত্র সন্ন্যাসী হয়েছিল। এঁরা দুই ভাই একই কাজে ওই লাইনে এসেছেন, শ্রীম-র মতন তাঁরা 'ছেলেধরা' হতে চান।"

কী জানি, কোনটা সত্যি, আর কোনটা নয়। বিবেকানন্দ ইস্কুলের ছেলেরা দল বেঁধে গেরুয়া গ্রহণ করেনি, কিন্তু অনেকেই ঠাকুরের মূল্যবোধ পেয়েছে কিছুটা। বিবেকানন্দ ইস্কুলের ছেলে অন্যায় করে না এমন নয়, কিন্তু প্রতি অন্যায়ের সঙ্গে তার বুকের মধ্যে কোথায় একটু খচখচ করে। বুকের ভিতরের এই বিবেক নামক ছোট্ট ফিল্টারটুকু বড় ভয়াবহ জিনিস। কিছুতেই তাতে ফাঁকি দিয়ে কোনো অন্যায় করা যায় না। কোনো যুক্তিতর্ক তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় না। খচ করে তার প্রকাশ্য সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়—বুঝতে অসুবিধা হয় না কোনটা ন্যায় এবং কোনটা অন্যায়। একবার বুকের ভিতরের আম্পায়ার যদি বললো, 'নো-বল' তাহলেই শুরু হলো বিবেকবান মানুষের মুশকিল।

হাঁদুদা নিজেই একবার ক্লাসে বলেছিলেন, "সবাইকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। সে যে তোমার হাঁড়ির খবর জেনে বসে আছে!"

না, এখন সুধাংশবাবুর স্নিগ্ধ অথচ বিচিত্র জীবনের কাহিনীতে আটকে পড়লে চলবে না। তাঁর কোনো কথাসাহিত্যিক ছাত্রই তাঁর জীবন থেকে

গল্প খুঁজে বার করবার স্বার্থপরতায় নামবে না। হাঁদুদা, গুঁইরামদা এঁরা গল্প নন, এঁরা এক একটা 'এগজাম্পল'—দুনিয়াকে দেখাবার উদাহরণ। এই ভোগসুখ, শরীরসুখ এবং স্বার্থসুখের যুগে এখনও পবিত্র পুষ্পের মতো মানুষ কী করে বিকশিত হয় এবং অনুপ্রেরণা বিতরণ করতে পারে তার নমুনা।



আর ঘনশ্যাম ঘোষাল এবং সনাতন সান্যাল এঁরা তো হুটকোর আত্মস্মৃতি। সেই বাল্যকাল থেকে দেখে আসা—এঁদের শুরু, এঁদের বিকাশ, এঁদের দ্বন্দ্ব সবই তো স্মরণীয়। এঁদের পরিণতিটাও হয়তো হুটকো হালদারকে নিজের চোখে দেখে যেতে হবে।

হুটকো হালদার বুঝতে পারেন, যেন সংসারের এক এক প্রেক্ষাগৃহে এক এক নায়ককে নিয়ে নাটক শুরু হয়েছে। এ নাটকে উৎসাহী দর্শকের কোনো টিকিট নেই, সবাই ফ্রি পাশে শো দেখতে এসেছেন। যা-কিছু মূল্য তা গুনবে নাটকের মূল চরিত্ররা। এঁরা নিজেরাও জানেন না, নাটকের পরিণতিতে কী রয়েছে। মিলন না বিয়োগ ?

হুটকো হালদার কেবল জানেন, সংসারের পরিচিতজনদের জীবন-নাটকে সবাই মিলন চায়, সেই জন্যে প্রাণপণ চেষ্টাও করে। কিন্তু নিষ্ঠুর ঘটনার স্রোত তার নিজের খেয়ালের বশে বয়ে চলে, কেউ যেন

একেবারে নাটকের আদিতে চুপি চুপি চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে কাকে হারাতে হবে কাকে জেতাতে হবে।

সংসারের নাটকে ঘনশ্যামকে যেন জেতাবারই নির্দেশ রয়েছে। তাই সুড়সুড় করে সে বাবার কারবারে যোগ দিয়েছে। তরতর করে ব্যবসায় মন বসে গিয়েছে।

গদিতে বহুক্ষণ বসে থাকবার পরে বাবা নিজেই এক একদিন বলেন, "হ্যাদা, আর দেরি করে লাভ নেই। টাকা গোনা শেষ করে বাড়ি চল। যদি হাওড়া স্টেশনে জ্যাম থাকে তাহলে ঝাড়া একঘণ্টা অপচয় হবে।"

প্রতি সন্ধ্যায় সাড়ে আটটার সময়ে বড়বাজারে এবং হাওড়া ব্রিজে কেন ট্রাকের ভিড় হয় তা বোঝা যায় না।

ঘনশ্যাম এ-বিষয়ে খোঁজ করেছেন। বলেছেন, "বাবা, ট্রাকওয়ালাদের দোষ নেই, যতো দোষ পুলিশের! আটটার আগে ওদের নড়তে দেয় না স্ট্র্যান্ড রোড থেকে। তারপরেই শহর থেকে বেরুবার জন্যে ট্রাকওয়ালাদের মধ্যে হৈ-হৈ পড়ে যায়। ওদেরও তো যেতে হবে অনেক দূর।"

ঘনশ্যাম আজকাল আর ট্রাকের ওপর রাগ করেন না। এই ট্রাক আছে বলে বিজনেস বেঁচে আছে। দুনিয়ার কোথায় না ওরা যাচ্ছে, মাল আনছে এবং মাল নিয়ে যাচ্ছে। তবে না এতো বড় শহর কলকাতা এবং কোটি কোটি মানুষ খেয়ে পরে টিকে রয়েছে।

হুটকো একদিন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছেন, "সওদাগিরি কেমন লাগছে, হ্যাদা?"

ঘনশ্যাম স্বীকার করেছেন, "মজা আছে বিজনেসে, কেন মিথ্যে বলবো হুটকো। রবিবার মাঝে মাঝে আঙুলগুলো নিসপিস করে ওঠে নোটের বান্ডিল গুনবার জন্যে। হোলসেল কারবারে ক্যাশই ভগবান, নগদই নারায়ণ, বুঝেছো ব্রাদার।"

নিশ্চিন্ত হয়েছেন হুটকো হালদার। তাহলে ঘনশ্যামের মায়ের ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে, কাজে আঠা ধরে গিয়েছে পুত্রের, রবিবারেও বন্ধুবর ঘনশ্যাম নোট গোনার রোমাঞ্চ অনুভব করছে।

আর সনাতন স্যানাল ইদানীং ঘোষালদের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেছে। সনাতন তখন সওদাগিরি অফিসে কেরানির চাকরি নিয়েছে।

ব্যাপারটাও তখনও ঠিক বুঝতে পারেননি হুটকো। ঘনশ্যামও ব্যাপারটা কখনও খোলতাই করেননি। রোজগেরে ছেলের ছুটির দিনে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার প্রকৃতি অন্যরকম হতো।

ঘনশ্যামের আদরের বোন সঙ্ঘমিত্রাও কলেজে ঢুকেছে। সে মাঝেমাঝে বলে, "দাদা থিয়েটারে নিয়ে চলো, রবিবারে রঙমহলে ও স্টারে স্পেশাল শো হয়।" শিশির ভাদুড়ি তখনও মার মার কাট অভিনয় করছেন। জহর গাঙ্গুলি আছেন মঞ্চ আলো করে। নির্মলেন্দু লাহিড়ীও আছেন।

সনাতন ও হুটকো যৌথভাবে উৎসাহ দেখান। বলেন, "যাও না হ্যাদা, মিত্রাকে নিয়ে কলকাতায় নাটক দেখতে। গেলেই দামী টিকিট পেয়ে যাবে।"

হ্যাদা নাটক পাড়ার দায়িত্বটা বাবার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইলো। কিন্তু বাবা বলেন, "পয়সা দিয়ে বক্সে বসে আমি মানুষের দুঃখ দেখতে চাই না। আজকালকার বাংলা নাটক মানেই তো কান্না। সারা সপ্তাহ খেটে রবিবারে আমি একটু আনন্দ না করে কেন কাঁদবো?"

মিটমিট করে হাসেন হুটকো। বলেন, "কেঁদেও আনন্দ পায় অনেক মানুষ।"

"থিয়েটারটা বাঙালির নিজস্ব ভালবাসার জিনিস। সিনেমাটা কখনও ঠিক স্বভাবে ধরেনি বাঙালির", হুটকো একসময় বলেছেন।

ঘনশ্যাম উত্তর দিয়েছেন, "সিনেমা-থিয়েটারের লাইনটা বড় গোলমেলে। যা সব গপ্পো আজকাল কানে আসে!"

একমত হয়নি সনাতন। সে বলেছে, "মস্ত লাইন হে। স্বয়ং রামকৃষ্ণ ছিলেন থিয়েটার পাগল। পাশ পেলেই ছুটতেন থিয়েটার দেখতে। কখনও কখনও নিজের টাকা খরচ করে টিকিট কিনতে চাইতেন। নাট্য রসিকরা কখনও কমদামের সীটে বসে থিয়েটার দেখতে চায় না।"

হুটকো সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুলেছেন, বলেছেন, "ঠাকুর রামকৃষ্ণ এখন থিয়েটারের দেবতা হয়ে উঠেছেন। সেই গিরিশ ঘোষ, বিনোদিনী থেকে ভক্তির জোয়ার আরম্ভ হলো। তারপর তিনকড়ি, তারাসুন্দরী নাম করে

যাও, সব ঠাকুর বলতে অজ্ঞান। থিয়েটারের মেয়েরা নিয়মিত বেলুড়ে আসতেন বলে, কত লোকে কত নোংরা কথা বলেছে। অথচ ওরা জানে না স্টারের বিনোদিনীর কথা। ঠাকুরের প্রভাবে বিনোদিনীর জীবনটা অন্যরকম হয়ে গেলো। ঠাকুরের অসুখের সময় তাঁকে খুব দেখবার ইচ্ছে, কিন্তু নটীকে কে যেতে দেবে ওঁর কাছে? তখন কাণ্ড করে বসলেন বিনোদিনী। স্পেশাল মেক-আপ নিয়ে কোটপ্যান্ট পরে পুরুষ সাজে শ্যামপুকুরের বাড়িতে হাজির হলেন। কেউ বুঝতে পারলো না। মজার মানুষ যিনি তিনি অবশ্য মজা পেলেন।"

সেই জন্যে যে-বইতে মজা থাকে তা পছন্দ করেন হুটকো এবং সনাতন।

সনাতন বলেছে, "তুই দেখবি, ভাল ভাল নাটকে অনেক মজা থাকে। ঠাকুরের নামে সংসার ছেড়ে যারা নেংটি পরে বেরিয়ে পড়লেন দুনিয়াকে ত্রাণ করতে, তাঁরা সবাই মজার মানুষ। মজা করতে-করতে এবং মজা পেতে-পেতে এঁরা কত কঠিন কাজ সেরে ফেললেন দুর্জয় সাধনায়। এই জন্যেই তো বাঙালিরা এখনও ঠাকুর-স্বামীজি বলতে পাগল। হুঁকোমুখো হ্যাংলাকে বাঙালি সমীহ করে, কিন্তু কখনও আপন করে নেয় না।"

একবার ঘনশ্যামকে নরম করা গিয়েছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে মোটা টাকা লেনদেনে কী একটা লাভ হয়েছে—ইংরিজিতে যাকে বলে 'উইন্ড ফল'।

ঘনশ্যাম রসিকতা করেছেন, "আজকালকার ঝড়ে গাছের আম পড়ে না ভাই, এখন আংটা দিয়ে আম পাড়তে হয়। বিজনেসে আমপাড়ার আংটা হলো বুদ্ধি এবং কৌশল। বুঝেছো ব্রাদার?"

ওসব কথায় সেদিন তেমন পাত্তা দেওয়া হয়নি। ঘনশ্যামকেই জবাই করা হলো। বন্ধুদের মধ্যে হ্যাদাই একমাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।

ফলে রঙমহলে ভাল সিটে বসে মিত্রার সঙ্গে থিয়েটার দেখা। খুব খুশি মিত্রা। হৈ হৈ করতে-করতে বাড়ি ফিরে বলেছে, "হুটকোদা সঙ্গে থাকলে থিয়েটারের মজাই অন্য। ফিস ফিস করে এমন টিপ্পনী কাটবেন যে হাসি চাপতে দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা।"

সনাতন অবশ্য সারাক্ষণ গম্ভীরভাবে নিজের আসনে বসে ছিল। বিশেষ

কোনো মন্তব্যই করেনি। শুধু ফেরবার পথে, মিষ্টির দোকানে কচুরি খাইয়েছে সমস্ত পার্টিকে, উইথ ছোলার ডাল। তারপর হুটকোর প্রচেষ্টায় অবশ্যই এসেছে গরম জিলিপি।

"খেয়ে নাও, খেয়ে নাও, এইসব জিনিসই প্রিয় ছিল রামকৃষ্ণদেবের। মরবার কিছুক্ষণ আগেও বলছেন, আমার পেটে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ির ক্ষিধে। রসিক লোক, ক্যান্সারের যন্ত্রণার কথা আপনজনদের বুঝতে দিচ্ছেন না। আর ধন্য সব চেলা। ঠাকুর যেহেতু ইচ্ছে থাকলেও গলা দিয়ে খিচুড়ি নামাতে পারেননি, তাই শত শত বছর ধরে লাখ লাখ মানুষকে জন্মদিনে খিচুড়ি খাইয়ে যাবার ফন্দি আঁটছে চেলারা।"

ওই যে সবাই মিলে থিয়েটার যাওয়া, ওই খানেই বোধহয় ভবিষ্যৎ সঙ্ঘাতের সূত্রপাত।

সঙ্ঘমিত্রা থিয়েটার দেখে আনন্দপ্রকাশ করে বলেছে, "হুটকোদা আপনি না বললে দাদা শুনবে না, আবার থিয়েটারের টিকিট কাটাতে হবে।"

মিত্রা ডাকনাম, পুরো নামটা সঙ্ঘমিত্রা। পরের বারে ফ্রন্ট-রো টিকিট কাটতে বলেছে দাদাকে সঙ্ঘমিত্রা। সনাতন বলেছে, সামনের রো ভাল নয়। রসিক যাঁরা তাঁরা বসেন থিয়েটারের চতুর্থ রো-তে।"

হুটকো মন্তব্য করেছেন, "দূরেও নহে, কাছেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে, বুঝেছো মিত্রা! ঠাকুর আমাদের মঞ্চের রাজাও বটে ত্রাতাও বটে। থিয়েটারের সবাই চিঠির মাথায় এখনও লেখে রামকৃষ্ণ শরণম্।"

এই থিয়েটারে যাওয়াকেই কেন্দ্র করে যে সনাতনের বুকে নতুন নাটক গড়ে উঠছে তা সাবধানী হুটকোর নজরও এড়িয়ে গিয়েছে।

এর কিছুদিন পরেই হুটকো ওরফে হারাধন হালদার চাকরির সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। অনেক সন্ধানের পর চাকরি অবশেষে জুটেছে, কিন্তু একটু বাঁকা পথে। অন্যকোনো উপায় ছিল না। যা দিনকাল, যা চাকরির বাজার।

সোজা বাংলায়, কাজ এবং কন্যে দুটোই একসঙ্গে সংগ্রহ করতে হয়েছে।

অবশ্য চাকরিটা আয়ত্তে আনার প্রয়োজন সবার আগে। কিন্তু কাজটা বাগিয়ে নিয়ে মেয়ের বাবার প্রত্যাশা পুরণ না করার মতন মানুষ হুটকো নন। কথার খেলাপ ঠাকুরেরও দুচোখের বিষ ছিল। কিন্তু এই বিয়েতে শেষপর্যন্ত হুটকোর পিতৃদেবের সম্মতি মেলেনি। কন্যার গ্রহ-নক্ষত্রের কয়েকটি লক্ষণ নাকি তেমন ভাল নয়। হুটকো কিন্তু নিজের প্রতিশ্রুতিতে অটল।

হুটকো বলেছেন, "যেমন চাকরি তেমন পাত্র, যেমন পাত্র তেমন পাত্রী। কথা যখন দিয়েছি তখন আর নড়চড় নেই।" ভাবী শ্বশুরমশাই স্বয়ং বহু চেষ্টায় ভাবী জামাতাকে জুটিয়ে দিয়েছেন জাহাজ ব্রোকার আপিসে কাজ।

সেই কাজ নিয়ে প্রথমে কলকাতায় পোস্টিং হয়নি। হুটকো হালদার কেরানির চাকরি নিয়ে প্রথমে গিয়েছেন কোচিনে। সেখান থেকে বদলি হয়েছেন বোম্বাইতে। মস্ত বড় দেশ এই ভারতবর্ষ, শত শত যোজন ধরে সমুদ্রতীর— অনাদি কাল থেকে ভারতবর্ষ যোগাযোগ রেখেছে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে অর্ণবপোতের আশ্রয় থেকে। বন্দর ছাড়ো যাত্রীরা সব, সময় এসেছে।

হুটকো অবশ্য একবার আচমকা কলকাতায় হাজির হয়ে ঘনশ্যামের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেয়ে গিয়েছেন। পাত্রী স্থানীয়া—শালখিয়ার ব্যানার্জি বংশের মেয়ে। বলবার কিছু নেই—মিত্রার কলেজ সহপাঠিনী।

"তুই সব ব্যাপারেই ফার্স্ট, ঘনশ্যাম। রোজগারে আমাদের মধ্যে ফার্স্ট, টোপর পরে ছাদনাতলার দৌড়ে ফার্স্ট, নাইবা নামের পাশে লিখতে পারলি এম.এ.। কালে কালে কত এম.এ.-কে তুই চাকর হিসেবে রাখবি। উচ্চশিক্ষা না পাওয়ার দুঃখ ভোলাতে চেষ্টা করেছেন হুটকো হালদার।

ঘনশ্যামের বিয়েতে বেশ হৈ চৈ হয়েছে। বন্ধুবান্ধবরা এসেছে, প্রথম বন্ধুর বিয়ে বলে কথা। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে শুধু আসেননি হাঁদুদা। উনি বিয়েবাড়িতে বড় যেতেন না। সন্ন্যাসীসদৃশ মানুষ। ওঁরা বিয়েতেও যান না, শ্রাদ্ধেও উপস্থিত থাকেন না। শুধু পরের ছেলেদের নিজের ছেলের চেয়েও যত্ন করে মানুষ করেন। সবার প্রতি সবরকম কর্তব্য করেন কিন্তু কখনও মায়ায় জড়িয়ে পড়েন না।

বন্ধনের মধ্যে এমন মুক্তির অনেক সুবিধে আছে। নিজের ছেলের বয়স বাড়ে, নিজের সংসার সৃষ্টি করে তারা ক্রমশ বাবা-মা থেকে দূরে সরে যায়, কিন্তু হাঁদু ভট্টাচার্যের সে রিস্ক নেই। প্রতিবছর ইস্কুলে নতুন ছেলে আসে পুরনো ছেলেদের স্বভাব নিয়ে, হাঁদুদার দৃষ্টিতে ছেলেদের বয়সই বাড়ে না। তাদের স্বভাব এক, সমস্যা এক, দায়িত্ব এক, শুধু মুখ আলাদা। তারপর তারা একদিন মিশে যায় পৃথিবীর জনস্রোতে। তখনও কৌতূহল থেকে যায়, কিন্তু বিপজ্জনক কোনো টান থাকে না।

হাঁদুদা একবার হেসে বলেছিলেন, "এ যেন পরের কোম্পানিতে মন দিয়ে খাটা। প্রাণ খুলে কাজ করার আনন্দ তোমার, কিন্তু লাভ-লোকসানের সামান্য দায়িত্বও তোমার নয়।"

আরও বলেছিলেন, "পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে গুলিচালনার মজা পেতে হতে হলে, নিজে ঘরসংসার কোরো না, স্রেফ ইস্কুল মাস্টার হও।"

রসিক প্যাটারসনদা প্রশ্ন করেছিলেন, "বলছো তো লোভনীয় কথা! কিন্তু বুড়ো বয়সে দেখবে কে? আশ্রয় দেবে কে?"

হাঁদুদা আনমনা হয়ে উত্তর দিয়েছেন "জুটে যাবে প্যাটারসন। ক'জন ব্যাচেলরকে তুমি রাস্তায় শুয়ে বিনা সেবায়, বিনা চিকিৎসায় মরতে দেখেছো? সবাই নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে দুনিয়ায় আসে। তুমি ঠাকুরের চেলা রামকৃষ্ণানন্দের কথা শুনেছো? একবার ধনীভক্ত ওঁকে একটা বাড়ি দিতে চাইলো, উনি নিলেন না। বললেন, ওসব হাঙ্গামায় গিয়ে লাভ নেই। সাপ আর সাধু চিরকাল পরের গর্তে জীবন কাটিয়ে যায়। পরের গর্তে জীবন কাটানোর যে কি সুখ তা গেরস্তরা বুঝতে পারবে না।"





ঘনশ্যামের বিয়েতে অবশ্যই অনেক গণমান্য এসেছিলেন। কিন্তু সেই ভিড়ের মধ্যে সনাতনকে খুঁজে পাননি হুটকো হালদার। ভুল করে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন ঘনশ্যামকে, "সনাতনের দেখা পাচ্ছি না।"

ঘনশ্যাম যেন একটু অস্বস্তিতে পড়েছিলেন, ঠিকমতন উত্তর দেননি।

প্রায় একই ব্যাপার ঘটেছিল সনাতনের বাড়িতেও। ব্যাপারটা সনাতনও এড়িয়ে গেলো। অথচ প্রশ্নটা সহজ মনেই করেছিলেন হুটকো, কিন্তু প্রশ্নের বলটা পাশ কাটিয়ে অন্যদিকে নিয়ে গিয়ে সনাতন বললেন, "আমি আমার পথ খুঁজে পেয়েছি, হুটকো। আমি দুনিয়াকে বুঝিয়ে দেবো আমি কে ?"

"তুই তাহলে ব্যারিস্টার হবি ?"

"মোটেই নয়। ব্যারিস্টারি মানে তো সি আর দাশ, না হয় লর্ড সিনহার মতন রোজগার ? সে আর ক'জন ?"

"কী বলছিস, সনাতন ! নিজের বউকে হিরে দিয়ে মুড়ে রাখতে পারেন স্যার এস এম বোস, এস এন ব্যানার্জি এবং অনেক ব্যারিস্টার। শুনেছিস তো ডব্লু সি বনার্জির কথা ?"

সনাতন উত্তর দিয়েছিল, "পগেয়াপট্টি স্ট্রীটের প্রত্যেকটা দোকানদার ব্যারিস্টারদের একহাটে বেচে আর এক হাটে কিনে আনতে পারে।

অল্পতেই উকিল ডাক্তারদের নাম ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু গাউন ও স্টেথো যত গর্জায় ততো বর্ষায় না। যেসব ডাকসাইটে ডাক্তার তাঁদের প্রিয় বংশধরদের জন্যে টুপাইস রেখে গিয়েছেন তাঁরা শুধু ডাক্তারি করেননি, তাঁরা সময়মতো ডাক্তারির টাকা বিজনেসে খাটিয়েছেন। তুই গুপ্তদের দ্যাখ, ইউ এন ব্রহ্মচারীদের দ্যাখ। এমনকি বিধানচন্দ্র রায়কে দ্যাখ। অনেক ওষুধ কোম্পানিতে তিনি নিঃশব্দে অংশীদার হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এখনও পার্টনার হয়ে আছেন।"

হুটকো বুঝেছেন, অজ্ঞাত কোনও কারণে সনাতন আচমকা বিজনেসের দিকে ঝুঁকছে। বাঙালদের রাগ আছে, ফোঁস আছে এবং গোঁ আছে ভালমতন। রাগী বাঙাল যদি জেদের বশে ঠিক করে একটা কিছু করবে, তা হলে তাকে থামানো কঠিন। নিজেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে সে চনমন করবে।

কিন্তু কোথায় যেন চাপা অপমানবোধ রয়ে গিয়েছে সনাতনের মধ্যে। অনেক চেষ্টা করে তার কোনো বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দিচ্ছে না সনাতন।

কথা প্রসঙ্গে বন্ধু হুটকোকে সনাতন মনে করিয়ে দিল, "স্বামীজি বলতেন, জন্মালি তো দাগ রেখে যা। যে করেই হোক এই পৃথিবীতে একটা ছোটখাটো দাগ রেখে যেতে হবে, হুটকো। মধ্যিখানে কিছুকাল কেরানির চাকরি নিয়ে যেন ম্যাদাটে মেরে যাচ্ছিলাম। আমার লাইফে কোনো ফোকাস ছিল না।"

"ওটা কী জিনিস, ব্রাদার?" প্রশ্ন করেছিলেন হুটকো।

সনাতন উত্তর দিয়েছে, "কোথায় যেতে চাই তা আগাম ঠিক করে নেওয়া। এতদিন স্রেফ যেন শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে লক্ষ্যহীনভাবে পায়চারি করে মরেছি, ফলে মান-সম্মান শ্রদ্ধা-ভক্তি স্বীকৃতি কিছুই পাওয়া যায়নি। আমাদের দেখেই বোধহয় বেলুড়ের ওই তেজী সন্ন্যাসী ভদ্রলোক নাম দিয়েছিলেন, ম্যাড়ার দল।"

"সনাতন তোর হলো কী! কোথাও প্রেমেটেমে পড়ে ধাক্কা খেলি নাকি?" একবার লোভ হয়েছিল হুটকো সোজাসুজি বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে বসেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর সাহস হয়নি।

একটা বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে সনাতনের মধ্যে এইটা কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। সনাতনের মধ্যে পুরনো দিনের সেই সন্তুষ্টি, সেই প্রসন্নতা, সেই রসবোধ নেই। নতুন একটা পথ খুঁজে পাবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

হুটকো শুধু বললেন, "আগে কয়েকবার তোকে স্বামীজি থেকে কোটেশন দিয়ে গিয়েছি, এবার বলে যাই ঠাকুরের কথা। একজন আধা বিজনেসম্যান ভক্তকে ঠাকুর বলছেন, ওরা সব কেরানি মেরানি, ওরা অত টাকা ভাড়ার দায় নিতে পারবে না, যদি না তুমি নাও। ব্যাপারটা ঘটেছে দক্ষিণেশ্বর মন্দির ছাড়বার কিছু পরে, শ্যামপুকুরের কমদামী বাসা বাড়ি ছেড়ে বেশি ভাড়ায় কাশীপুরে আসবার সময়। সমস্যাটা আগাম বুঝে ঠাকুর কেরানি মেরানিদের আর্থিক সামর্থ্যর ওপর ভরসা রাখতে পারলেন না। তাই ভর করলেন ব্যবসায়ীর ওপর যার ট্যাঁকের জোর আছে। আর এক হবু বিজনেসম্যানকে ঠাকুর নিজে জীবনের অন্তিমপর্বে কাশীপুরে কল্পতরু হওয়ার দিনে আশীর্বাদ করে ছিলেন, নাম উপেন মুখুজ্যে, বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের মালিক।"

সব কথা শুনলো সনাতন, কিন্তু তেমন উৎসাহ দেখালো না। সে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলো, "বিজনেসটা ভক্তির লাইন নয়। কিছুটা দুঃসাহসের লাইন। ঠাকুরের মধ্যে আমি ব্যবসায়িক ভেঞ্চারও পাই না, অ্যাডভেঞ্চারও পাই না, বুঝেছো হুটকো।"

বিদায় দেবার আগে সনাতন ছেলেমানুষের মতন হুটকোকে প্রশ্ন করেছিল, "কত টাকা হলে আজকালকার মানুষ অন্য মানুষকে খাতির করে বলো তো ?"

"এ তো বড় কঠিন প্রশ্ন ?" এর উত্তর তো হুটকো হালদারের মতন অর্ডিনারি লোকের জানা নেই।

"আমি তো ভাই চোখের সামনে সহস্রপতিকে নড়তে চড়তে দেখলেই উল্লাস করি, অথচ শুনি, এই হাওড়াতেই লক্ষপতি আছেন, কোটিপতি আছেন। কলকাতা শহরে তার পরেও আছেন, যার ইংরিজি শব্দ বিলিয়নেয়ার, যার অর্থ শত কোটিপতি !"

"ওখানেই শেষ নয়। আরও আছে হুটকো। হাওড়ায় বসে আমরা খবরও রাখি না। এঁদের নাম ট্রিলয়নেয়ার।"

"সে কত টাকা! বাপ রে! অত টাকা হলে তো চোরের ভয়ে রাতে কোনোদিন ঘুম আসবে না, সনাতন।"

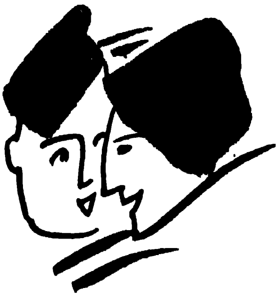
"তুমিও যেমন। একটা মস্ত সুবিধে, বেশি টাকা হলে পৃথিবীতে নিজের কোনো কাজ নিজে করতে হয় না। অন্য লোকে রাতে না-ঘুমিয়ে তোমার টাকা পাহারা দেবে, তুমি ইচ্ছে করলে পাশবালিশ জড়িয়ে মনের সুখে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারবে।"

সুদূর কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাবার আগে হুটকো হালদার আরও খোঁজখবর করেছিলেন।

অন্য বন্ধুরা বলেছিল, "শুনেছিস, সনাতনের বোধহয় মাথার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে—সে চাকরি ছেড়ে মিষ্টির দোকান দিচ্ছে, নিজের বাড়ির সামনে। বলছে, যে কোনো ব্যবসাই করতে পারো, কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যে তোমাকে একনম্বর হতে হবে সে-লাইনে। সেন, ঘোষ, গুপ্ত এবং নাগের সঙ্গে এবার লড়ায়ে নামছে বাঙাল সান্যাল—হাওড়ার লোকরা বুঝবে মিষ্টান্নবিপ্লব কাকে বলে। দুলালচন্দ্র ঘোষ, রাজেন পাল, আপনারা এবার হুঁশিয়ার।"

"ভালোই তো, হাওড়ার যাদব ঘোষেরা একটু নাড়াচাড়া খাক। বুঝুক সান্যালদের হাতেও মধু মাখানো আছে," বলেছেন বন্ধুরা।





সনাতনের নতুন উদ্যোগ যে এমন অভাবনীয় সাফল্য লাভ করবে তা কে জানতো ?

কোচিতে বসবাস করতে করতেই মাঝে-মাঝে সনাতনের হাল্কা চিঠি পেয়েছেন হুটকো হালদার।

অনেক পরিবর্তন হচ্ছে হাওড়ার কাশুন্দিয়ায়। পোশাকের পরিবর্তন, রুচির পরিবর্তন, আদর্শের পরিবর্তন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের আয়তনও বাড়ছে।

স্কুলের ছেলেরা পরীক্ষায় ভাল করে হাওড়ার সারস্বত বদনাম মুছে দিচ্ছে। মস্ত ডাক্তার হতে চলেছেন ভোলানাথ চক্রবর্তী, মস্ত উকিল হতে চলেছেন ছেঁচোদা। হাইকোর্টের জজ, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের সুপার দেখতে হলে কলকাতায় আর যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। হাওড়ায় এখন থেকে সব হবে, শুধু ভিড়ের চাপে মানুষ বোধহয় আর নড়তেচড়তে পারবে না। সরু সরু পথগুলো কারও অদৃশ্য অভিশাপে আরও সরু হয়ে যাচ্ছে, কী করে তা কেউ বুঝতে পারছে না।

কোচিনে কালো বর্ডারে ৺গঙ্গা মার্কা চিঠি পাঠিয়েছেন ঘনশ্যাম। সুখবিলাসবাবু আচমকা সাধনোচিত ধামে চলে গিয়েছেন। দূরদর্শী পুরুষ

বলতে হবে তাঁকে। আগেই শুনতে পেয়েছিলেন আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনির, না হলে ছেলেকে অসময়ে কারবারে বসিয়ে যেতে এতো ব্যস্ততা কেন? অথচ এই ব্যস্ততার মূল কারণটা আগে কাউকে বলেননি।

শোকের অংশীদার হয়ে হুটকো হালদার বড় চিঠি লিখেছেন প্রিয় বন্ধুকে।

"মাসিমাকে আমার প্রণাম জানাইও। এই অবস্থায় তাঁহাকে কিছু বলিবার মতন স্পর্ধা আমার নাই। তবে সান্ত্বনা ইহাই যে তাঁহার স্বামী যোগ্য পুত্রকে পাটে বসাইয়াছেন, একমাত্র কন্যাকে যোগ্য পাত্রে অর্পণ করিয়াছেন এবং সন্তানকেও সংসারী করিয়াছেন, তাহার পর অমৃতলোকের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তাঁহার স্বামীর কোনো কাজ সময়াভাবে অসমাপ্ত রহিয়া গেল তা কাহারও পক্ষে বলা সম্ভব হইবে না। তোমার ভগ্নী স্নেহের মিত্রাকেও আমার আশীর্বাদ জানাইও—আর বিভাবতীকে বলিও সংসারের নাটমঞ্চে তাহার ভূমিকা আরও দায়িত্বপূর্ণ হইয়া উঠিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে লোকে অবশ্যই তাহার নিকট অনেক কিছু প্রত্যাশা করিবে।"

একই ডাকে হাওড়া থেকে পোস্ট করা একটা প্রজাপতিমার্কা চিঠি এসেছিল, সনাতনের আসন্ন বিবাহ উপলক্ষে বিশেষ আমন্ত্রণ।

সনাতনকেও যাথসময়ে স্বহস্তে লম্বা চিঠি লিখেছিল হুটকো হালদার।

"ভাই বাঙাল, তোমার চিঠি পেয়ে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। দীর্ঘদিন ধরে তোমার হাবভাব লক্ষ্য করে আশঙ্কা হয়েছিল, তোমার মনও শেষ পর্যন্ত বরানগরের ভূতের বাড়ি অথবা আলমবাজার আশ্রমের দিকে ছুটতে চায়। চিঠি পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। কারণ আমাদের ঠাকুর কখনও বিয়েকে ভয় পাননি। নিজে বে করেছেন এবং মঠের প্রথম দুইজন প্রেসিডেন্ট মহারাজও বিবাহিত। প্রথমজনের তো পুত্রসন্তান ছিল। ঠাকুর বলেছেন, যা হয় একটা করো, না ঘরকা না ঘাটকা হোয়ো না—আমাদের পূজ্যপাদ মাস্টারমশায়দের মতন। বাঙালিনীটির পরিচয়ের জন্য অবশ্যই মনে নানা কৌতূহল। কিন্তু

তিনি যে ঘটি তা তোমার হস্তলিখিত নোট থেকে ইঙ্গিত পেয়ে বিশেষ আহ্লাদিত হলাম। আমরা চিরকাল তোমাদের বাঙাল বলেছি। তোমরা চিরকাল আমাদের কেন ঘটি হিসেবে চিহ্নিত করেছ তা ঈশ্বরই জানেন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে নানা সুমধুর আশার সঞ্চার হচ্ছে। বাঙাল বাবা ও ঘটি মায়ের পুত্রকে যে ইদানীং 'বাঘ' বলা হয়ে থাকে তা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়। বাঘের মা যে বাঘিনী পদবাচ্য তাহাও তোমাদের অজানা না থাকাই শ্রেয়। কন্যার ক্ষেত্রেও কোনো চিন্তা নেই—সেক্ষেত্রে দুর্লভ শব্দটি কি বাঘিনী ? না কেবল 'বাটি' ?"

একটু থেমে পরবর্তী প্যারায় হুটকো লিখলেন, "বরযাত্রীগমন উপলক্ষে তুমি রাহাখরচ বহন করবার অঙ্গীকারপত্র পাঠিয়েছ। আন্দাজ করি, গডেস্ লাক্সমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণে কোনোরকম কার্পণ্য করছেন না এবং অদূরভবিষ্যতে রাজেন মুখার্জি, সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য, আলামোহন দাসের সঙ্গে তোমার নামও বাঙালিদের কাছে পরিচিত হবে। সুদূর বিদেশে বসে ঘনশ্যাম ও তোমার মতন লক্ষ্মীর কৃপাধন্যদের সুখস্মৃতি বহন করে আমি বিশেষ আনন্দ পাই। বিবাহের পরে একটি ফটো পাঠিও। এই ধরনের ফটো দিয়ে হয়তো একদা জগদ্বিখ্যাত হুটকো সংগ্রহশালা গড়ে উঠবে।"

উত্তর এসেছিল কিছুদিন পরেই। প্রথম চিঠি ঘনশ্যামের।

"ভাই হুটকো, তোমার চিঠি আমাদের ব্যথিত হৃদয়ে অনেক শান্তি দিয়েছে। মা তোমাকে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।

"বিজনেসে এতোদিন বাপের সুপুত্তুর ছিলাম, এবার নিজের খেলায় নামতে হবে। কারবারে এই এক হাঙ্গামা। সবাই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের, বাবার সঙ্গে ছেলের, ছেলের সঙ্গে নাতির তুলনা করে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার লড়াই লাগিয়ে দিতে চায়। এই মুহূর্তে বিভাবতী অবশ্যই আমার অনুপ্রেরণা। সে বলেছে, বিজনেস করবার জন্যে সমস্ত দুনিয়া তোমার সামনে পড়ে রয়েছে। মাথা ঘামাও।

"আমরা এখানে তোমার সান্নিধ্য এবং তোমার মাধ্যমে ঠাকুরের হাতেগরম কোটেশন সর্বদাই মিস করি। ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি জুগিয়ে দিতে তোমার তুলনা নেই হুটকো।

"মধ্যিখানে বড় আঘাত এসেছিল। মিত্রার দুর্ভাগ্যের কথা তোমাকে জানানো হয়নি। আমাদের সবাইকে চরম দুঃখের মধ্যে ফেলে দিয়ে সে বিধবা হয়েছে। স্বামীর দুরারোগ্য ব্যাধি। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হয়নি, শেষ পর্যন্ত ভেলোর যাওয়া হয়েছিল।

"কিন্তু মৃত্যুর দেবতা বোধ হয় আগেই সব ঠিক করে রেখেছিলেন, তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

"মিত্রার বৈধব্যের সবচেয়ে বড় আঘাত পড়েছিল বাবার ওপর। তিনি সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকতেন, মিত্রার মুখোমুখি হতেও ভয় পেতেন। আমরা অসহায়ভাবে চুপ করে দেখতাম। বাবা এমন ভাব করতেন যেন মিত্রার বৈধব্যের জন্যে তিনিই দায়ী, যেহেতু এই জামাই নির্বাচন তাঁরই।

"মিত্রা অবশ্য আঘাতটা অনেক সহজভাবে নিয়েছে। বাইরে তেমনি শোকের প্রকাশ নেই, ভেঙে পড়বার ইঙ্গিত নেই। কিন্তু বাবা আন্দাজ করতেন, ওর ভিতরে কি হচ্ছে। বলতেন, আমি ওর মনের ভিতরটা দেখতে পাই। তাই হাহাকারের শেষ ছিল না তাঁর ভিতরে। এইভাবে নিজের শরীরটাও নষ্ট করলেন বাবা। তাঁর অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর পিছনে যে জামায়ের অকালমৃত্যুর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তা বুঝতে আমাদের অন্তত কোনো অসুবিধা হয় না।"

এরপর ঘনশ্যাম তার বন্ধুকে আরও লিখেছেন, "ভাই হুটকো, ভগ্নিপতির চলে যাওয়াটাকে মেনে নেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। কিন্তু আজকাল মিত্রাকে যতোই চোখের সামন্য দেখি ততোই এদেশের কমবয়সী মেয়েদের বৈধব্য নিয়ে মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন জাগে। মনে হয় কোথাও যেন আমাদের দিক থেকে মস্ত ভুল হয়েছিল। সবকথা লেখা যায় না। যারা ঈশ্বরের এই নাটকে অংশগহণ করতে প্রচণ্ড আগ্রহী ছিল তাদের কেউ কেউ তোমার অচেনা নয়। কিন্তু সেসব সাক্ষাতে।"

ঘনশ্যাম আরও লিখেছেন, "কবে আমাদের এই হাওড়ায় আবার পদধূলি দিচ্ছ জানিও। আমাদের বালিগঞ্জ পার্কের বাড়িটি এখন বেশ বসবাসযোগ্য। আপাতত মিত্রা ওখানেই বসবাস করছে। ইদানীং হাড়ে হাড়ে বুঝছি, ব্যবসা বড় কঠিন মালিক—শোকার্ত মানুষকে চোখের জল ফেলবার সময়ও দেয় না। তার ওপর মৃত্যুর আগে বাবার নির্দেশ, কখনও কারবার বন্ধ রাখবে না।

"পিতৃশ্রাদ্ধের পরে আমি শুধু একটি নিয়ম পরিবর্তন করেছি। বাড়িতে বসে আমি নিজে হাতে নোটের বান্ডিল গুনে সময় নষ্ট করছি না। শুনেছি, বোম্বাইতে অনেকে নোট গোনার কল বসিয়েছে। এমন যন্ত্র তোমার খোঁজে থাকলে আমাকে জানিও। ইতিমধ্যে বিভাবতীর কিছু পরামর্শ কাজে লাগিয়েছি। মুচ্ছুদি বাড়ির মেয়ে তো! সে বলেছে, যোগ্য বেতন দিয়ে যোগ্য লোক নিয়োগ করো। ভাল কর্মচারী আছে বলেই সায়েবরা কাজের সময়েও গল্‌ফ খেলতে ভয় পায় না। বম্বে এবং কেরালার বিজনেস সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপার জানিও। ইতি তোমার অনুগত হ্যাদা।"

বন্ধুর কাছ থেকে এমন দুঃখে ভরা চিঠি পেয়ে প্রবাসী হুটকো হালদারের প্রাণ ছটফট করেছে।

সঙ্ঘমিত্রার অকালবৈধব্য, তার দাদার যুগল জীবনের আনন্দধারায় ছন্দপতন ঘটিয়ে চলেছে। আরও কী যে বলতে চেয়েছে ঘনশ্যাম চিঠিতে তা ঠিক পরিষ্কার হয়নি, কিন্তু নিজে না-লিখলে কাউকে কিছু ব্যাখ্যার জন্যে চাপ দেওয়ার শিক্ষা হুটকোকে সুধাংশুবাবু স্যর দেননি।

সুধাংশুশেখর প্রায়ই বলতেন, "ঠাকুরঘরের ঠাকুরকেও প্রাইভেসি দিতে হয়। মানুষও এই সম্মান, এই স্বাধীনতা চায়। কখনও অন্যের চিঠি পড়বে না, অন্যের কথায় আড়ি পাতবে না। নিজে না বললে কাউকে অযথা প্রশ্ন করবে না। এসব অকারণ কৌতূহল দাসত্বের লক্ষণ—এই স্বভাবের মানুষের কোনও লাভ হয় না, এই সব আসে দোষ ভিতরের দুর্বলতা থেকে।"



এইভাবে হুটকো হালদারের ছোটবেলার বন্ধুত্বের গল্প শেষ হলে কী সুন্দর হতো!

লোকে হয়তো 'বলতো, ঘটনার তেমন ঘনঘটা নেই, কাহিনীর উত্থানপতন নেই, মানুষের এগিয়ে যাওয়া নেই, পিছিয়ে আসা নেই, এ তো আজকের গল্প নয়।

আজকের গল্পে প্রভূত কামনা থাকবে, বাসনা থাকবে, হিংসা থাকবে, প্রতিহিংসা থাকবে, ঘটনার খরস্রোতে মানুষ সহজেই উত্তেজিত 'হয়ে উঠবে। যদি অন্যের তপ্ত জীবন থেকে উত্তেজনা না পাওয়া গেলো, একটা ধাক্কা না পাওয়া গেলো তাহলে গল্প পড়ে বৃথা কেন সময়ের অপচয়?

তুমি বলবে, তুমি অভিজ্ঞ মানুষ, তুমি ধাক্কা চাও না, তুমি আলো চাও। হাওড়ার কয়েকজন অবুঝের নিজের মনের প্রদীপ জ্বলে ওঠে তখনই যখন সাহিত্যের উত্তরণ ঘটে সার্থকতায়।

সনাতন সান্যালের ছোটবেলা সম্বন্ধে তো তেমন কিছু বলা হলো না। ক্লাসের দুই বন্ধুর ক্ষণকালের সান্নিধ্যের ঘটনা। অন্য দিকে নিঃসঙ্গ পৃথিবীর জীবনপ্রদীপ থেকে মাস্টারমশায়ের দক্ষিণেশ্বের-বেলুড়ের সান্নিধ্যে জগৎকে পাল্টে ফেলবার উত্তেজনা। একজন চাটুজ্যে এবং একজন দত্ত মরার বহু বছর পরেও এখনও কেমন করে তাঁরা বেঁচে

রইলেন বহু জনের হৃদয়ে তার সামান্য ছবি পাওয়া গেলো বিবেকানন্দ ইস্কুলে। কাশুন্দে হাওড়ার জীবনযাত্রা থেকে তেমন কিছু বড় কেউ হলো না, কারও নাম সংবাদপত্রের শিরোনাম হলো না। কেবল ছোট ছোট সুখ এবং ছোট আকারের দুঃখ নিয়ে এখানকার কিছু মানুষ বেঁচে রইলো এবং তারই মধ্যে স্বপ্ন দেখলো। একটা কিছু করার আনন্দ পেলো, কেউ কেউ সতীর্থকে ভালবাসতে পারলো, এও তো কম নয়। আরও যদি নাটকীয়তার প্রয়োজন থাকে তাহলে তো ঘনশ্যামের ছোট বোন ও বিভাবতীর কলেজ সহপাঠিনী সঙ্ঘমিত্রাকে নিয়ে খোঁজখবর করতে হয়।

সঙ্ঘমিত্রা! নামটি বড় মিষ্টি। তাকে সেই ছোট বয়স থেকে হুটকো হালদার কতবার দেখেছেন। মাঝে-মাঝে রসিকতা করেছেন হুটকো, "তোমাকে সমস্ত দুনিয়া চিনতো প্রায়ই আড়াই হাজার বছর আগে। স্বয়ং সম্রাট অশোকের বিদুষী কন্যা। এখন হাওড়া ছাড়া কোথাও তোমার প্রতাপ নেই। এখানেই আমাদের সঙ্ঘারাম।"

"বোঝো তো সঙ্ঘারাম? বুদ্ধের শিক্ষা পেয়ে দলে-দলে মানুষ ভিক্ষু হয়ে গেলো। এই সব ঘরছাড়া মানুষ পথে-পথে কত আর ঘুরবেন? কোথায় যাবেন দারুণ বর্ষায় অথবা শীতে? এবার শব্দটা ভেঙে ফেলো—সঙ্ঘ+আরাম। যেখানে সন্ন্যাসীদের আশ্রয় এবং আরামের ব্যবস্থা সেইটাই সঙ্ঘারাম।"

"তার মানে বেলুড়ে আমারও ঢালোয়া অধিকার?" রসিকতা করেছিলেন ঘনশ্যাম। "বিজনেসম্যানরাও সন্ন্যাসীদের মতন পথে পথে দেশে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়, পণ্যের আদানপ্রদান করে।"

হুটকো বলেছিলেন, "বেলুড়ের চোখে বুদ্ধকে বোঝা বেশ কঠিন, ঘনশ্যাম! বিবেকানন্দ একবার বলছেন এতো বড় মানুষ পৃথিবীতে কখনও আসেননি—মহাবিপ্লবী। আবার কখনও বলছেন, বৌদ্ধদের ভুলেই সনাতন ভারতবর্ষ মস্ত বড় ধাক্কা খেলো। তরবারির ভয় দেখিয়ে মানুষকে নিরামিশাষী করে কখনও ভাল হয় না। দুনিয়ার সেরা শক্তিমান পুরুষ মানুষগুলো যদি মস্তকমুণ্ডন করে মহাবিহারে বসে বসে কেবল

ত্রিপিটক পাঠ করলো তাহলে সুদেহী প্রজাসৃষ্টি হবে কীভাবে ? বুদ্ধ মস্ত বড়, কিন্তু তিনি এতো বড় যে তাঁর শিক্ষা সাধারণ মানুষের জন্যে নয়। আদর্শ সংসারীদের অভাবে দেশটা বড় ধাক্কা খেলো।"

ইতিহাসটাও তখন জানা ছিল, বাদলবাবু স্যারের কল্যাণে। "খ্রিস্টের জন্মের ২৮৪ বছর আগে তরুণ অশোক বিবাহ করলেন বিদিশা নগরীতে। পরের বছর জন্ম হলো জ্যেষ্ঠপুত্র মহেন্দ্রর। তার পরের বছর কন্যা সঙ্ঘমিত্রার। তিরিশ বছরের মেয়েকে আমাদের এই তমলুক থেকে সম্রাট অশোক জাহাজে তুলে দিলেন সিংহলের উদ্দেশে। শুনে রাখো, তার স্বামীর নাম—অগ্নিব্রহ্ম। সঙ্ঘমিত্রার ছেলের নাম সুমন। স্বামীপুত্র সব নিয়ে সঙ্ঘমিত্রা বৌদ্ধসঙ্ঘের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, তারপর পাড়ি জমিয়েছিলেন সিংহলদেশে।"

এসব কথা শুনে ঘনশ্যাম কোনো উৎসাহ দেখাননি। তিনি বলেছিলেন, "আদ্যিকালের অতশত কথা জেনে কোনো লাভ নেই, হুটকো। তোমার এতো রিসার্চ কোথা থেকে হলো ?"

হুটকো মিথ্যাচার করেননি। বলেছিলেন, "ক্রেডিট আমার নয়, ওই হতভাগা সনাতনের। ছোকরা সম্রাট অশোকেব ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেক খোঁজখবর করেছে।"

অশোকের মেয়ের জীবনে কোনো অপ্রাপ্তির ট্রাজেডি ছিল কি না জানা যায় না। কিন্তু এই গল্পের সঙ্ঘমিত্রাকে সকরুণ ভূমিকায় এঁকে দেওয়া কঠিন নয়। সেই সঙ্গে একটু খোঁজখবর করলেই জানা যায় কী এমন ঘটেছিল যা আজও তেমন স্পষ্ট হলো না।

হুটকো একবার সুযোগও দিয়েছিলেন ঘনশ্যামকে। কিন্তু ঘনশ্যাম কেন জানি না এড়িয়ে গেলেন। বললেন, "তোমার কাছ থেকে অনেক পেয়েছি, হুটকো। তুমি না হলে বিজনেসের লাইনে হয়তো আসতামও না। কিন্তু আমি এও জানি, মানুষের কাছে সবসময় সব কিছু পাওয়া যায় না। কখনও কখনও বিভ্রান্তি ঘটে। ভুল করলে তার মূল্য দিতে হয়। কারণ অনেক ভাবনা-চিন্তার উপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে

না। অজান্তেই মানুষ নিমিত্ত হয়ে ওঠে। যারা ভাবে না, যাদের ধৈর্য নেই তারা অন্যকে দোষ দিয়ে নিজেদের দায়দায়িত্ব হাল্কা করার চেষ্টা চালায়। আর যারা অভিজ্ঞ, তারা জানে, সুতোর লাটাই নিয়ে খেলছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। তিনি প্রশ্রয়ের সুতো ছেড়েই চলেছেন। পৃথিবীতে কোনো কিছুই বিক্ষিপ্ত বা প্রক্ষিপ্ত নয়।"

সুতোর হিসেবটা হুটকো হালদারও সব সময় বুঝতে পারেন না, যেমন পারেন না ঘনশ্যাম ঘোষাল ও তাঁর স্ত্রী বিভাবতী। বান্ধবী যখন ননদ হয় তখন অন্য একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিয়ের সময় হুটকো রসিকতা করেছিলেন, "গেরস্ত ঘরে ননদরাই চিরকাল বউদের বান্ধবী মেমসায়েব, হয়ে উঠেছে। আপনি তো বান্ধবীকে ননদ করে কাজ পাকা করে এ-বাড়িতে ঢুকছেন।"

রসিকতা করে হুটকো জিজ্ঞেস করেছেন বন্ধুকে, "এ কী হ্যাদা ? গোপনে গোপনে কি একটু অ্যাফেয়ার করলে বোনের বান্ধবীর সঙ্গে ?"

তীব্র আপত্তি অবশ্য এসেছিল। পাত্রীর প্রাথমিক নির্বাচনে ঘনশ্যাম ছিলেন না। বাবা-মা ঘটকের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। তারপর খবর পাওয়া গিয়েছে, পাত্রী আমাদের মিত্রার ক্লাসের বন্ধু, শালখের ব্যানার্জিবাড়ির মেয়ে।

ঘনশ্যাম জানিয়েছিলেন, "তোমাকে সিলেকশন কমিটিতে নেবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তুমি কোচিনে পড়ে রইলে আমার কর্মফলে।"

হুটকো সোজাসুজি বললেন, "খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছি, ভায়া। নরেন দত্তর মতন লোক একবার বন্ধুর অর্ধাঙ্গিনী নির্বাচন করতে গিয়ে সারা জীবন ভুগেছিলেন। কালো রঙ দেখে পাত্রী সিলেকশনের বিরুদ্ধে মত দিলেন নরেন। কিন্তু ভবিতব্য, ওইখানেই বন্ধুর শেষ পর্যন্ত বিয়ে হলো। তারপর বুঝতেই পারছো, বহু দিন ধরে সেই কালো মেয়ে বদলা নিয়েছে জগদ্বিখ্যাত লোকের ওপর। একবার তো মহিলা বলেছিলেন, ওই লোককে আমি নিজের হাতে খাবার দেবো না।"

বিভাবতীও সহজে ছাড়বার পাত্রী নন। স্বামীর বন্ধুকে বলেছিলেন,

"তার মানে আপনিও সিলেকশন কমিটিতে থাকলে আমাকে রিজেক্ট করতেন!"

"যার ঘর করবে সে এবং তার বোন তোমাকে বুঝে নিয়েছে, মেমসায়েব। আমি হুটকো হালদার সেখানে নাক গলাবার কে? অলরেডি বন্ধুরা তো বলছে, এরকম মেয়ে পেলে আইবুড়ো থাকার কোনো অর্থ হয় না।"

"তোর ভাবী বউয়ের সব খবরও পেয়েছি হুটকো। তোর তো স্পেশাল কেস—অর্ধেক রাজত্ব আর সেই সঙ্গে রাজকন্যে।"

"রাজত্ব নয়, স্রেফ একটা চাকরি। তাও বলে কিনা, আগে বিয়ে, পরে চাকরি। আমি রাজি হইনি। শেষে বউটি রইল, আর চাকরিটি হাতছাড়া হলে অবস্থাটা কীরকম হতো? এইসব টানাটানিতে নিজের লোকদের সঙ্গে সম্পর্কটা টক হয়ে গেল।"

সঙ্ঘমিত্রার সঙ্গেও রসিকতা করেছিলেন হুটকো। "তোমাকে দেখে তো মনে হয় না এতো চালাক। ভেবেচিন্তে, বাপের বাড়িতে নিজের বান্ধবীকেই ঢুকিয়ে দিলে—তার অর্থ চিরকালের সুখ।"

ঘনশ্যামের মা বলেছিলেন, "মেয়েরা তো বাপের বাড়িতে থাকবার জন্যে জন্মায় না। ও আর ক'দিন থাকছে?"

"বাপের বাড়ির সুখটা মেয়েদের চিরদিনের, সে যেখানেই থাকুক।" হুটকো ভাবতে পারেননি কথাটা এইভাবে বেঁকে যাবে পরবর্তী সময়ে—সঙ্ঘমিত্রা বিধবা হবে।

অনেক দিন পরে ঘনশ্যামের মা দুঃখ করেছিলেন, "এদেশে স্বামীগুলো কেন যে অপলকা হয়। যত পরমায়ু শুধু বিধবার, জানো হুটকো। অমন মা সারদামণিকেও দু যুগ বৈধব্যযন্ত্রণা সহ্য করতে হলো।"



তখন সুখবিলাসবাবু দেহ রেখেছেন। ক'দিনের জন্যে হুটকো কলকাতায় এসেছিলেন। টুক করে প্রতিশ্রুত বিয়েটা সেরে নিয়ে আবার বাইরে চলে যাওয়া। কর্মজীবনটা মাকুর মতন নড়ছে কখনও কোচিন, কখনও বোম্বাই।

সেবার ঘনশ্যামের মনেও সুখ ছিল না। বন্ধুকে বলেছিলেন, "শরীরের যত্ন নিস, সাবধানে খাওয়া দাওয়া করিস। বিধবা হলে বউয়ের ভীষণ কষ্ট রে! এই মিত্রার স্বামী। মাথায় যে অমন ব্যথা হতো তা কখনও কাউকে বলেনি। যখন আমরা জানতে পারলাম, বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম তখন টু লেট।"

হুটকো হালদার ও বন্ধুর মধ্যে এ-বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য হয়নি। এদেশে মেয়েদের বড় কষ্ট। নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরিতে বাঙালিরা রেনেসাঁস ফেনেসাস করেছে কিন্তু ঘরের মেয়েদের প্রতি যা ব্যবহার করেছে তা ভাবা যায় না রে। কচি বয়সে বিয়ে, কচি বয়সে মা হওয়া, কচি বয়সে বিধবা হওয়া—শুধু স্বামীর চিতায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার থেকে কোনোরকম অব্যাহতি। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লিখছেন, বন্দেমাতরম লিখছেন, সেই সঙ্গে এক বউ মারা যাওয়ার পর অপর বউ নির্বাচনের জন্যে কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছেন!

"হুটকো, আমিও খোঁজখবর রাখছি", বললেন ঘনশ্যাম। "অ্যাজ লেট অ্যাজ ১৮৮১ সাল, সেনসাস রিপোর্টে দেখাচ্ছে, অসংখ্য কমবয়সী (১০ বছর) বাঙালি মেয়ে বিবাহিতা অথবা বিধবা। দশ বছর বয়সে বাঙালির সিকি ভাগ মেয়ে হয় সিঁদুর মেখে না হয় বিধবা সেজে এই সংসারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

হুটকো বললেন, "বাঙালিদের মিথ্যে ধারণা, এদেশের যত সমাজ সংস্কার সব বাঙালিরা করেছে। ডাহা মিথ্যে কথা। এদেশের বোম্বাইতে গিয়ে এক পার্শির নাম শুনলাম—বৈরামজি মালাবারি। হরিমোহন মাইতি বলে বঙ্গপুঙ্গব সেবার কলকাতায় জোর করে সহবাস করতে গিয়ে ১১ বছরের স্ত্রীকে মেরে ফেললো। কমবয়সী মেয়েগুলোকে স্বামী রাক্ষসের শারীরিক নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সহবাসে সম্মতিবিলের জন্যে ছোটাছুটি করতে লাগলেন বৈরামজি মালাবারি। নিজের খরচে তিনি বিলেত পর্যন্ত ছুটলেন। কিন্তু স্বয়ং বিদ্যেসাগর পর্যন্ত মালবারিকে সাপোর্ট দিলেন না। ইংরেজ মহলে এইসময় সুসভ্য ভারতীয়দের নিয়ে যে কত হাসাহাসি হতো তা কারও জানতে বাকি নেই।"

ঘনশ্যাম প্রথমে কথা বলেননি। তারপর মন্তব্য করলেন, "মেয়েরা খুব অল্প চায় রে, হুটকো। স্বামী বেঁচে থেকে একাদশীতে স্ত্রীকে আঁশ খাবার রাইট দিলেই মেয়েরা ধন্য।"

তারপর কানে কানে তিনি বললেন, "মিত্রাকে আমরা মাছ খেতে ফোর্স করেছি। দরকার হলে বালিগঞ্জের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো। ওখানে সে নিজের লাইফ নিজেব ইচ্ছেমতন যাপন করবে।"

হেসেছিলেন হুটকো। বলেছিলেন, "তা বোধ হয় সম্ভব নয়, ঘনশ্যাম। স্বামী চলে গেলে মেয়েদের লাইফ নিজের কাছে থাকে না।"

সেবার কলকাতায় এসে হুটকো হালদার বন্ধু সনাতনের খবর করলেন। শুনলেন, বারাণসী গিয়েছে সনাতন। সনাতনের তরুণী গৃহিণী এখানেই রয়েছেন।

"এখনই কাশীবাসী হবার প্রবণতা কেন ? সবে তো কলির সন্ধে।" অচলার কাছে প্রশ্ন করেছিলেন হুটকো।

"জানেন তো আপনার বন্ধুকে। ভীষণ গোঁয়ার। যা করতে চাইবে

তা ঠিক করবেই। বিশ্বনাথের ষাঁড়ের মতন গো, কারুর কথা শুনবে না।"

বন্ধুর পক্ষ নিয়ে হুটকো বললেন, "কাশী বাঙালিদের বড় প্রিয় জায়গা মেমসায়েব। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসীরাও চান্স পেলেই ছোটেন কাশীতে। কিন্তু কাজের লোকের জন্যে তো কাশী নয়, তাদের জন্যে তো কলকাতা। কাশীর বুদ্ধিমান ময়রারা তো সব কলকাতায় চলে এসেছে—ব্রাঞ্চ খুলে বসছে উত্তরে, দক্ষিণে। শুনছি, হাওড়াতেও এসেছে তারা—দোকানে খদ্দেরের ভিড় সামলাতে পারছে না। বাঙালি ময়রাদের সম্পর্কে যখন অভিমান হয় তখন কলকাতার মিষ্টান্ন রসিকরা ভর করেন কাশীর মিষ্টিওয়ালার ওপরে।"

তারপর বন্ধুর বউয়ের মুখে যা শুনলেন তা অবাক করে দিল হুটকো হালদারকে। তিনি বললেন, "বলো কি মেমসায়েব! মিষ্টির ব্যবসাকে সনাতন এত সিরিয়াসলি নিয়েছে যে দু'জন কারিগর নিয়ে সে চলে গিয়েছে বেনারসে, কাশীর মিষ্টির গোপন রহস্য আবিষ্কার করতে এবং আয়ত্ত করতে! সনাতন নিজে সেখানে দশ দিন থাকবে, তারপর কারিগরদের রেখে আসবে দেড় মাসের জন্যে যাতে প্র্যাকটিসের কোনোরকম ত্রুটি না হয়। জানো মিসেস সান্যাল, বাঙালিদের মধ্যে বারেন্দ্র এবং বৈদ্যদেরই এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হয়। আমাদের সনাতন তার ওপর ডবল বুদ্ধিমান।"

অচলা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল, "আমি কিন্তু বারেন্দ্র নই হুটকোবাবু।"

"আমি সব জানি। তুমি রাঢ়ী বাউনের মেয়ে। আজকাল বিয়ের সম্বন্ধ করবার সময় এসব নিয়ে কলকাতার কেউ তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না। দু'দিন পরে ডজনে ডজনে সানুজ্যে (সান্যাল+মুখুজ্যে), লাহুজ্যে (লাহিড়ি+বাড়ুজ্যে), ভাদুজ্যে (ভাদুড়ি+চাটুজ্যে) ঘুরে বেড়াবে এই কলকাতা শহরে।"

বোম্বাইতে ফিরে গিয়ে সনাতন সান্যালের সুদীর্ঘ চিঠি পেয়েছিলেন হুটকো।

"ব্রাদার হুটকো, তুমি এলে অথচ দেখা হলো না। কিন্তু তুমি ডুবিয়ে দিয়ে গিয়েছো—গিন্নির ধারণা হয়েছে, রাঢ়ীরা বারেন্দ্র থেকে এক কাঠি ওপরে। গিন্নির আশঙ্কা চিরকাল আমি আর সান্যাল থাকতে পারবো

না, হয় ঘোষ না হয় যাদব টাইটেল নেওয়ার প্রয়োজন হবে। মিষ্টির ব্যবসায়ে বিশেষ সাফল্যের জন্যে আমি টাইটেল পাল্টাতে প্রস্তুত। বদ্যি সেন মহাশয় পর্যন্ত কলকাতার লোক সহজে মেনে নিয়েছে, কিন্তু এখনও কোনো বারেন্দ্রপুঙ্গব সুইটসে পাত্তা পায়নি।"

সনাতন আরও লিখেছে, "তুমি ভাবছো, তোমাদের সনাতন ছুতো করে বেনারসে গিয়ে বসে আছে। মোটেই তা নয়। তোমাদের সনাতন গিয়েছিল কিছু লুপ্ত ভারতীয় মিষ্টান্ন উদ্ধারের আশায়। দেখো হুটকো, মানুষের খাবারের ইতিহাসটা মোস্ট এক্সাইটিং। মাথা খেলিয়ে খেলিয়ে দুনিয়ার মানুষ বহু যুগ থেকে খাবার নিয়ে কত রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা যে করছে। অথচ তার তেমন কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। মনে রেখো ব্রাদার, যখন থেকে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে তখন থেকেই সে নিয়মিত দু'বেলা খেয়ে যাচ্ছে, খাবারের থেকে আদিম অভ্যাস আর কিছু নেই এ-জগতে।"

সনাতনটা বেশ রসিক আছে। সে লিখেছে, "ভাই হুটকো, লুপ্ত পুঁথি উদ্ধারের জন্যে ইংরেজরাও একদিন ভারত থেকে দুর্গম চীন ও তিব্বতে গবেষক দল পাঠাতো, কিন্তু খাবারের ব্যাপারে সায়েবরা কিছু করেনি, কারণ ইন্ডিয়ানদের খাবার সায়েবের জিভে কখনও আনন্দ আনেনি। সায়েব তাই নিজের বয়েল্ড, বেক্ড এবং গ্রিলড্ খাবারই আঁকড়ে ধরেছে। বিশেষ করে সায়েবি মিষ্টি। সন্দেশ রসগোল্লায় ম্লেচ্ছ সায়েবের কিছুতেই রুচি হলো না। বড়জোর ইন্ডিয়ান লেম্বুপানি—একমাত্র এই ড্রিঙ্কটাই ব্রিটিশ-ভারতে ইঙ্গ-ভারতীয়দের যৌথ অবদান হয়ে রইলো।"

উঃ সনাতনটা খাবারের অতলান্ত রহস্যের মধ্যে গভীর ডুব দিতে চাইছে। এতো বেপরোয়া অথচ বিষয়ের গভীরে ডুব দিয়ে ছোঁড়াটা করবে কী? বলা যায় না, ডুবুরি হয়ে হয়তো কোনো হারানো মানিক তুলে নিয়ে আসবে।

সনাতন তার বন্ধুর সঙ্গে মিষ্টান্ন সম্পর্কে পত্রাবলি ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে গিয়েছে।

সনাতন একবার লিখেছে, "ভাই হুটকো, তুমি ভাই, ঠাকুর স্বামীজীর ফেভারিট মিষ্টান্ন সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর দিও। মিষ্টির ব্যাপারে তো তোমার স্পেশালিস্ট হওয়া আটকানো গেলো না।"

হুটকো উত্তর দিয়েছেন, "আমাদের দেশের প্রত্যেক মহাসাধকের একটা প্রিয় খাদ্যের আইটেম আছে। মহাপ্রভুর যেমন মালপোয়া। স্বয়ং শঙ্করাচার্যরও কী একটা ফেভারিট মিষ্টি আছে কোথায় যেন পড়েছিলাম। আদিশঙ্কর মঠে এখনও সেই মিষ্টান্ন বিতরণ হয় শুভলগ্নে। খুঁজে পেলে তোমাকে জানাবো। শিখ ধর্মগুরুদের প্রিয় বোধ হয় হালুয়া—সেই নানক থেকে আরম্ভ করে। আর দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের তো জানোই—জিলিপি পেলে কিছুই চাইতেন না। তাছাড়া আর এক ফেভারিট ছিল বরফ—এই বরফ খাবার পরেই তো পেনিটির বাগানবাড়িতে ঠাকুরের প্রথম গলার ব্যথা ধরা পড়লো যা আর ভাল হতে চায় না। ভক্তরা অবশ্য এখনও ঠাকুরকে সুজির পায়েস নিত্যভোগ দিয়ে যাচ্ছে। জিলিপি তার যোগ্য সম্মান পাচ্ছে না বেলুড়ে। ঠাকুরের একনম্বর চেলাটির কথা আর বোলো না। কুলফি নয়, আইসক্রিম তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। তবে কচুরি সিঙাড়া জিলিপির উপর বিশেষ সদয় ছিলেন না, কলকাতার ধনীদের এই প্রিয় জলখাবারকে লিখিতভাবে প্রচণ্ড আক্রমণ করেছেন।"

সনাতন দ্রুত উত্তর দিয়েছেন, "বোঝা যাচ্ছে, বাঙালি ময়রার ওপর বিবেকানন্দ প্রসন্ন ছিলেন না!"

হুটকোর জলদি উত্তর এসেছে : "নর্থ ক্যালকাটার ছেলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ময়রার ওপর টান ছিল না, হতেই পারে না। তবে বাঙালির অম্বলের রোগ এবং ডিসপেপসিয়া ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে ময়রাকে হয়তো একটু সন্দেহের চোখে দেখেছেন। আর জীবনের শেষপর্বে তো তিনি নিজেই মধুমেহের রোগী—ময়রা তফাত যাও, মিষ্টির সঙ্গে কোনো সম্পর্কই থাকলো না। মনে রেখো, তখনও ডায়াবিটিসের ইনসিউলিন ওষুধ বেরোয়নি। ওই ওষুধ থাকলে সহজেই দীর্ঘজীবী হতে পারতেন স্বামী বিবেকানন্দ।"

সনাতন লিখেছেন, "মহাপুরুষদের খাওয়াদাওয়া এবং তাঁদের রসনার দুর্বলতা নিয়ে খোঁজখবর চালানো বিশেষ প্রয়োজন। কখনও এই মিষ্টির মার্কেটে কাজে লেগে যাবে। তুমি বিবেকানন্দর ব্যাপারটা জোগাড় করে ফেলো—রসনার কোথায় ছিল তাঁর দুর্বলতা।"

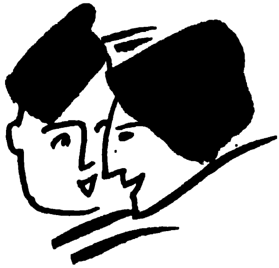
রসিক হুটকোর উত্তর, "দুর্বলতার কথা বললে তো তোমাকে তামাকের দোকান খুলতে হয়, সনাতন। কামিনীকাঞ্চন অত সহজে ছাড়লেন। কিন্তু তাম্রকূটের মোহ কাটাতে পারলেন না। বিবেকানন্দর সন্ন্যাসীজীবনেও এর প্রচণ্ড রেশ ছিল। ভাল তামাকপাতা না হলে বিবেকানন্দ অখুশি হতেন। একবার তামাক ছাড়বার জন্যে তিনি কল্কে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু মাঝরাতে বায়না। সহযোগী সন্ন্যাসী অনেক কষ্টে ফেলে দেওয়া ভাঙা কল্কেটা সংগ্রহ করলেন, কিন্তু তামাক নেই! শেষপর্যন্ত সন্ন্যাসীভায়ের শরীরের ব্যথার জন্যে বাঁধা তামাকপাতা খুলে ফাটা কল্কেতে দেওয়া হলো। শোনো ব্রাদার, হাঁদুবাবু ইস্কুলে আমাদের এসব বলেননি। কিন্তু পটকা প্রভাত আমাদের কোন্ একটা বই খুলে দেখিয়েছিল। তখনই তো জানতে পারলাম, স্বামীজি খৈনি নিতেন, নস্যি টানতেন। এই নস্যির দোষটা বাল্যকালেই বাধিয়ে পটকা প্রভাত বিবেকানন্দর নেশা সম্পর্কে গোপন রিসার্চ শুরু করেছিল। নস্যের কটূ গন্ধের জন্যে কম বয়সে নরেন্দ্রনাথের ভাইবোনেরা রাত্রে তাঁর পাশে শুতো না। ঘুমন্ত অবস্থায় রাতে উঠে নস্যি নিয়ে আবার শুতেন নরেন্দ্রনাথ।"

সনাতনের উত্তর এসেছে : "না ভাই, এখন নস্যি অথবা খৈনির দোকান দেওয়া চলবে না। ওতে তেমন পয়সা নেই আজকাল, যদি না লোককে ঠকাতে রাজি থাকো। কোন ব্যবসায় কেমন পড়তা চলেছে তা তোমার বন্ধু নিয়মিত খবরাখবর রাখে। বরং সুযোগ হলে বেলুড় মঠের পাশে প্রবেশদ্বারের কাছে একটা স্পেশাল দোকান দেওয়া যাবে, সেখানে শুধু বিক্রি হবে ঠাকুর-স্বামীজির প্রিয় আইটেম। যা বুঝছি, পপুলার আইটেম হবে কই মাছ। অমন যে অমন নিরামিষাশী বন্ধু রামচন্দ্র দত্ত, তাঁর সঙ্গে ঠাকুরকে কই মাছ ভোগ দেওয়া নিয়ে বিবেকানন্দর ঝগড়া

হয়েছিল। রামু দত্তর মতন বৈষ্ণবও শেষ পর্যন্ত কাঁকুড়গাছিতে বছরে একদিন ঠাকুরকে কই মাছ ভোগ দিতে রাজি হলেন। আর হাঁদুদা বলেছিলেন, আমেরিকা যাবার আগে বোম্বাইতে ভক্তর বাড়ি গিয়ে কই মাছ খাবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন বিবেকানন্দ। বোম্বাইতে কই মাছ তখন দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু বহু কাঠখড় পুড়িয়ে কালীপদবাবু বলে এক ভক্ত জোগাড় করলেন কই মাছ। তোমার থলিকা যারে দাও তারে কিনিবারে দাও শকতি, বুঝলে হে হুটকো।"

হুটকোর মন্তব্য : "অমন দোকান হাওড়ার বেলুড় মঠে করার কথা মনেও এনো না, সনাতন। এতো ভক্ত ভিড় করবে যে কই মাছের সাপ্লাই রাখতে পারবে না। বেঁচে থাকার সময় যত যন্ত্রণাই দিক, মরার পরে মহাপুরুষদের আদর করতে বাঙালিদের তুলনা নেই। যে-পেন্সিল দিয়ে স্বামীজি বাল্যকালে নাকে নস্যি গুঁজতেন সেটা জোগাড় করতে পারলেই এখন তুমি অনায়াসে লাখ টাকা পাবে। যত দিন যাবে, ঘটনার অস্পষ্টতা যত বাড়বে, এইসব কৌতূহল ততই ঘনীভূত হবে সনাতন। যখন তুমি খুব বড়লোক হবে, বিজনেস থেকে যখন কোটি কোটি টাকা আসবে তখন দক্ষিণেশ্বরের কর্তা ও তাঁর চেলাদের জীবনকে ঘিরে একটা মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা কোরো। ততদিনে চাকরি থেকে রিটায়ার করে আমিও ওখানে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে বসবো। সমকালে এঁরা কত নির্যাতিত হয়েছিলেন তার বিবরণ দেবার জন্যে একটা স্পেশাল ঘর থাকবে। এখন ওসবে মাথা ঘামিয়ে না সনাতন, এখন মিষ্টিকেই ইষ্টি করে এগিয়ে যাও, যত পারো এগিয়ে যাও সনাতন।"





সনাতন যে সত্যিই মিষ্টান্নকে তার ব্যবসায়িক যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গ্রহণ করবে তা ছটকো ভাবতেই পারেননি। সনাতন মাঝে-মাঝে খবর পাঠিয়ে গিয়েছেন এবং হুটকো সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন।

সনাতন লিখেছে, "মিষ্টান্নপ্রেমীর এই দেশ ভারতবর্ষ—মিষ্টির মহাতীর্থ এই কলকাতা। সাধারণত মিষ্টির ব্যাপারে প্রত্যেক জাতই ভীষণ রক্ষণশীল, অন্যের মাছ মাংস শাকসবজি সব চাখবে, কিন্তু কিছুতেই নিজের ডেসার্ট পাল্টাবে না, এইটাই নিয়ম। কিন্তু কলকাতার পেটুকরা সবার মিষ্টি চাখতেও ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। কেক বলো, পুডিং বলো, সুফলে বলো, সন্দেশ বলো, রসগোল্লা বলো, প্যাঁড়া বলো, গজা বলো, শ্রীখণ্ডে বলো সব মিষ্টান্নকে কিছুক্ষণের জন্যে রসনার সিংহাসনে বসাবার জন্যে কলকাতার মানুষরা উদগ্রীব। সেই সঙ্গে চলেছে তার নিজস্ব রেনেসাঁসি সাধনা। বাগবাজারের নবীন ময়রা দুড়ুম করে রসগোল্লা বার করে ফেললেন, হাওড়ার এক ময়রা বিশ্বকে উপহার দিলেন লেডিকেনি। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে নবীন ময়রা এবং তাঁর আবিষ্কারকে ডোবাতে বসেছিল স্থানীয় বাঙালিরা। নবীন প্রথম স্বীকৃতি পেলেন এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোকের কাছে এবং তিনিই গাঁটের কড়ি খরচ করে হাঁড়িহাঁড়ি রসগোল্লা বন্ধুমহলে বিতরণ করে নবীন এবং তাঁর নতুন আবিষ্কারকে বিখ্যাত করে দিলেন। স্থানীয় লোকরা ধারে

খেতে চাইতো, সেই সঙ্গে দাবী করতো ফ্রি সাম্পল। প্রচারের প্রয়োজনে দালদার, কোকোকোলার, পেপসির ফ্রি সাম্পল হরির লুঠ হতে পারে, কিন্তু অমৃত অথবা রসগোল্লা অথবা জিলিপি অন্য স্তরের বস্তু, ফ্রি সাম্পল হওয়ার জন্যে এসবের জন্ম নয়, বুঝেছো ব্রাদার।"

হুটকো সেবার বন্ধুকে লিখলেন, "বাগবাজার স্ট্রীটে নবীনের আদি দোকানটা দেখবার জন্যে সুদূর বিদেশে মনটা ব্যাকুল হয়ে রয়েছে, সনাতন। টিনে সিল করা দাশের রসগোল্লা আর বাগবাজারের গরম রসগোল্লার কী তফাত তা আমার মতন অভাগা ছাড়া হাওড়ার কে বুঝবে ? তবে জেনে রাখো, রসস্রষ্টা হিসেবে রবি ঠাকুরের সঙ্গে সমানতালে প্রতিযোগিতা করছেন কে সি দাশ। কবিতার রস পেতে হলে ভাষা শিখতে হয়, মিষ্টান্নর মহত্ত্ব বুঝতে কোনো ট্রেনিং-এর প্রয়োজন নেই। তাই রবি ঠাকুর কর্নাটকে, কেরালায়, বম্বেতে ক্রমশই পিছিয়ে পড়বেন। আমাদের স্বপ্ন, একদিন আমাদের বন্ধু সনাতনও দিগ্বিজয় করবে। ঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে শোনা বাণী হলো গরম রসগোল্লা, আর টিনের রসগোল্লা হল ছাপানো কথামৃত। সারাক্ষণ কানের গোড়ায় ঠাকুরকে কী করে পাবে ?"

পত্রমাধ্যমে সনাতন তার বন্ধুকে বুঝিয়ে দিয়েছে, "এদেশের মিষ্টি খাবার জন্যও ট্রেনিং দরকার। যারা অভ্যস্ত নয় তাদের একবার সন্দেশ খেতে দিয়ে দেখো। সায়েব মেম হলে তো দমবন্ধ হয়ে মারা যাবার আশঙ্কাও আছে। সন্দেশ খাওয়ার জন্যে যে কতখানি কসরত লাগে তা বাঙালিরা বোঝে না। আবার, যেখানকার ভাষা শিখবার ইচ্ছে সেখানকার মিষ্টি খেলে ফল বিশেষ ভাল হয়। যেমন ধরো বাংলা ভাষা, মুখে রসগোল্লা পুরে সায়েব যদি বেলুড়মঠে কীর্তন গায় তাহলে স্পেশাল এফেক্ট পাবে।"

এই ধরনের চিঠি পেয়েও আনন্দ, দিয়েও আনন্দ। কিন্তু হুটকো হালদার লক্ষ্য করেছেন, সনাতনের দিক থেকে উত্তর আসতে ক্রমশই দেরি হচ্ছে। চিঠির আকারও ছোট হচ্ছে।

বলবার কিছু নেই, সহজেই হুটকো আন্দাজ করতে পারেন সনাতনের

কাজের পরিধি ক্রমশ বাড়ছে। সময় নিশ্চয় কমছে। মালক্ষ্মী যাঁর উপর কৃপাবর্ষণ করেন তাঁকে অন্য কোনো কাজের জন্য ছাড়তে চান না, সারাক্ষণ নিজের কাজেই কাছে আটকে রাখতে ভালবাসেন।

আর ঘনশ্যাম। তার স্বভাব একটু আলাদা। চিঠি লেখাটা তেমন ওর ধাতে আসে না। বিয়ের পরে বউকেও বাপের বাড়িতে সে বেশি চিঠি পাঠাতে পারেনি।

"ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা আমার একদম আসে না, হুটকো। আর কারবারে থেকে থেকে মনটা সারাক্ষণ নাফার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকে। যে কাজে নাফা নেই তাতে সময় দিতে ইচ্ছে করে না। নাফা বুঝলে তো হুটকো ? বাঙালিরা যাকে বলে মুনাফা ! একটি অক্ষর তুলে নিয়েই তোমাদের মতন বাবুদের মাথায় বজ্রাঘাত।"

হুটকো লিখেছেন, "ঘনশ্যাম, যস্মিন দেশে যদাচার। যে পেশা নিয়েছো তার মন্তর তোমাকে তো আওড়াতেই হবে—নান্যপন্থাঃ বিদ্যতেয়ম। পড়তা এবং নাফা এদুটো যদি ঠিকমতন আয়ত্ত করে হাওড়ার লোকদের মাথায় ঢুকোতে পারো তাহলে একদিন তোমারও স্ট্যাচু মল্লিক ফটকের মোড়ে খাড়া হবে।"

উৎসাহ পেয়েছেন ঘনশ্যাম, তবু প্রতিবাদ জানিয়েছেন : লিখেছেন, "এদেশে স্ট্যাচু হওয়া বড়ই বিপজ্জনক, হুটকো—পাখিতে মাথায় হেগে দেবে, অথচ কিছু করা যাবে না, চুপচাপ তোমাকে দাঁড়িয়ে অথবা বসে থাকতে হবে ! তবে বলতে পারো, তখন তো তুমি বেঁচে নেই। টেঁসে যাবার পরে কাক এবং লোক কাকেই বা সম্মান করে ?"

হুটকো একমত হননি। তিনি পত্রাঘাত করেছেন, "তা বোলো না, হ্যাদা। বাঙালিরা গোড়ায় গোড়ায় মানুষকে খোঁচা দিলেও শেষে খুব ভালবাসে। কত লোকের স্ট্যাচু বসেছে এই বাংলায় একবার হিসেব করে দ্যাখো। শুধু বলতে পারো, স্ট্যাচুগুলোই চোখের সামনে রয়েছে, লোকগুলোর পরিচয় কিছু ঘোষণা করা নেই।"

"তা যা বলেছো হুটকো।" উত্তর দিয়েছেন ঘনশ্যাম। "পৃথিবীতে ভাল মানুষের তো অভাব হবে না ; লোকে কাঁহাতক স্ট্যাচু বসাবে ? মূর্তি বসাতে বসাতে শেষে জ্যান্ত মানুষের নড়াচড়ার জায়গা থাকবে না কলকাতায় এবং হাওড়ায়।"

হুটকো রসিকতা করেছেন, "কিন্তু এর একটা ভাল দিকও আছে। বড়সড় গাছ তো শহরে কোথাও রইলো না। পায়রাফায়রাগুলো বাসা বাঁধবে কোথায় ? উঁচু একটু স্ট্যাচু হলে ওরা এসে জড়ো হতে পারে, ওদের পক্ষে মন্দের ভাল। তবে যারা বুদ্ধিমান তারা কালো স্ট্যাচু করে না, অসভ্য পায়রার অসাবধানতায় কিছুদিনের মধ্যে সাদা স্প্রে হয়ে যায়। রাজারানি, লাটসায়েব, এঁদের একদিন এমন হেনস্তা হবে জানলে ওঁরা কিছুতেই স্ট্যাচু হতেন না।"

ঘনশ্যামের খবরাখবরও ক্রমশ কমে আসছে। হুটকো নিজেও এর জন্য কিছুটা দায়ী। আগে একখানা চিঠির উত্তর প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে না এলে তিনি নিজেই রিমাইন্ডার পাঠাতেন। আজকাল নিজের কর্মক্ষেত্রেও দায়িত্ব বেড়েছে। ফাঁকি দিয়ে এবং গায়ে হাওয়া দিয়ে বোম্বাইতে অন্ন সংগ্রহ করা বহিরাগতর পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়।





হাওড়া থেকে চিঠি আসে না বলে কোনো দুঃখ নেই হুটকোর। বন্ধুরা মন দিয়ে বিজনেস করছে করুক। অর্থে আর সাফল্যে ওরা আরও বড় হোক এই প্রার্থনা।

প্রথমে প্রথমে চিঠির দেরিতে অবশ্য রাগ হতো, দুঃখ হতো। মনে হতো যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে।

কিন্তু ইদানীং বিখ্যাত লেখকের একটা লাইন পড়ে মনটা অন্যরকম হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে, এই ক'টা লাইন হুটকো হালদার সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধুকেই পোস্টকার্ড মারফত অবহিত করেছিলেন।

"ভায়া, রবি ঠাকুরের মতামত এইমাত্র হাতের গোড়ায় পেলাম। তোমাদেরও জানা প্রয়োজন, তাই ফরওয়ার্ড করছি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বাঙালি মনে করে, যথেষ্ট পরিমাণ পরিশ্রম না করিয়াও গোলেমালে কাজ সারিয়া লওয়া যায়, বীজ রোপণ না করিয়াও কৌশলে ফললাভ করা যায়, তেমন ফন্দি করিতে পারিলে মিথ্যোর দ্বারাও সত্যের কাজ আদায় করা যাইতে পারে। এই জন্য বাঙালি কাজ লইয়া দাম দেয় না, দাম লইয়া কাজ দেয় না, ...বাঙালির জীবনটা কেবল গোঁজামিল।' ভদ্রলোক এই প্রবন্ধে লিখেছিলেন, বহু বছর আগে তখনকার খ্যাতনামা সঞ্জীবনী পত্রিকায়।"

কখনও কখনও এইভাবে মিষ্টির সাতকাহনও গাওয়া হয়েছে সনাতনের পত্রাবলীতে। সনাতন শুধু মিষ্টির ব্যবসায় ধারাবহিক সাফল্য অর্জন করে চলেছে তা নয়, সেই সঙ্গে বঙ্গীয় মিষ্টান্ন শিল্পের ঐতিহাসিক ও নান্দনিক দিকটাও সে পরম আগ্রহে খঁতিয়ে দেখছে। এই কাজে ক্রমশই সে উৎসাহী হচ্ছে।

হুটকো দূর থেকে যতখানি সম্ভব বন্ধুকে উৎসাহ জুগিয়ে যাচ্ছেন। বলছেন, "মনে রাখতে হবে শুধু ক্ষুধানিবারণের জন্যেই মিষ্টান্নের জন্ম নয়। রসনার পরিতৃপ্তির সন্ধানে হাজার হাজার বছর ধরে আমরা ভারতবর্ষের মানুষ নানা বিচিত্রপথে পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছি। শুধু রসনার তৃপ্তি নয়, মিষ্টান্নকে দৃষ্টিনন্দন করার জন্যেও কত চেষ্টা চলেছে কত ভাবে। এইসব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিবর্তন নিয়ে আলোচনা এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও হয় না। অথচ রসিকজাতরা অনবরত এই ধরনের কাজ করেছে—ফরাসি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁউরুটির ইতিহাস নিয়ে সিরিয়াস গবেষণা চালাচ্ছেন বিদগ্ধ অধ্যাপকরা। আমেরিকায় হামবার্গার ইউনিভার্সিটি হতে চলেছে।"

বন্ধু সনাতন উত্তর দিয়েছেন, "ভাই হুটকো, এদেশে মহাপণ্ডিতরা এখনও খাবারকে নিচু চোখে দেখেন। বামুনঠাকুর ও কারিগরের ওপরেই মহাদায়িত্বটা সম্পূর্ণ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুরসিক ফরাসিদের চিন্তাধারা অন্যরকম, হুটকো—সাধে কি আর বিবেকানন্দ ওদের দেখে মজেছিলেন। মস্ত বড় জাত—বোধহয় দুনিয়ার সেরা।"

কয়েক দিন পরেই উত্তর দিয়েছেন হুটকো হালদার। "ভাই সনাতন, এদেশের চিন্তানায়করা একদিন নিশ্চয় খাবার সম্বন্ধে আগ্রহী হবেন। তখনই এদেশের মিষ্টান্ন কর্মীরা শিল্পীর সম্মান লাভ করবেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর খুব অল্প দেশই খাদ্যে (বিশেষ করে মিষ্টান্নে) কোনো বিশেষ জাতীয় ধারার সূত্রপাত করতে পেরেছে। ক্ষুধা, রসনা ও ইতিহাস ছাড়াও এর জন্য যা প্রয়োজন তা হলো সেই জনপদের দার্শনিক ভিত্তিভূমি। যেমন প্রাচীন যুগে চীনারা বিশ্বাস করতেন

পারিবারিক সুখশান্তির ভিত্তিভূমি হল প্রত্যাশা অনুযায়ী ভোজন। সেই জন্য রন্ধনে অবহেলাকে দাম্পত্য অপরাধের মধ্যে গণ্য করা হতো, ভাল রাঁধতে পারে না এই প্রমাণ দিয়ে যে কোনো বিবাহিত চীনা পুরুষ তার স্ত্রীকে ডাইভোর্স করতে পারতেন।"

সনাতন সানন্দে লিখেছে, "চীনের ব্যাপারে চাঞ্চল্যকর খবর দিয়েছো, হুটকো। কিন্তু আমাদের মহান প্রতিবেশীরা কখনও মিষ্টিতে তেমন মন দেয়নি, কেন বল তো ? অনেক চাইনিজ রেস্তোরাঁয় সুইট ডিশ পাওয়াই যায় না, খুব টানাটানি করলে টিনের লিচু রেকমেন্ড করবে। মঙ্গোলিয়ান সিভিলাইজেশনের দুশ্চিন্তার দিক এইটা, অথচ বিবেকানন্দ এই পীত জাতিকে মাথায় তুলে নেচেছেন, ইঙ্গিত করেছেন এরাই একসময় পৃথিবীর অধীশ্বর হবে।"

চিঠি পেয়ে খুব আনন্দ পেয়েছেন হুটকো হালদার। বোম্বাই থেকে সরাসরি উত্তর পাঠিয়েছেন, "এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনে একজন পুজ্যপাদ সন্ন্যাসীর নির্দেশিকা গ্রহণ করলাম। মিষ্টি নিয়ে এতো মাথাঘামানি ফরাসি দেশ ছাড়া আর কোথাও নেই। চীনারা যে কোথায় নজর দেয় এবং কোথায় দেয় না তা বোঝা দায়। তবে ওদের দুর্বলতাই হতে পারে আমাদের শক্তির উৎস। মনে রাখতে হবে, যুগযুগান্ত ধরে রস কথাটাকে আমরা বিশাল তাৎপর্য দিয়ে যাচ্ছি ধর্মগ্রন্থে, সাহিত্যগ্রন্থে, দার্শনিক বিশ্লেষণে। এই রস অবশ্যই আদিতে ইক্ষুরস, কিন্তু তারপর রসসৃষ্টির গভীরে প্রবেশ করে আমরা যেসব দার্শনিক ও নান্দনিক চিন্তা পাকা করেছি তা ভাবতে সায়েবরা এবং জাপানিরা ভিরমি খাবে।"

সনাতন রসিকতা করে দ্রুত উত্তর দিয়েছে হাজার কাজের মধ্যে। ভাই হুটকো, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। এবার এলে মিষ্টান্ন শিল্প থেকে তোমাকে মানপত্র দেওয়াবার প্রস্তাব করবো। মঠের পুজ্যপাদ মহারাজের নামটিও পাঠিও। কিন্তু এখানে এখন ভাঁটার সময়। কলকাতার জাঁদরেল রাস্তা 'রসা রোডের' নাম পাল্টে গিয়েছে তুমি লক্ষ্য করোনি বোধ হয় !"

হুটকোও ছাড়বার পাত্র নন। লিখেছেন, "ভাই মানপত্র নিয়ে কী করবো ? তার বদলে শালপত্রে কিছু বোঁদে অথবা মিহিদানা উপহার দিও। মানকচুর পাতায় একসময় সন্দেশ বিক্রি হত বনগাঁ বসিরহাট অঞ্চলে। এখন নিশ্চয় মানুষ অনেক বেরসিক হয়ে উঠেছে। চুপিচুপি তোমার অবগতির জন্যে জানাই, রসা রোডে একবার একটা টেমপোরারি কাজ জুটিয়েছিলাম। তখন শুনেছিলাম, ঐ রসার সঙ্গে বাঙালির রসের কোনো সম্পর্ক নেই—রসা নামে এক জাঁদরেল ইংরেজ সায়েব ওখানে কী একটা ইনজিনিয়ারিং কারখানা বানিয়েছিলেন। তবে তুমি বলতে পারো, অমন মিষ্টি নামের মানুষ কখনও জাঁদরেল হতে পারেন না।"

এরপর কিছুদিন উত্তর আসেনি কলকাতা থেকে। হাজার কাজে হইহই করে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে সনাতন।

তারপর একদিন দীর্ঘ ব্যবধানে সনাতন লিখেছে, "বিলম্বে বিরক্ত হয়ো না, ভাই হুটকো। টুপাইস কামাতে গিয়ে যাতে বিফল মনোরথ না হতে হয় তার জন্যে চেনা-অচেনা নানা রকমের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। মিষ্টির দোকান লাভজনক অবস্থায় চলুক তা বোধ হয় আমাদের সরকার চান না। সুযোগ পেলেই তাঁরা পেরেক গুঁজে দেন ময়রার শরীরে।"

হুটকো হালদার তখনও রসবোধ থেকে বঞ্চিত হননি। তিনি খামে উত্তর পাঠিয়েছেন, "দুঃখ কোরো না, ভাই সনাতন ! শক্তিমান কর্তাদের স্বভাবই ওই—মনে রেখো ভগবান যীশুর শরীরেও সরকারী কর্তারাই পেরেক গুঁজেছিলেন। চিরকালই কর্তারা নরম শরীরে পেরেক পুঁততে ভালবাসেন। তবে জেনে রেখো, রসিকজনের দেশ এই ভারতবর্ষ। এখানে কস্মিনকালেও কেউ রসস্রষ্টা ময়রার গায়ে হাত তুলতে সাহস পাবে না। সহজ ব্যাপারটা বুঝতে হবে, রন্ধনটা এদেশে ভগবৎসেবার অঙ্গ। এখানে রান্নার জন্যে রান্না হয় না। অন্নব্রহ্ম কথাটা স্রেফ মিটিংকা বাত নয়। এদেশে খাবার তৈরি হয় দেবতার কাছে নিবেদনের জন্যে। দৃষ্টিভাগের প্রধান অংশ হলো মিষ্টান্ন। ভোগটা ছেলেখেলার ব্যাপার নয় আমাদের দেশে। এর জন্যে পবিত্রতা দরকার, পরিচ্ছন্নতা দরকার,

নানাবিধ আচারবিচার দরকার। দেবতা সন্তুষ্ট হবার পরে যা অবশিষ্ট থাকে সাধারণ মানুষের জন্যে তার নাম প্রসাদ। মহাশক্তিমান কেউ প্রসীদ হয়েছেন, তারপর যা বিতরণযোগ্য সারপ্লাস তাই প্রসাদ, বুঝলে সনাতন! তোমাকে গিন্নিকেও বোলো এবং তাকে জানিও নবজাত কন্যাটির নাম রাখা হোক বিভাবরী—বিশেষ করে সে রাত্রে যখন গর্ভধারিণী জননীকে জ্বালাতন করছে—কবি এইসব জেনেই তো লিখেছিলেন, জাগরণে যায় বিভাবরী!"

সনাতন এতোই খুশি হয়েছে যে বলবার নয়। সে জানিয়েছে, সে সত্যিই যদি কোনো বিজনেসে দাঁড়ায় তাহলে হুটকোকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠানের প্রচারসচিব করে নেবে। এদেশের রাঁধুনিরা হুটকোর শ্রমে তাদের লুপ্ত সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মান ফিরে পাবে। নবজাতিকার বিভাবরী নামটি সনাতন গৃহিণী সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন।



এতক্ষণ ধরে যা সব জানা গেলো সেসব যে অনেকদিন আগেকার কথা তা পরিষ্কার হয়ে যাওয়াই ভাল। কারণ, সময় বড়ই দ্রুতলয়ে লাফ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

হাওড়ায়, কাসুন্দিয়ায়, গোপাল ব্যানার্জি লেনে ট্রাফিকের গতি এবং মানুষের মনোবৃত্তি যতই শ্লথগতি হোক সময় সেই চিরকালের মতন বল্গাহীন হয়েই

ছুটেছে। সেদিন মাত্র যারা যুবকযুবতী ছিল তারা মধ্যবয়সী বা বয়সিনী হয়েছে। যাদের চোখে ছিল কেবল ভবিষ্যতের স্বপ্ন তারা এখন ঘাড় ফিরিয়ে অতীতের দিকে তাকাতে অভ্যস্ত হয়েছে। অনেকের ক্ষেত্রেই জীবনে যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, এখন কেবল পাওনাগণ্ডা মিটাবার সময়।

অনেক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এখনও হাওড়া কাসুন্দিয়ার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে নিয়মিত ঠাকুর-স্বামীজীর জীবনের অমৃতকথালোচনা অব্যাহত রয়েছে। লোকে একই কথা বারবার শোনে, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে কোনো কিছুই যেন পুরনো হয় না।

সেদিন ঘনশ্যাম ঘোষাল কাসুন্দিয়া আশ্রমে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। মন্দিরের আয়তন একটু বাড়াবার জন্যে যে আবেদন প্রচারিত হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে পিতৃস্মৃতি রক্ষার্থে ঘনশ্যাম কিছু দান করেছিলেন। সেখানেই সুখবিলাস স্মৃতি ফলক স্থাপিত হলো। গঙ্গার পশ্চিম তীরে সুখবিলাস এখন একটি শ্রদ্ধেয় নাম।

যাঁরা সভায় বক্তৃতা করলেন তাঁরা কেউ অবশ্য সুখবিলাস ঘোষালকে দেখেননি। বক্তৃতায় তা তাঁরা স্বীকার করলেন।

বক্তৃতা শুনতে-শুনতে অবাক লাগলো ঘনশ্যামের। এমন দিন সামনেই আসছে যখন আশ্রম প্রাঙ্গণের কেউ ঘনশ্যামকেও স্মরণ করতে পারবে না। বুড়ো হাবড়ার দলে নথিভুক্ত হলেন বলে ঘনশ্যাম। এইভাবেই বয়ে চলে খেয়ালি সময়ের উদ্দাম খরস্রোত।

সভার মধ্যেই হঠাৎ আপনমনে হেসে ফেললেন ঘনশ্যাম। এখন বুড়োহাবড়াদের নতুন নামকরণ হয়েছে—সিনিয়র সিটিজেন। এর বাংলাটাও তরতর করে স্মরণ করে ফেললেন ঘনশ্যাম—বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক কিংবা প্রবীণ নাগরিক।

তাঁর বয়সী কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো মিটিঙে। দু'জন বললেন, তাঁরা কাজ থেকে রিটায়ার করেছেন। অবাক হয়ে গেলেন

ঘনশ্যাম। এঁরা তো সেদিন মাত্র কাজে যোগ দিলেন, রিটায়ারের সময় এলো কী করে ?

সেসব খোঁজখবর করবার আগেই এক পুরনো বন্ধু বললেন, "গুঁইরামদা বলতেন, মনে আছে ঘনশ্যাম ? তোমরা এম এ পি আর এস হয়ে বিবেকানন্দ স্কুলের মুখোজ্জ্বল করবে। অনেক পরে আমরা রসিকতা করতাম, রায়চাঁদ হতে না পারি কিন্তু চেষ্টা করলে প্রেমচাঁদ হতো পারবো অবশ্যই। কিন্তু বিবেকানন্দ ইস্কুলের শিক্ষার 'দোষে' তা হওয়া গেলো না ! বড় কোনো অন্যায় করতে গেলেই এই ইস্কুলের ছাত্রদের মনটা কেমন খচখচ করে ওঠে। এতদিনে ঠাকুর মুখ তুলে চাইলেন, পূজ্যপাদ মাস্টারমশাইদের প্রত্যাশা পুরণ করে এম এ পি আর এস না হয়ে বিলিতি কোম্পানির ভি আর এস হয়ে হাওড়ায় ফিরে এসেছি।"

ব্যাপারটা বুঝতে একটু দেরি হয়েছিল ঘনশ্যামের। তারপর পরিষ্কার হয়ে গেলো।

মধু হাজরা বললেন, "ভি আর এস বুঝলে না ঘনশ্যাম ! মা দুর্গার যেমন অকালবোধন--সময়ের আগেই পুজো, হাওড়ার বাবা শিবদের তেমন কারখানা থেকে অকাল অবসর। আইন বাঁচিয়ে উকিলরা, মালিকরা এবং নেতারা নাম দিয়েছেন স্বেচ্ছা অবসর, ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট স্কিম। যাতে তোমার মনে কষ্ট না হয় ; যাতে সংসারের কোনো লোক না বলে তুমি ছাঁটাই হয়েছো। রিট্রেঞ্চমেন্ট এবং ভি আর এস-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, ঘনশ্যাম। জি-কে-ডবলু কোম্পানির অবস্থা খারাপ, সুতরাং স্বেচ্ছায় কিছু বাড়তি সুবিধে নিয়ে চাকরি ছেড়ে চলে যাও, না হলে ছাঁটাই হবে। তখন আমাকে দোষ দিও না। একটাকে বলতে পারো ফাঁসি, আর একটাকে সুইসাইড !"

শুনে যাচ্ছেন ঘনশ্যাম। পুরনো যুগের বন্ধুদের হারিয়ে যাওয়া কথাবার্তা। বাণীকণ্ঠ মুখুজ্যে বললো, "জানিস ঘনশ্যাম, প্রথম পর্বে কর্মজীবনে ছিলাম আধা পার্মানেন্ট—কোয়াসি পার্মানেন্ট—লোকে আড়ালে বলতো খাসী। এখন নামের পাশে লিখতে পারি ভি-আর-এস।"

ঘনশ্যাম শুনছেন। পুরনো সহপাঠী মধু হাজরা বললেন, "নামে স্বেচ্ছা অবসর ! আসলে ঘাড় ধরে চাকরি থেকে বিতাড়ন। কোম্পানির ডেপুটি পার্সোনেল ম্যানেজার বলেই দিয়েছিল, যদি ভি আর এস চিঠিতে সই না করেন তাহলে কিন্তু পরের মাসেই ছাঁটাই হতে পারেন। তখন পাওনা টাকাকড়ি বিশবাঁও জলে, কোম্পানির যা অবস্থা বুঝতেই পারছেন।"

মধু হাজরা বললেন, "অসময়ে চাকরি হারাবার জন্যে কিন্তু কোনো কাঠখড় পুড়োতে হয় না। কোম্পানিকে লেখা তোমার চিঠিটা পর্যন্ত ঝকঝকে ভাবে ছাপানো থাকে, শুধু সই করলেই হলো। কোম্পানি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো, তারপর তোমার যে সর্বনাশ হয় হোক।"

একটু অস্বস্তি অনুভব করছেন ঘনশ্যাম ঘোষাল। বুঝেসুঝেও বোকার মতন পুরনো বন্ধুদের মুখের দিকে তিনি তাকিয়ে থাকলেন।

মধু হাজরা বলেছিলেন, "মন্দিরের চত্বর বাড়াবার প্রয়োজন ছিল, ঘনশ্যাম। এ-পাড়ায় যেভাবে ভি আর এস-এর সংখ্যা বাড়ছে। এঁরা সব কোথায় বসবেন বলো ? তুমি দেখবে, যতো সময় খারাপ আসবে দেবদ্বিজে মানুষের ভক্তি ততো বাড়বে। তবে রামকৃষ্ণ মঠমিশনের সন্ন্যেসীদের দুঃখ কমবে না। তাঁরা তো সারাক্ষণ দুঃখ করছেন, বুড়ো হাবড়াদের মনে আরও ভক্তি বাড়িয়ে কী লাভ ? এই বুড়োদের নিয়ে মাতামাতি করবার জন্যে তরুণ ব্রহ্মচারীরা তো বাপমাকে কাঁদিয়ে ঘরসংসার ত্যাগ করেন না। যাদের মধ্যে কাজ করে ঠাকুরের ইচ্ছা পালন করা যায় সেইসব তরুণরা আজকাল আর গীতা ক্লাসে, বেদ ক্লাসে, উপনিষদ ক্লাসে আসতে চায় না। বাংলার যৌবন এখন বাড়ির সোফায় বসে কেব্‌ল টি ভি দেখে, ক্লাসের বন্ধুদের ম্যারাথন ফোন করে এবং কোথায় ডিস্কো হচ্ছে তার খবর নেয়।

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আশ্রমবাসীদের আন্তরিক ধন্যবাদের উত্তরে ঘনশ্যাম দু'একটা কথা বলেছিলেন। এখানে অনেক বড় কাজ হয়েছে এবং আরও কাজ হবে। এই ধরনের একটা আশার সুর তুলে ঘনশ্যাম তাঁর কথা শেষ করলেন।

ঘনশ্যামের মনে পড়লো হেডমাস্টার সুধাংশুবাবু বলতেন, "কখনও পাস্ট টেন্স দিয়ে বক্তব্য শেষ করবে না। এই যে স্বামীজির বাণী এতোদিন পরেও মানুষের বুকে আগুন ধরিয়ে দেয় তার একটা কারণ সব সময় তিনি জোর দিচ্ছেন ফিউচার টেন্‌স-এর ওপর। মানুষের যতো চিন্তা তা এই ভবিষ্যৎ নিয়ে।"

সভার শেষে সামান্য প্রসাদ বিতরণ ছিল। পঙক্তিতে বসে প্রসাদ ভক্ষণ এখনকার শরীরে সম্ভব নয়। ঘনশ্যাম অনুরোধ করলেন, "আমার প্যাকেটটা গাড়িতে দাও। ডিনার টাইমে বাড়িতে সবাই মিলে সদ্‌গতি করা যাবে।" আসলে আজেবাজে জায়গার খাবার আজকাল ঘনশ্যামের সহ্য হয় না, কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে সবাইকে বলা যায় না।

ঠাকুরের এই প্রসাদের কথা পরের দিন সকালেও ঘনশ্যাম ঘোষালের মনে উঁকি মারছে। যদিও নির্ধারিত প্রসাদের প্যাকেট বাড়ি পৌঁছয়নি। ড্রাইভারকে মাঝপথে ঘনশ্যাম নির্দেশ দিয়েছিলেন, "প্রসাদের প্যাকেটটা তুমি খেয়ে নাও।"

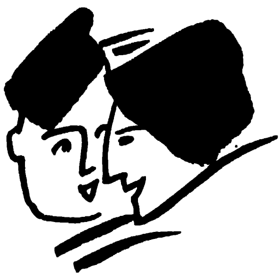
ড্রাইভার জানিয়েছিল, সে ওখানে প্রসাদ পেয়েছে। "অধিকন্তু ন দোষায়, বুঝলে হে। খেয়ে নাও, ওসব রান্না এখন আমার সহ্য হয় না।"

ড্রাইভার তার মালিকের নির্দেশ মতন কাজ করেছে। আর ঘনশ্যাম ভেবেছেন, বিগত দিনে এই প্রসাদ পাবার জন্যে তাঁদের মধ্যে কী উন্মাদনা ছিল!

হুটকো হালদারের পাল্লায় পড়ে কোথায় ঠাকুরের প্রসাদ পাননি ঘনশ্যাম? দক্ষিণেশ্বর, কাশীপুর, বলরাম মন্দির, শ্যামপুকুর, বরানগর, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান, আলমবাজার, বেলুড় সব জায়গার প্রসাদের স্বাদ মনে হয় এখনও জিভে লেগে রয়েছে। ভিড় ঠেলে বাগবাজার মায়ের মন্দিরেও প্রসাদ নিয়ে এসেছেন ঘনশ্যাম।

হুটকো রসিকতা করতো, "যত পারো প্রসাদ টেনে নাও হ্যাদা, ঠাকুর আরও বেশি করে তোমার সুবৃহৎ শরীরে সারাক্ষণ উপস্থিত থাকবেন।"

আর এখন ? ঘনশ্যাম একবার ভাবলেন, শরীর ভাল আছে। আকারে এবং ওজনে শ্রীবৃদ্ধি যথেষ্টই হয়েছে। যদিও ঠাকুর এই দেহমন্দিরে কতটুকু উপস্থিত আছেন তা আন্দাজ করা কঠিন। ওইটুকু মানুষ আর কত শরীরে বিরাজ করবেন ?



বলা বাহুল্য, যে-ঘনশ্যাম ঘোষালকে আমরা গল্পের প্রথম পর্বে দেখেছি, যে-ঘনশ্যাম আমাদের পরিচিত হুটকো হালদারের সঙ্গে হাটে-মাঠে-ঘাটে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতো সে ঘনশ্যাম আর নেই।

নব কলেবর এই ঘনশ্যামের শরীরে কিছুটা মেদ সংগৃহীত হয়েছে। জীবনের মধ্যপর্ব পেরিয়ে চূড়ান্ত সীমায় প্রবেশের আগে প্রতিষ্ঠিত বাঙালিদের সাধারণত এরকম শ্রীবৃদ্ধি হয়েই থাকে। এ নিয়ে একসময়ে কত রঙ্গরসিকতা হয়েছে দুই বন্ধুর মধ্যে। সেসব কথা এতোদিন পরেও ভোলা যায় না। সেসব কথা মনে হলে ঘনশ্যামের হঠাৎ হাসি এসে যায়।

আমাদের ঘনশ্যাম ঘোষাল এখন আর ক্ষুদ্র কারবারি বা অর্ডিনারি বিজনেসম্যান নন। তিনি এখন প্রকৃত অর্থে একজন শিল্পপতি। কারবারি বললেই যেন দোকানদার দোকানদার মনে হয়। যেমন ছিলেন ঘনশ্যামের দাদামশাই চারুবিলাস ঘোষাল। ব্যাঙ্কের চাকরি সেরে বিকেলে বড়বাজারে কেনাবেচা শুরু করেছিলেন তিনি। কারবারির প্রমোশন হয় বিজনেসম্যানে—

বিজনেস যে কত রকমের হয় তার তো কোনো শেষ নেই।

চারুবিলাসের সাধনা শুরু হয়েছিল জেনারেল অর্ডার সাপ্লাই দিয়ে। পুত্র সুখবিলাস প্রথম দিকে আলু পিঁয়াজের পাইকারি বিজনেস করতেন। ও-পাড়ায় কেউ বিজনেস বলে না, বলে কাজ।

সুখবিলাসের বন্ধু তুলসীদাস আগরওয়ালা নিষ্ঠাবান মাড়ওয়ারি, পেঁয়াজ খেতেন না। কিন্তু এই পিঁয়াজ মফস্বলে পাঠিয়ে তিনি লক্ষপতি হলেন। তাঁরই পরামর্শে সেবার সুখবিলাস ঘোষাল পিঁয়াজে অনেক অর্থ বিনিয়োগ করলেন, কিন্তু যথাসময়ে প্রবল ধাক্কা খেলেন। সেবার মাঠে পিঁয়াজের কী এক রোগ ধরলো।

শুধু পিঁয়াজ ধসলো না, সেইসঙ্গে সুখবিলাসও। কত টাকা লোকসান হয়েছিল তা বাবা সোজাসুজি কাউকেই বলেননি, কিন্তু ঘনশ্যাম বুঝেছিলেন, বাবার মনে একটুও শান্তি নেই।

বাবার জীবনের শেষ পর্বে ব্যাপারটা আবার ঘটলো। কর্মহীন গদিতে বসে তখন প্রায় মাছি তাড়ানোর মতন অবস্থা। বাবা বলতেন, "নিজের যা যাবার তা গিয়েছে, কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদ যে পাওনাদার তেমন নেই।"

"ধার করে কখনও বড়লোক বিজনেসম্যান হবার চেষ্টা কোরো না।" ঠেকে শিখে বাবা উপদেশ দিয়েছিলেন পুত্রকে। আর পুত্রের মনে পড়েছিল অন্য কথা। ওই যে নোটের বান্ডিল রাতে গুনে গুনে ক্লান্তি, এ-নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা। লক্ষ্মী ওইসব কথা শুনলেন নাকি?

বিভাবতী সেবার খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন স্বস্ত্যয়নের জন্যে তিনি সারাদিন উপোস করলেন, ছুটলেন সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে দেবদেবীদের মানভঞ্জন করাতে। "ঠাকুর অপরাধ নিও না, অবলা নারী, না বুঝে অবহেলা করেছি লক্ষ্মীকে।"

ঘনশ্যামের যে চিন্তা ছিল না তা নয়, কিন্তু বউকে তিনি ভাবনামুক্ত করতে চেয়েছেন। স্ত্রীকে বলেছেন, "এখন তোমার গর্ভে সন্তান। এই সময় অযথা দুশ্চিন্তা করতে নেই।"

অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠেছেন বিভাবতী, কথাগুলো শ্বশুর-শাশুড়ীর কানে গেলে কী অবস্থা হবে।

ঘনশ্যাম বলেছেন, "তুমি শুধু শুধু নিজের ঘাড়ে দোষ টানছো পুঁটু—তুমি তো নোটের বান্ডিলকে অপমান করোনি, তুমি শুধু প্রশ্ন করেছো নিজের হাতে মালিককে সব কিছু করতে হবে কেন ? সায়েবরা তো এমনভাবে ব্যবসা করেন না।"

বিভাবতী গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করেছেন স্বামীর প্রতি। সেই সঙ্গে ভয়ও পেয়েছেন প্রচুর। শ্বশুর শাশুড়ী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছেন, অলক্ষ্মী কোথা দিয়ে ঢুকেছে ? কারণ তখনই জামায়ের অসুখ প্রবল আকার ধারণ করছে। বিভাবতীর তখন বড় কঠিন সময়, কারণ ভয় পেলে, দুশ্চিন্তা করলে গর্ভের শিশুটির স্বাস্থ্য যে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তা তিনি বহু জায়গায় শুনেছেন।

যথাসময়ে একটি সুদর্শন স্বাস্থ্যবান সুলক্ষণ পুত্রের সৌভাগ্যবতী জননী হয়েছেন বিভাবতী ঘোষাল।

ঘোষাল পরিবারের অনুরোধে হুটকো হালদার প্রবাস থেকে চিঠিতে প্রস্তাব করেছেন, নাম হোক প্রিয়দর্শী। এ বাড়িতে কারও তেমন পড়াশোনা নেই। প্রিয়দর্শীর ইতিহাস জোগাড় করে সবাইকে বৌদ্ধ ইতিহাস বোঝাতে অনেক হাঙ্গামা হবে। ঠাকুমা আশঙ্কা করেছেন, প্রিয়দর্শী বললে, কুলোকের নজর লাগবে।

তখন হুটকো প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, "তা হলে নাম হোক অশোক।"

এই নামে খুশি হয়েছেন ঠাকুমা, যদিও জামায়ের শরীরের কথা চিন্তা করে বুঝতে পেরেছেন, শোক থেকে দূরে থাকা এই পরিবারের পক্ষে বেশিদিন সম্ভব হবে না।

পিঁয়াজে বহু টাকা লোকসান করে মনে সুখ ছিল না সুখবিলাসের। কয়েকমাস কারবারে তেমন কাজকম্মো করলেন না, শুধু বিভিন্ন বাজারে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর একদিন ছেলেকে বললেন, "ঘনশ্যাম, স্বপ্ন দেখলাম, ঠাকুর আমাকে চিঁড়ে ধরতে বলছেন।"

বাজারে বেরিয়ে ছেলেও অনেক খোঁজ নিলেন। "বাবা, লোকে চিঁড়ে খাওয়া ক্রমশ কমিয়ে দিচ্ছে। চিঁড়ে মুড়ির কোনো ভবিষ্যৎ এদেশে শেষ পর্যন্ত থাকবে বলে মনে হয় না।"

সন্তুষ্ট হলেন না, সুখবিলাস। বললেন, "কই সায়েবরা তো ব্রেড ছাড়ছে না! আমরা শুধু ফেঁতি সায়েব হচ্ছি। দুনিয়াতে এতো সায়েব ধরবে কোথায়?"

"মানুষের মন! সে চিঁড়ে খাবে, না রুটি খাবে তা সে নিজেই ঠিক করবে। তার খেয়াল অনুযায়ী যদি চিঁড়ের ব্যবসা উঠেও যায় কারও কিছু করবার নেই।"

তারপর ঘনশ্যাম হঠাৎ স্বপ্ন দেখলেন, তিনি চিঁড়ের পাহাড়ের সামনে সোনার হার পরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখের সামনে অন্নপর্বত ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। হতে হতে সমস্ত চিঁড়েই ম্যাজিকের মতন অদৃশ্য হয়ে গেলো। সেখানে তখন সোনার বিস্কুট ঝকঝক করছে।

পরের দিনই ঘনশ্যাম সিগন্যাল দিলেন, চিঁড়েতেই টাকা ঢালা যাক। ভাবলেন, যদি বিজনেসটা দাঁড়ায় তাহলে অশোককে একটা গিনির হার গড়িয়ে দেবেন।

চিঁড়ের ব্যবসায় সেবার ঘোষালদের যথাসর্বস্ব নিয়োগ করা হয়েছে। স্বামীর উদ্বেগ দেখে বিভাবতী জানতে চান, কী ব্যাপার তোমাদের? তুমি ও বাবা দু'জনেই কেমন আনমনা হয়ে থাকো।"

বাবার একটা পলিসি ছিল! "গদির কথা বাড়িতে এবং বাড়ির কথা গদিতে আনবে না। তাতে কোনো লাভ হয় না। জাত ব্যবসায়ীরা কখনও নাকি বউয়ের সঙ্গে বিজনেস আলোচনা করে না। কিন্তু ঘনশ্যাম দাম্পত্যজীবনের শুরুতে নিজেকে নিঃসঙ্গ করতে চাইতেন না। বউয়ের সঙ্গে বিজনেসের কথা বলে আনন্দ পেতেন।"

তবু কাউকে বলা যায় না যে হাজার হাজার বস্তা চিঁড়ে এখন জমা হয়ে রয়েছে বিভিন্ন গুদোমে। ধীরে ধীরে পাইকিরি বাজারে এই চিঁড়েকে নড়াতে হবে। চিঁড়ে বড় সুখী খাদ্য—একটু অনাচার হলেই ভোগের অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে। তখন দেবতার চিঁড়ে গোরুরও খাদ্য নয়।

সেবার কিন্তু ভাগ্যদেবী কৃপাবর্ষণ করলেন। আকাশ জুড়ে মেঘ এলো, তারপর দেশ জুড়ে নামলো অকাল বৃষ্টি।

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে। সেই বৃষ্টি আনলো বন্যা। এমনকি কলকাতাতেও বন্যা। জলের দাপটে শহরের নিচু অঞ্চলের বাড়ির লোকরা রাতারাতি নিরাশ্রয় হয়ে ছুটলো অন্য আশ্রয়ের সন্ধানে। সরকারি এবং বেসরকারি ত্রাণ শিবিরের কল্যাণে সেবার চিঁড়ের বাজারে যেন আগুন লাগলো। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দাম ডবল হয়ে, লক্ষ্মী যেন নিজেই পায়ে হেঁটে ফিরে এলেন ঘোষাল পরিবারের কারবারে।

ঘনশ্যাম বুঝলেন, পয়সা যখন আসে তখন এইভাবেই ছাত ফুটো করে আসে। আর যখন যাবার, তখন কেন যাচ্ছে তার কোনো কারণই বলে যায় না। সব ওই ছপ্পর ফুটকে!

ঘনশ্যামের পরিচিতরা পরামর্শ দিলেন লক্ষ্মীকে একবার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো যাতে তিনি আবার উঠি উঠি না করেন। সম্পত্তিতে টাকা লাগাও। বৃষ্টি হলেও চিন্তা নেই, বৃষ্টি না হলেও চিন্তা নেই। সম্পত্তি কখনও সেবায়েতকে ডোবায় না। বিষয় না বিষ যে বলেছিল সে এদেশের বিষয় সম্পত্তির হিসস্ট্রি তেমন জানে না।

ঘনশ্যামকে স্বীকার করতেই হবে, এই ব্যাপারে বাবার দূরদৃষ্টি ছিল। ছেলের সঙ্গে তিনি একমত, কারবারের টাকা কারবারেই রাখতে হবে, না হলে মালক্ষ্মীর অভিমান হবে। বাস্তুদেবতা এবং গণেশ দেবতা এক নন। ওই যে বিবেকানন্দ বলতেন, শাকের টাকা মাছে খরচ করা চলবে না। বলেছিলেন অন্য পরিপ্রেক্ষিতে, কিন্তু এর মধ্যে বিশ্বজনীন সত্যও আছে বেশ কিছুটা। বিচক্ষণ বাঙালিরা অবহিত হোন।

পরপর দু'বছর চিঁড়ে থেকে প্রচুর অর্থাগম হয়েছে ঘোষালদের। কিন্তু তারপর বহু ব্যবসায়ী রাতারাতি বড়লোক হবার জন্য চিঁড়ের ওপর চড়াও হয়েছেন। এই হচ্ছে এ দেশের বিজনেসের মুশকিল, যেখানে দুটো পয়সা হচ্ছে সেদিকে সবাই কাঙালের মতন হুমড়ি খেয়ে ছুটলো, বাজারটা পুরো নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ভিড় কমবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

লাঙলের গোরুর সঙ্গে বিজনেসম্যানের তুলনা করে কে একবার নিন্দিত হয়েছিলেন, কিন্তু সত্য হলো—একজনকে কোনো নির্দিষ্ট দিকে ছুটতে দেখলেই সারা বড়বাজার সেদিকে ছুটতে আরম্ভ করবে।

তবু আনন্দ, বাবা শেষ পর্যন্ত সাফল্যের মুখ দেখে গিয়েছেন। না হলে মেয়ের বৈধব্য দুঃখের ঘা সহ্য করতে পারতেন না। তবু বাবা শেষ বয়সে দুঃখ করতেন, "মা, আমাকে বিষচোখে দেখেছেন। অর্থের সুখ যদি বা দিলেন, ঘরের সুখ কেড়ে নিলেন।"

হুটকো হালদার এক সময়ে বাবাকে লিখেছিলেন, "স্বয়ং ঠাকুরও কল্পতরু হয়ে মানুষকে সব দিতে পারেননি, কাকাবাবু। দেখুন না বসুমতীর উপেন মুখুজ্যের ফ্যামিলির অবস্থা। অর্থ হয়েছে, কিন্তু অত ধার্মিক হয়ে, অত সাধুসেবার পরেও পরিবারে স্বস্তি মিললো না। সব যেন কেমন নয়ছয় হতে চলেছে।"

ভাবতে ভাবতে নিজেই হেসে ফেললেন ঘনশ্যাম ঘোষাল। বাঙালিরা দুঃখের পরিবেশে মানুষ, তাই অদ্ভুত সব মতবাদ ও বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে বসে আছে।

কতরকম লোকের কথাও মানুষ বিশ্বাস করে বসে আছে—সুন্দরী মেয়ের সুন্দর স্বামী হয় না। ভগবান সুখ দিলে শান্তি কেড়ে নেন। যদি শান্তি চাও তো ভুলেও অর্থ চেও না ভগবানের কাছে, উপেন মুখুজ্যের মতন ফাঁপরে পড়ে যাবে। বেশি দিন বাঁচলেই এই দুনিয়ায় নানা দুঃখ পাবে। আরে বাপু, কেন এসব হবে ? দুনিয়ার কত সুন্দরীর অসামান্য সুন্দর স্বামী হয়েছে তার হিসেব নেই। শুধু সৌন্দর্য না, পৃথিবীর বহু সুখ সুন্দরীরাই উপভোগ করছে। রূপের আলোয় ভুবন আলোকিত করেও তারা মনের আনন্দে সংসারধর্ম পালন করছে, আবার সাফল্যের সঙ্গে সন্তান পালন করছে। কে বলেছে ভগবান এক বিষয়ে পাশ করালে অন্য বিষয়ে ফেল করিয়ে দেবেন ?

ঘনশ্যাম একসময় বিশেষ খবরাখবর রাখতেন না। সরল বিশ্বাসে নানা একপেশে সত্যকে বিশ্বাস করে গিয়েছেন। তারপর অবশ্য

বুঝেছেন, রাম সন্যা বলে লোকটা স্রেফ ব্লাফ দিয়েই চলেছেন, যতো হাসি ততো কান্না। ক্ষমতা থাকলে স্রেফ হাসতে হাসতেই জীবন কেটে যাবে, আর যাদের জীবনে শুধু আঁখিজল তারা কেবল কেঁদেই যাবে। ভগবানের কোনো জমা-খরচের খাতা নেই!

বাবার মৃত্যুর পর অনেক পরিণতবুদ্ধি বা ম্যাচিওর হয়েছেন ঘনশ্যাম ঘোষাল।

বিজনেসে দ্বিতীয় প্রজন্মের মূল সমস্যা হলো পরনির্ভরতা। বাবা-জ্যেঠারা কিছুতেই বিজনেসের স্টিয়ারিং ছাড়বেন না, অথচ তাঁরা চাইবেন বংশধররা র‍্যালি চ্যাম্পিয়ন হোক। গরিবের ছেলের সে অসুবিধে নেই। কিছু থাকলে তবে তো হারাবার ভয়? তাই গরিবের ছেলেরা বিজনেসে কম সময়ে ম্যাচিওর হয়ে ওঠে। সেসময় এই ম্যাচিওর কথাটার বাংলা করতে গিয়েও পারেননি ঘনশ্যাম। পরিপক্ব কথাটা সুবিধের নয়, ওর সঙ্গে পাকামো কথাটা কেমন যেন জড়িয়ে রয়েছে। হুটকো কাছে থাকলে যোগ্য কথাটি জোগাড় করে দিত।

বহু বছর অতিবাহিত হয়েছে। কোনোদিন যে আবার হুটকোর সঙ্গে দেখা হবে সে প্রত্যাশাই ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরের মাথায় কখন যে কি খেয়াল চাপে। এই প্রসঙ্গে আসতেই হবে যথা সময়ে।

ইস্কুলের সুধাংশুবাবুও বলতেন, "কম বয়সে পরিপক্ব হওয়াটা সব সময় ভাল নয়। অকালে পাকলে অকালে ঝরে যাবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে।" বিজনেসে অনেকে একটু বেশি বয়সে ম্যাচিওর হয়, কিন্তু যখন সামর্থ্য আসে তখন হইহই কাণ্ড। জি ডি বিড়লার ছেলেদের দিকে তাকিয়ে দেখো।

হইহই কাণ্ড ঘনশ্যামও যে বাধাবেন তা কারও প্রত্যাশার মধ্যে ছিল না। গুড়ি গুড়ি বয়ের মতন বাবার হাত ধরে কারবারে গিয়েছেন, বাবার অর্ডারে টাকাপয়সার হিসেব রেখেছেন, বাবার অর্ডারে বিয়ে করেছেন, ঘনশ্যামের লাইফে কোথাও আত্মশক্তির কোনো ড্রামা নেই।

কিন্তু বাবা মারা যাবার পরে বিজনেসের স্টাইলই পাল্টে দিলেন ঘনশ্যাম।

উডমন্ট স্ট্রীটে গদি উঠলো, সে জায়গায় বসলো আধুনিক স্টাইলের টেবিল চেয়ার। ঝপ করে একটা লজেন্সের কারখানা কিনে ফেললেন ঘনশ্যাম। গদিতে বসে হাঁটুমুড়ে নোট গোনা ছেড়ে দিলেন ঘনশ্যাম।

বউকে ঘনশ্যাম বললেন, "তোমার কথাই ঠিক পুঁটু। নতুন যুগে নোটগুনে সময় নষ্ট করলে মালিক বিজনেস সম্বন্ধে কখন ভাববে? বস্তাপচা ব্যবস্থা জিইয়ে রেখেই বড়বাজারের সবাই আমরা পিছিয়ে গেলাম—বাঙালি, মাড়ওয়ারি, কালোয়ার, সিন্ধি, গুজরাতি সব। শুধু ইহুদি, পার্সি ও আর্মেনিয়ানরা সময় থাকতে ওখান থেকে কেটে পড়লো। কেউ গেলো বোম্বাই, কেউ হংকং, আবার কেউ কানাডায়।

এই সময়ে ঘনশ্যাম ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ করেছেন উপেন মুখার্জিকে।

ঘনশ্যাম বলেছেন, "আমার সব ভাগ্য। ঠাকুরের প্রিয় নামগুলো ঘুরেফিরি আমার কাছাকাছি এসে যায়, আমাকে ঘিরে থাকতে চায়। উপেন মুখুজ্যে নামটা বড় পবিত্র নাম। বিশ্বজয় করে বিবেকানন্দ যেদিন কলকাতার শিয়ালদহে ফিরলেন তার আগের দিন লোককে স্টেশনে হাজির হবার আহ্বান জানিয়ে এই প্রকাশক ভদ্রলোক সারা কলকাতায় হাজার পঞ্চাশেক পোস্টার লাগিয়েছিলেন। তবে না অত ভিড় হয়েছিল। উপেনের প্রচার না থাকলে সেদিন কী হতো কে জানে।"

হুটকো থাকলে ঘনশ্যামকে মনে করিয়ে দিতেন, ঠাকুরের দাহকালে কাশীপুর ঘাটে বৃষ্টির মধ্যে এই উপেন মুখুজ্যেকে সাপে কামড়িয়েছিল। অনেক চেষ্টায় প্রাণ রক্ষে হয়েছিল ঠাকুরের আশীর্বাদে।

"ঝপ করে কারখানার লাইনে চলে যাবেন স্যার?" উপেন সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিলেন ঘনশ্যামকে।

ঘনশ্যাম উত্তর দিয়েছিলেন, "ভয় পেয়ো না, উপেন। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, কিন্তু এই বাণিজ্য আর বেশিদিন সওদাগরি থাকবে না।

বেচাকেনা, কেনাবেচা করে কখনও মগডালে ওঠা যাবে না, ওখানে বসবে তারা যাদের মগজ আছে এবং কলকারখানা আছে। বাণিজ্য তো পরের ধনে পোদ্দারি—অপরে পণ্য তৈরি করে দিয়েছে এবং অপরে সেই পণ্য ভোগ করবে, তুমি শুধু মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছো মিড্‌লম্যান অথবা হাইফেনের মতন। দু'পক্ষকে কাছে টানা ছাড়া হাইফেনের নিজস্ব কোনও শক্তি নেই।"

ম্যানেজার উপেন মুখুজ্যে তখনও ইয়ং। তবু লজেন্স কারখানা সম্বন্ধে সকলের বেশ দুশ্চিন্তা ছিল।

ঘনশ্যাম হেসেছিলেন। "বুঝেছো উপেন, অনেক ভেবেচিন্তে লজেন্সের লাইনে আসছি। এ-ব্যবসায় মার নেই। প্রতিবছর কয়েক কোটি ছেলেপুলে জন্মাচ্ছে লজেন্সের সংসারে। ওয়ার্ল্ডে চীন ছাড়া আর কোথাও এত ছেলেপুলে নেই। তাদের হাতে দুটো পয়সা এলে তারা লজেন্স কিনবেই। মা-ষষ্ঠীর সমস্ত দয়া এখন আমাদের দেশের ওপর। ব্যাপারটা বুঝে ফয়দা আদায় করে নিতে হবে।"

উপেনের পাল্টা প্রশ্ন শুনে খুব হেসেছিলেন ঘনশ্যাম। "যদি ওদের হাতে পয়সা না আসে ?"

"আসতে বাধ্য, উপেন। মানুষ এত খাটছে তার ফল পাবে না কেমন করে হয় ? আর সংসারে একটু সমৃদ্ধি এলেই ছোটছেলেদের হাতে দুটো পয়সা দিয়ে বাবা-মায়েরা সুখ পাবেন।" অনাগত সুখের দিন সম্পর্কে ঘনশ্যামের নিজের মনে কোন সংশয় নেই। "গরিবরা এবার বাড়তি টুপাইস কামাই করবেই।"

ঘনশ্যামের কথা ফলে গিয়েছিল। এখন একটা নয়, একাধিক বিখ্যাত লজেন্স কলের মালিক হয়েছেন ঘনশ্যাম ঘোষাল। তারপর তিনি বিস্কুট কারখানা বসিয়েছেন পিতৃদেবের নামাঙ্কিত এস বি জি বিস্কুট। পর পর কয়েকটা দোকানও তিনি কিনেছেন। একটা দোকানকে বাড়িয়ে তিনি হোলসেল পরিবেশন বা বণ্টন কোম্পানিতে রূপান্তরিত করেছেন।

ঘনশ্যাম জানেন, বাঙালিদের অনেক কারখানা উঠে যায় কেবল সেল্‌স-এর দিকে নজর দেওয়া হয় না বলে। ডিসট্রিবিউশন বা পরিবেশনা চাই।

"এই তো উপেন, তুমি তো নামকরা সায়েব কোম্পানিতে কাজ করতে। সে কোম্পানি উঠে গেলো কেন ?" জিজ্ঞেস করেছেন ঘনশ্যাম।

"মাল বিক্রি হলো না বলে। কম দামের নকল মালে বাজার ছেয়ে গেলো, সায়েব কোম্পানি কিছু করে উঠতে পারলো না। কারখানা বন্ধ হয়ে রইলো অনেকদিন। আমাকেও না খেয়ে থাকতে হতো, আপনি আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন।"

"আমি বাঁচিয়ে দিইনি, উপেন। তুমি নিজের গুণে, নিজের জোরে এখানে এসেছো। ছোট বিজনেসে আমরা ভাল লোককে আনতে পারি না, কেন জানি না। কর্মীরা বাঙালিদের কাছে কাজ করে তেমন আনন্দ পায় না।"

উপেন বললো, "চিরকাল এমন ছিল না স্যার। স্বাধীনতার সময়ে একটা বাঙালি কোম্পানিতে ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট নাম্বার অব কর্মী ছিল, টাটা-বিড়লারাও বেশ পিছনে পড়ে থাকতো। হাউস অফ মার্টিন-বার্ন। ইস্পাত, বিদ্যুৎ, রেল পরিবহন, কি ছিল না বাঙালিদের ?"

"এসব কথা রাখো। আমি এই নতুন বণ্টন কোম্পানিটা কিনলাম দোকানে দোকানে আমাদের কারখানার তৈরি মালপত্তর ঠিকমতন ঠিক সময়ে পৌঁছে দেবার জন্যে। হোলসেল বাজারের ওপর বুদ্ধিমানরা আজকাল পুরোপুরি নির্ভর করতে চায় না। তোমার অবস্থা নরম বুঝলেই পাইকার দোকানদার দাম কমাবার জন্যে চাপ দেবে। ওর কথায় নরম হয়ে একবার দাম কমিয়েছে তো মরেছো। আবার দাম কমাবার চাপ আসবে। চাপ খেতে খেতে তুমি চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে মারা যাবে। বিজনেসে কেউ তোমার জন্যে দুঃখু করবে না, বাড়িতে দুঃখ করবে কেবল তোমার বউ আর শ্বশুর-শাশুড়ি।"



পুরনো দিনের সেই ঘনশ্যাম, যাকে হুটকো হালদার অনেকদিন আগে হাওড়া গোপাল মণ্ডল লেনে দেখে গিয়েছিলেন তিনি আর নেই। মোদ্দা কথায় তিনি এখন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। কলকাতার মাড়োয়ারিরা যেমন পাল্টেছে তেমন ঘনশ্যামও সময়ের সঙ্গে এবং দেশের সমৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে পাল্টাবার চেষ্টা করেছেন।

ঘনশ্যাম হেসেছেন। বিজনেসের ধারাবাহিকতা বুঝতে অবশ্য তাঁর কিছুটা সময় লেগেছে।

ঘনশ্যাম প্রথমে ভাবতেন, বাবার সঙ্গে গদিতে যাওয়া আর তাঁর নির্দেশ মেনে কাজ করাটাই বিজনেস। প্রথমে ধারণা ছিল, বিজনেস তার নিজের অমোঘ শক্তিতেই চলে। আলু, পিঁয়াজ, সিমেন্ট, রঙ যা নিয়ে তুমি আছো তাতেই আরও জড়িয়ে পড়ে থাকো। বিশেষ কিছু করতে হবে না তোমাকে, টাকা এমনিই আসবে। তোমার কাজ শুধু নজর রাখা কর্মচারীর ওপর। কারণ চোর ঘুরে বেড়াচ্ছে কাছাকাছি। তুমি দেখবে তোমাকে জাল নোট গছিয়ে দিয়ে না চলে যায়। যে লোক নোটের বাণ্ডিল গুনতে জানে না সে বিজনেসের এ বি সিও জানে না, এক্স-ওয়াই-জেডও তার আয়ত্তে আসবে না।

বিজনেস সম্বন্ধে সে যুগে ঘনশ্যাম নিজস্ব একটা ধারণা করে

নিয়েছিলেন। কলকাতায় প্রথম ছিল সায়েবদের একাধিপত্য। কারও সেখানে নাক গলানোর উপায় ছিল না। গায়ের জোরে এবং আইনের সমর্থনে সায়েবরা সেই সুযোগ নিয়েছিলেন। প্রথম যুগে মাড়োয়ারিরা তাই কেবল দালালি করেই চালিয়েছেন। তারপর এসেছে মুচ্ছূদ্দি হওয়ার পালা। তোমার বিজনেস, কিন্তু আমার রিস্ক বা ঝুঁকি। এইভাবে বেনিয়ানগিরি করে জাত ব্যবসায়ীর মন ভরে না।

ক্রমশ হোলসেলের দিকে মন গিয়েছে। পাইকিরি ব্যবসায় কয়েক প্রজন্ম কাটিয়ে বড়বাজারের ব্যবসায়ী একসময় বুঝেছে এতেও তেমন সুখ নেই। আসল রাজা সে তৈরি করে যে। সুতরাং চলো কারখানায়। এর পরেও যে মস্ত একটা অধ্যায় আছে তা ঘনশ্যাম সে যুগে ভালভাবে বোঝেননি। বোঝবার প্রয়োজনও হয়নি।

ঘোষাল বাড়িতেও এসেছে অভাবনীয় সমৃদ্ধি। বসতবাটিতে সিমেন্ট ভেঙে অনেক জায়গায় শ্বেতপাথর বসেছে। বাইরে লাগানো হয়েছে জয়পুরের স্টোন। পথের ধারে বসেছে বিশাল ইস্পাত গেট। দু'খানা মোটরগাড়ি এক সঙ্গে বেরুলেও কোনো কষ্ট নেই।

হ্যাঁ, ঘনশ্যামের খান সাতেক মোটর গাড়ি আছে। তার জন্যে আট ন'জন ড্রাইভারও আছে। কিন্তু এর মধ্যে আর বিলাসিতার গন্ধ পান না ঘনশ্যাম। তিনি আগে ভাবতেন, প্লেন লিভিং অ্যান্ড হাই থিংকিংই সংসারের সেরা মন্ত্র। নতুন নতুন শিল্পপতি বন্ধুদের সঙ্গে চেম্বার অফিসে পরিচয় হয়েছে। তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মতামত পাল্টে ফেলেছেন ঘনশ্যাম। ভোগ মানুষকে শূন্য করে না, কখনও কখনও আরও উপার্জনের পথে টেনে নিয়ে যায়।

থাকবো পাতকুয়োয় আর স্বপ্ন দেখবো পর্বতের চূড়া থেকে তা এই পৃথিবীতে কখনই সম্ভব হয় না। হাই থিংকিং-এর জন্যেই হাই লিভিং প্রয়োজন। ভোগ কাকে বলে যদি তুমি নিজেই না জানলে তা হলে তুমি অন্যের ভোগের সামগ্রী তৈরি করবে কী করে? অমন যে অমন ঠাকুর

শ্রীরামকৃষ্ণ, তিনিও আট আনার সিটে থিয়েটার দেখতে চাইতেন না। কম পয়সার হাজার হাঙ্গামা। এক টাকার টিকিটের সঙ্গে আট আনার টিকিটের তফাত থাকবেই।

কে যেন সেদিন লিখেছিন, ভোগের একটা সীমা রেখা থাকা উচিত দরিদ্র এই দেশে।

পড়ে বেজায় বিরক্ত হলেন ঘনশ্যাম। একদম বাজে কথা। বিলাস কাকে বলে মানুষ তাই এখনও স্থির করতে পারলো না।

এই তো সেদিন পর্যন্ত, স্বামীজি তখন বেলুড়ে এসে গিয়েছেন, টানা পাঙখা ছিল বড়লোকদের বিলাসিতার নিদর্শন। আর ইলেকট্রিক কোম্পানি কলকাতায় বিদ্যুৎ এনে কী বিপ্লব ঘটিয়ে দিল। এখন বস্তিবাসী গরিবের ছেলেও রাতে ফ্যান বন্ধ হলে বিরক্তিতে কেঁদে ওঠে।

তা হলে বিলাসিতার ডেফিনিশন কী ? সিনেমা হলে এয়ারকন্ডিশন বন্ধ হলে সবচেয়ে সস্তাদরের সিটেই হৈ-চৈ ওঠে সব চেয়ে আগে। তা হলে প্রয়োজন ও বিলাসের সীমারেখাটা কোথায় ?

এই সেদিনও হাওড়ার অসংখ্য লোক নিত্য পায়ে হেঁটে ফেয়ারলি প্লেস যেতেন কেরানিগিরি করতে অথবা বেয়ারার চাকরি করতে। এখন ওপাড়ার ভিখিরিও বাস থেকে বি বি ডি বাগে নামে, প্রয়োজনে মিনিবাসকে হাত দেখায়, যাতে সময় নষ্ট না হয়। এই বাস, এই সিলিং ফ্যান, এই এয়ারকন্ডিশন যন্ত্র, এই মিল্ক ব্রেড, এই লজেন্স, এই বিস্কুট এসবই তো আকবর বাদশার কাছেও চরম বিলাসিতা ছিল। কিন্তু এখন ?

নিবৃত্তির শুরু এবং প্রবৃত্তির শেষ কোথায় ? স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বেঁচে থাকলে এর উত্তর দিতে পারতেন না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিনের পর দিন তার উদ্ভাবনী শক্তিতে মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে।

উপেনের তবু ভয় যায় না। সে জিজ্ঞেস করেছে "এতো হওয়ার পরে আমার ফ্যান কারখানায় লক্-আউট হয়েছিল কেন স্যার ? আমরা ছ'মাস মাইনে পাইনি। শেষে চাকরি ছেড়ে আপনার এখানে কাজ নিয়েছি।"

ঘনশ্যাম ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন। "উপেন, তুমি বলতে চাইছো, খরিদ্দারের মধ্যে কৃতজ্ঞতা নেই, লয়ালটি নেই ? ব্যাপারটা বোধ হয় নির্মম সত্য। কেনাবেচার সম্পর্কটা কোনোক্রমেই ভালবাসার সম্পর্ক নয়। সামাজিক লেনদেনটা হাটেবাজারের সম্পর্ক। ভালবাসার সম্পর্কটা হয় পরিবারে এবং সমাজে। কিন্তু বাজারটা হলো এক ধরনের রণক্ষেত্র। আগে রণাঙ্গনে কামান বন্দুক সৈন্যসামন্ত থাকতো, রক্তপাত হতো, আর এখন বাজারের যুদ্ধক্ষেত্রে সাজানো থাকে প্রাইস লিস্ট, শোকেস, ফ্রি স্যামপ্লিং, ক্রেডিট এটসেটরা। রক্তক্ষয় হয় না, কিন্তু লোকসান হয়, প্রচুর অর্থব্যয় হয়। পরাজিতদের কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়, লোকে কর্মহীন হয়। বিশ্বের বিজয়ীরা আজকাল এই জয়েই সন্তুষ্ট।"

মন দিয়ে শোনে উপেন। ছেলেটির এই দিকটা ভাল লাগে ঘনশ্যামের। জানবার এবং বুঝবার আগ্রহ ভীষণ।

সে জিজ্ঞেস করে, "বিজনেসে যুগ তা হলে ঘন ঘন পাল্টাচ্ছে, স্যর। কতদিন অন্তর যুগ পাল্টায় ?"

"তা যদি কেউ জানতো, উপেন। কখনও সারাজীবনেও যুগ পাল্টায় না, আবার কখনও পটাপট পাল্টাচ্ছে সময়। তুমি হয়তো চেষ্টা করলে সময়কে আঁকড়ে ধরে থাকতে, কিন্তু পাল্টানোর হাওয়া অপ্রত্যাশিত ভাবে হাজির হলো বোম্বাই থেকে। সময় আগে পুব থেকে পশ্চিমে যেতো কিন্তু বিজনেসে প্রায়ই এখন উল্টো হাওয়া বইছে উপেন। সময় পরিবর্তনের জন্যে বিশেষ নজর ওই পশ্চিম দিকেই রাখতে হচ্ছে।"

ঘনশ্যামের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। পার্থিব ভোগে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। ভগবান যখন ভালবেসে দিয়েছেন তখন প্রসাদ নাও। ভোগ কথাটা তো পৃথিবীর কোনো মন্দিরে অপবিত্র নয়। বলবে, সে তো দেবতার ভোগ। আরে বাপু, ভগবানও বুঝছেন, শুধু মন্দিরে বন্দি থেকে কোনো লাভ নেই, তাই মানুষের মধ্যেও তিনি বসবাস শুরু করেছেন। একথা আমাদের ঠাকুরই সোজা কথায় সবার আগে সংসারে ঘোষণা করে গেছেন।

ঘনশ্যাম ব্যাপারটা আরও তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবান বসবাস করলে মস্ত সুবিধে। রেষারেষি টানাটানি অনেক কমে যাবে। ভগবান তো আর বোকার মতন নিজের সঙ্গেই লড়াই করবেন না। লড়াই না থাকলে বিজনেসের সুবিধা হবে। বিপণনের জগতে এই যে কম্পিটিশন বলে একটা হাওয়া আসেছ, এটা ভাবিয়ে তোলে, ভীষণ ভাবিয়ে তোলে ঘনশ্যামকে।

খরিদ্দারের মধ্যে দেবতা রয়েছেন। সুতরাং খরিদ্দারকে খারাপ বলবেন না ঘনশ্যাম।

এতো বছর ধরে তো খরিদ্দারের সঙ্গে নিত্য ঘর করছেন তিনি। খরিদ্দারের হাড়হদ্দ এখনও না বুঝলে ব্যবসাদারের বাড়িতে ঘনশ্যামের জন্মটাই বৃথা। চেষ্টা করে, তার ভাবগতিক দেখে, পুজো দিয়ে, তুমি অ্যাজ এ বিজনেসম্যান, অ্যাজ এ শিল্পপতি তোমার খরিদ্দারকে শান্ত করলে। তিনি তোমার সেবায় এবং পূজায় প্রসন্ন হলেন। তাঁর হৃদয় নেই এ কথা বলবেন না ঘনশ্যাম। যদিও বাবার বন্ধু ট্যাংরা চাটুজ্যে রসিকতা করতেন, "খুব সাবধান সুখবিলাস। ইংরিজিতে ওঁর নাম কাস্টমার, আদি সংস্কৃত কথাটা নিশ্চয় কাষ্ঠমার! চেলা কাঠ দিয়ে খরিদ্দার তোমাকে পিটুনি দেবে পান থেকে চুন খসলে।"

এতদিনের অভিজ্ঞতায় ঘনশ্যাম বুঝছেন, পান থেকে চুন না খসলেও খরিদ্দার বেঁকে বসতে পারেন, যদি অন্য কেউ আদর করে তাঁর চুনের ওপর টাটকা গোলা খয়ের লাগিয়ে দেয়। খরিদ্দার নিজে কখনও নষ্ট হন না। তাঁকে ইচ্ছে করে নষ্ট করা হয়। এবং তাঁকে নষ্ট করে অন্য ব্যবসায়ীরা, যারা প্রতিযোগিতায় নেমে তোমার পাতের রাজভোগটি নিজের পাতে তুলে নিতে উদগ্রীব। ব্যাপারটা ঘটবে তোমারই চোখের সামনে। অথচ তোমার কিছু করার থাকবে না।

সাতসকালে, বিজনেসের এই প্রতিযোগিতার কথা ভেবে মনটা একটু তেতো হয়ে গেলো খ্যাতনামা বিজনেসম্যান ঘনশ্যাম ঘোষালের।

সফল ব্যবসায়ী ঘনশ্যামের জীবন এখন ছকে বাঁধা। পিতৃস্মরণে বাড়ির নতুন নাম করেছেন সুখভিলা। বিলাসকে ভিলায় পরিবর্তিত করার কৃতিত্ব তাঁর নয়, তাঁর পুত্র অশোকের। অল্পবয়সেই বাংলায় তার সৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। যদিও অশোক ইংরিজিতে অনার্স পড়েছে। এবার সে ইংরিজিতে এম এ পড়ার উৎসাহ দেখিয়েছে।

চিন্তিত হয়েছে পড়েছেন ঘনশ্যাম। মডার্ন বিজনেসটা ইংরিজি সাহিত্য নয়। সেক্সপীয়র, শেলি, কীটসের কোনো স্থান নেই কলকাতার উডমন্ট স্ট্রিটে। ইংরিজি অথবা বাংলায় এম এ পাশ করলে এ দেশে অবস্থাপন্ন ছেলেদের আবার প্রোফেসর হবার সাধ জাগে। প্রোফেসর হলে দৈনন্দিন জীবনযাপনের সুখ অনেক বেশি—সেক্সপীয়র, শেলি, কীটস এঁদের তো কমপিটিটর নেই। ক্লাসিক হয়ে সমস্ত সমালোচনার ঊর্ধ্বে বসে আছেন তাঁরা। সুতরাং বহুকাল আগে মরবার আগে ওঁরা কী লিখে গিয়েছেন তা মোটামুটি জানা থাকলেই ছাত্র হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে যথেষ্ট।

আরও এক মস্ত সুবিধে, যে তোমার কাছে টিউশন ফি দিয়ে বিদ্যে কিনতে এসেছে সেই তোমাকে পেন্নাম ঠুকছে। অর্থাৎ এই আজব লাইনে খরিদ্দার তোমার প্রভু নয়, বরং তোমার ভয়ে সে থরহরি কম্পমান, কারণ বিরক্ত হলে তুমি শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে পরীক্ষায় তাকে সহজেই ফেল করিয়ে দিতে পারো। একবার যে কলেজের প্রফেসর কিংবা ইস্কুলের স্যর হয়েছে সে কখনও বিজনেসে সুখ পাবে না। ঘনশ্যামের মনে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না।

আনন্দের কথা, শেষপর্যন্ত মত পাল্টেছে অশোক ঘোষাল। ইংরিজি ক্লাসের বদলে সে গিয়েছে ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণের তীর্থস্থান আই আই এম আমেদাবাদে।

খুব ভোরবেলাতেই উঠে পড়েন ঘনশ্যাম। বেলুড়মঠে ওই সময় আরতি হয়, তারপর সাধুদের জপতপ।

জপতপের বদলে ঘনশ্যাম এইসময় তাঁর নিজস্ব জপ শুরু করেন।

বিজনেসের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। বিজনেস যদি দেবতা হন তা হলে তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করেন ঘনশ্যাম চোখ বুজে।

এই এক আশ্চর্য ব্যাপার, চোখ বুজলে মানুষ অনেক বেশি দেখতে পায়। চোখ খুলে রেখে আর বিশ্বসংসারের কতটুকু দেখা যায় ? চোখ বন্ধ করে, জপতপের প্রথায় ঘনশ্যাম কল্পনা করতে থাকেন, তাঁর কপালের কেন্দ্রস্থলে আরও একটি চোখ রয়েছে। শারীরিক চোখ দুটি বন্ধ হওয়া মাত্রই তৃতীয় এই চোখটি ধীরে ধীরে খুলে যায়, কী আশ্চর্য!

তখন ঘনশ্যাম ভবিষ্যৎকে অস্পষ্টভাবে দেখতে শুরু করেন। যা এখনও অনাগত তাকেই যদি আগাম দেখা না গেলো তা হলে বিজনেসে সাফল্য আসবে কী করে ?

এই অবস্থায় এক এক সময় ঘনশ্যামের মনে হয় পৃথিবীতে বিজনেস ছাড়া কোনো বৃত্তি আজও মানুষ আবিষ্কার করতে পারেনি। পূজা, গবেষণা, মাস্টারি, চাকরি, কৃষিকাজ সবই এক এক ধরনের বিজনেস। এই পৃথিবীতে সংসারের গৃহিণীরাও বিজনেস করছেন, হাউস কিপিং-এর বিজনেস অথবা হোম মেকিং। পেশা বলে আলাদা কিছু নেই, সবই বিজনেসের নিয়মে বাঁধা।

এই সব নিয়ে কতো অবাস্তব চিন্তা আসে এই ভোরবেলায়। ঘনশ্যাম বুঝতে পারেন, মানুষ ভোগের দাস হয়ে পড়লেও তাকে অবহেলা করার উপায় নেই ব্যবসায়ীর। কারণ এই দাসই খরিদ্দার সেজে একটু পরে হাজির হবে উডমন্ট স্ট্রিটের অফিসে। সেই দাস মানুষটিই তখন ঘনশ্যামের সর্বেশ্বর। এঁকে যেন তেন প্রকারেণ সন্তুষ্ট রাখতেই হবে। বড় জটিল সেই অঙ্ক। সাধে কি আর দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর সাবধান করে দিয়েছেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দেবতা আছেন। শিবজ্ঞানে জীবকে পুজো শুধু গেরুয়াপরা সন্ন্যাসীর স্বপ্ন নয়, বড়বাজারের প্রত্যেকটি ব্যবসাদারও একই মন্ত্র নিয়েছেন, হয়তো নিজের অজান্তে।

সকালবেলায় নির্জন চিন্তার সময় সামনে একটা ডাইরি-বই রাখেন ঘনশ্যাম। নতুন কোনো ভাবনা এলেই দু'এক কথায় তা লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

ইচ্ছে হয়, ওই সময়েই কিছু টেলিফোন সেরে ফেলার। কিন্তু তাঁর ফ্যাক্টরির ম্যানেজারগুলো ঘুমকাতুরে। ভোরবেলাটা তাদের কাছে মাঝরাত। দু'একবার ঘুম থেকে ওদের টেনে তুলিয়েছেন ঘনশ্যাম। কিন্তু ফল ভাল হয় নি।

ঘনশ্যাম দেখেছেন, মানুষকে কাঁচা ঘুম থেকে তোলালে তার বুদ্ধি অথবা স্মৃতি কোনোটাই তেমন কাজ করে না। তবে একটা কায়দা শিখেছেন তিনি—বিড়লা বাড়ি থেকে। যত দেরিই হোক, প্রতিদিন প্রত্যেক কারখানার উৎপাদন ফিগার কর্তাদের কাছে পাঠাতেই হবে। প্রোডাকশন অকারণে কমলে রক্ষে নেই, ওই ভোরবেলায় কাঁচাঘুম থেকে তুলে তখন তিরস্কার করাটা ভাল, তা হলে অফিসাররা বুঝতে পারেন কর্তার চোখে কেন ঘুম নেই?

ঘনশ্যাম শুনেছেন, অনেক শিল্পপতির কাছে প্রোডাকশনই সব। তার থেকেই একটা পড়তা আন্দাজ করে নিতে শিখেছেন ঘনশ্যাম নিজেও, লাভলোকসানের হাওয়া কোনদিকে বইছে তা বুঝতে দেরি হয় না।

এবার কিছু ফাইল নিয়ে ঘনশ্যাম ঘোষাল তাঁর টয়লেটে ঢুকে পড়লেন। চুপি চুপি একটা ছোট্ট টেবিল রেখেছেন কমোডের সামনে। সকালবেলার শারীরিক কাজগুলো সারতে আজকাল দেরি হয় বেশ। ব্যস্ততা প্রকাশ করেও লাভ হয় না, শরীরটা সঙ্গে সঙ্গে কেমন দরকচা মেরে যায়। কোনোরকম সহযোগিতার লক্ষণ দেখায় না মালিকের সঙ্গে। এর জন্যে অবশ্য মনে কষ্ট হয় না ঘনশ্যামের, কারণ পৃথিবীর নামকরা লোকেরা কনস্টিপেশনের ভিকটিম। অমন যে অমন ঠাকুর তিনি নিজেই বলেছেন, 'বাহ্যে' যাবার অসুবিধের জন্যে তিনি দক্ষিণেশ্বর ছেড়েছিলেন। পড়ে দেখো তাঁর জীবনসন্ধ্যার ধারাবিবরণী।



ইদানীং একজন দক্ষিণী সেক্রেটারি রেখেছেন ঘনশ্যাম। এরা দীর্ঘসময় ধরে কাজ করতে কখনও অরাজি নয়। একান্ত সচিবকে কাছাকাছি একটা বাড়ি খুঁজে দিয়েছেন ঘনশ্যাম।

খুব ভোরবেলায় চলে আসে মেনন। বাড়তি কোনো কাগজপত্তর থাকলে দরজার তলার ফাঁক দিয়ে মেনন সেগুলো টয়লেটে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর শর্টহ্যান্ডের খাতা নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে টয়লেট দরজার সামনে অপেক্ষা করে থাকে। ঘনশ্যামকে কখনও ডিসটার্ব করে না।

ঘনশ্যাম প্রায়ই কমোডে বসা অবস্থায় একটু চাপা গলায় ডিকটেশন দেন। মেনন নিপুণভাবে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ঘনশ্যামের বক্তব্য লিখে নেয়। এইভাবে সময়ের অপচয় হয় না। আর কনস্টিপেশন নিয়ে ইদানীং ঘনশ্যামের তেমন দুঃখ নেই। কলকাতার একজন নামকরা ডাক্তার চুপি চুপি তাঁকে বলেছেন, যত ক্রিয়েটিভ জাত তত কন্‌স্টিপেশন। ফরাসি দেশে কোটিপতি হবার সবচেয়ে সহজ উপায় ইসবগুলের ভুষি প্যাকেটে বিক্রি করা। কোষ্ঠকাঠিন্য বিরোধী দই আবিষ্কার করে ফরাসি ময়রা এখন কোটি কোটি ফ্রাঁ বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে।

টয়লেটে বসেই প্রভাতী সংবাদপত্রগুলি ঝটপট পড়ে নেন ঘনশ্যাম। সেই সময় ছোট্ট একটি কাঁচি ব্যবহার করেন। দরকারি বিজ্ঞাপন এবং

খবরগুলো কচকচ করে কেটে নেন ফলো-আপের জন্যে।

তারপর কাটা খবরের কাগজগুলো দরজার তলার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে ঠেলে দেন ঘনশ্যাম সেক্রেটারি সেললের উদ্দ্যেস।

টয়লেট থেকে না বেরিয়ে যথাসময়ে তেল মেখে স্নানটা সেরে নেন ঘনশ্যাম। প্রাতঃস্নানে বিশ্বাস করতেন ঠাকুর্দা ও পিতৃদেব। বংশধারাটা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন ঘনশ্যাম। তবে পরবর্তী প্রজন্মে প্রাতঃস্নানের কোনো ভূমিকা থাকছে না, এইটিই শেষ পর্ব। পুত্রটির দেরি করে ওঠার ধাত। তারপর তার চায়ের পাট। স্নান সারতে প্রায়ই বিকেলবেলা।

সমালোচনা করার উপায় নেই। বিভাবতী পুত্রের পক্ষে ব্রিফ নিয়ে রণরঙ্গিনী হয়ে এগিয়ে আসেন স্বামীর সঙ্গে তর্ক করতে। "কোথায় লেখা আছে প্রাতঃস্নান অবশ্যই করতে হবে?"

স্ত্রীকে ঘনশ্যাম বলেছেন, "পুঁটু, এই ভোরবেলাটা প্রাচীন ভারতে খুব কদর পেতো। নিশ্চয় ঊষাকাল এবং প্রভাতের মধ্যে গভীর কোনো তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষরা।"

পুঁটু আজকাল অনেক সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে। ছেলের মাধ্যমে বিশ্বের সঙ্গে তার যোগাযোগ অনেক নিবিড় হয়েছে।

পুঁটু বলেছে, "খোকা বলছিল,'প্রাচীন ভারতে ইলেকট্রিক ছিল না, সূর্য ডুবলে রেড়ির তেলের প্রদীপ ভরসা। তাই সূর্যালোকের সদ্ব্যবহারের জন্যে মুনিঋষিদের মধ্যে এতো তৎপরতা।"

বউয়ের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ বাধাতে একমাত্র অর্বাচীন ব্যক্তিরাই সাহস দেখান। ঘনশ্যাম কিছুতেই ওলাইনে যাবেন না। তিনি শান্তভাবে স্নান সেরে নেন। তারপর সামান্য একটু ফল খেয়ে বেরিয়ে পড়েন অফিসের উদ্দেশে।

ভোরবেলায় এই সময় রাস্তার ভিড় কম থাকে। অফিসপাড়ায় যখন ঘনশ্যাম উপস্থিত হন তখন সেখানে জনমানব নেই।

মালিকের সঙ্গে অফিসে পৌঁছে মেনন নিজের চেয়ারে বসে পড়ে। আর ঘনশ্যাম তাঁর এয়ারকন্ডিশন কিউবিকলে জুতো খুলে, হাতে একটু

গঙ্গাজল লাগিয়ে ঠাকুরকে নমস্কার করেন। এই সেই ঠাকুর যিনি মরদেহ ধারণ করে এই সেদিনও কলকাতা শহর চষে বেড়াতেন। নাচতেন, গাইতেন, কীর্তন করতেন, পালা দেখতেন এবং ভক্তকে সুখী করতেন। তখনও লোকে তাঁকে পরমহংসমশাই বলতো। বাবু বা গুরুদেব কথাগুলো তাঁর নিতান্ত অপছন্দ ছিল। এমন লীলা করতে এলেন তিনি যে মানুষের সব দুঃখ নিজের অঙ্গে ধারণ করলেন সাধারণ মানুষের মতোই।

অফিসঘরের এই ছবিটা বন্ধুবর হুটকো হালদার কল্পতরু উৎসবের সময় কাশীপুর থেকে কিনে এনেছিল। অদ্ভুত মানুষ এই হুটকো, নিজের জন্যে কখনও কিছুই চাইলো না, কল্পতরুর দিনে শুধু বন্ধুর জন্যে প্রার্থনা করে এলো।

ছবিখানা দিয়ে হুটকো সেবার ঘনশ্যামকে বলেছিলেন, "হাতের গোড়ায় রইলেন, যখন যা ইচ্ছে চেয়ে নিও। আমি বলেছি, ঠাকুরকে, অনেকদিন হাওড়ায় কোনো গৌরব দাওনি। আলামোহন দাস হাউইয়ের মতন আকাশে উঠেও তেমন কিছু করে উঠতে পারলেন না। বটকৃষ্ণ পাল, দ্বারিক ঘোষ হাওড়া ছেড়েছে। এখন আমার বন্ধুরাই ভরসা।"

পরে ঘনশ্যাম খবর পেয়েছিলেন, হুটকো বিপজ্জনক কাজ করেছেন। একখানার বদলে দু'খানা ছবি কিনেছেন। আর একখানা দিয়েছেন বন্ধুবর সনাতন সান্যালকে।

একটু অস্বস্তি বোধ করছেন ঘনশ্যাম। কিন্তু হুটকোকে কিছু বলতে পারেননি। প্রশ্নটা সাদামাঠা। হুটকো একইসঙ্গে ক'জনকে টঙে তুলতে চায়? পাহাড়ের চূড়োয় তো বেশি জায়গা থাকে না, সেখানে পতাকা হাতে কোনোরকমে একটা লোকের দাঁড়াবার সুযোগ হতে পারে।

কিন্তু হুটকোকে এখন এসব বলে লাভ নেই। তার ধারণা নিশ্চয় হিমালয়ের মাথাটা ফুটবল খেলার মাঠ! যতো খুশি লোক সেখানে দাঁড়াতে পারে এবং ভগবানের খেলা দেখতে পারে!

অফিসঘরে নতমস্তকে ঠাকুরকে নমস্কার করলেন ঘনশ্যাম অনেকক্ষণ ধরে। ইদানীং ঠাকুর সম্পর্কে একটু অভিমান হয়েছে ঘনশ্যামের। বড় বেশি ভালো মানুষ। এতো ভাল হলে চলে না। যে যা পারে ঠাকুরের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তিনি কাউকে কখনও না বলতে পারেন না।

অশোক শুনলে এইসব কথা বিশ্বাস করবে না। বিরক্ত হয়ে বলবে, "পুরনো ভাবনা ছাড়ো, বাবা। তুমি কি ভাবো, ১৮৮৬ সালে দেহ রেখে পরমহংসদেব এখনও ভক্তকে, শরণাগতকে টাকাকড়ি, সুখসুবিধে পাইয়ে দিচ্ছেন ?"

ছেলের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। অশোকের পছন্দ বিবেকানন্দকে, যদিও ঠাকুরের এক একখানা নখ থেকে একশ'টা করে বিবেকানন্দ বেরুতে পারতো। ছোকরাদের পক্ষে অবশ্য বিবেকানন্দকে বোঝা অনেক সহজ। আসলে স্বামীজীর বেশিরভাগ লেখাই তো সায়েবদের জন্যে, তাই সাহেবি মনোভাবাপন্ন এদেশের ছেলেমেয়েরা সহজেই ওঁকে বুঝতে পারে। ওদের কাছে ঠাকুরের ভাবভঙ্গি একটু অলৌকিক।

ঘনশ্যাম সুযোগ বুঝে ছেলেকে বলেছেন, "ঠাকুর কি আর ছবির মধ্য থেকে হাত বার করে প্রত্যেক মানুষকে ধনদৌলত দিচ্ছেন ! তাঁর ছায়া অনেক কায়াকে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। ছবির সামনে প্রার্থনা জানিয়ে কোনো কোনো লোক অসীম মনোবল পাচ্ছে। তুমি একবার সনাতন সান্যালের কথা ভেবে দেখো। সনাতন আমার সঙ্গে ইস্কুলে পড়তো। আমি ওর হাঁড়ির খবর জানি। ওর বাবা তো ইস্টবেঙ্গল থেকে নিঃস্ব অবস্থায় এসে হাওড়া কোর্টে অর্ডিনারি ওকালতি করতেন। আমি নবকুমার নন্দী লেনে ওদের আদি বাড়িতে গিয়েছি। সনাতনের বাবার অবশ্য এনার্জি ছিল। আদালত থেকে বেরিয়ে তিনি ছোটখাট সাইড বিজনেস করতেন। বাঙালিরা অবশ্য সে যুগে ওসব তেমন জানতো না। গরিব গুজরাতিরাই কেবল একাধিক ধান্দায় ব্যস্ত থাকতো, তারপর অনেক টাকা হলে ধান্দার সংখ্যা কমিয়ে একটা ধান্দায় মন দিতো। সনাতনের বাবাকে পাড়ায় সবাই বাঙাল সান্যাল বলে ডাকতো, তিনি

মনে কিছু করতেন না। তারপর সনাতন...না সব কথা বলে লাভ নেই।”

অশোক তখন সান্যালের ব্যাপারে অতো উৎসাহ প্রকাশ করেনি। সে ধরে নিল ভদ্রলোক হয়তো কোনো অন্যায় করতে গিয়েছিলেন যা এপক্ষের মনঃপূত হয়নি।

ঘনশ্যাম ভাবলেন, বামন হয়ে চাঁদ ধরতে যাওয়াটা তো ঠিক নয়, দুঃসাহস। ব্যাপারটা অন্যায় কি না তার বিচার কে করবে ? পারিবারিক সেসব কথা যথাসময়ে পুত্রকে বলা যাবে।

কিন্তু সেই সনাতন সান্যালের জীবনে সাফল্য এসেছে। ঠাকুরের এই ছবির ডুপ্লিকেটের কাছে প্রার্থনা করে সে অনেক পেয়ে গিয়েছে। ওই একই ব্যাপার। প্রার্থনার শক্তিতে ছবি থেকে টাকার সুটকেস বেরিয়ে আসেনি ; কিন্তু ভক্তের ব্যাটারির ঠাকুর এমনভাবে চার্জড করে দিয়েছেন যে, সে মহাশক্তিধর হয়ে টগবগ করে ছুটতে শুরু করেছে। এইভাবে ছুটতে পারলে দৌড়ে কে হারবে ?

ঠাকুরের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে ঘনশ্যাম বললেন, অসীম তোমার শক্তি, ঠাকুর। অসীম তোমার করুণা। যত দিন যাচ্ছে এই দুনিয়ায় ততো তোমার প্রতিপত্তি বাড়ছে, ঠাকুর। সমস্ত দুনিয়া তোমাকে বিশ্বাস করবার জন্যে এখন তৈরি হয়ে আছে। দেবদেবীদের কাছে চাইতে আজকাল মানুষের দ্বিধা হয়, ভয় হয় সত্যিই সব আবেদন-নিবেদন ওঁদের কানে পৌঁছবে কি না। কিন্তু তুমি তো আমাদের আপনজন, প্রভু। চাওয়ামাত্রই তুমি দাও। বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো মানুষ থেকে শুরু করে রাজপুত্তুর পর্যন্ত সবাই তোমার ওপর নির্ভর করে বসে আছে। শুধু পয়সা নয়, যার যা খুশি চাইছে তোমার কাছ থেকে, আর তুমি হাসতে হাসতে দিচ্ছো, দিতে দিতে হাসছো।”

এই তো সেবার ছোট ট্যাংরা চাটুজ্যে ঘনশ্যামের আপিসে এলেন। হঠাৎ কী ভেবে বললেন, “হ্যাদা, একটুখানি ঘরের বাইরে যাবে ? আমি কত্তার সঙ্গে নিরিবিলিতে একটু কথা বলবো। ছবি দেখেই বুঝতে পারছি উনি এখানে রয়েছেন।”

"উনি আছেন কি না জানি না, কিন্তু ওঁর স্মৃতি, ওঁর প্রতি ভক্তি এসব এখানে রয়েছে। এ তো কল্পনা নয়, ঠাকুরের শ্রীশরীরের ফটো, যার বাংলা নাম ছায়াছবি—স্থির চিত্র।"

ট্যাংরা বাবু সেদিন কিছু বললেন না ঘনশ্যামকে। চুপি চুপি ছবির সঙ্গে যখন কথা বললেন, তখন কেউ কাছাকাছি রইলো না। কিন্তু পরের মাসে তিনি আবার এলেন। উত্তেজিতভাবে বললেন, "হ্যাদা, অসম্ভব সম্ভব হয়েছে! আমার মদের নেশা এবার আয়ত্তে এসে গিয়েছে। আমি জানতাম না উনি মাতালদেরও দেবতা। বহু ডিরেল্‌ড মাতালকে তিনি আবার লাইনে বসিয়ে দিয়েছেন।"

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ঘনশ্যাম। ট্যাংরা চাটুজ্যে বললেন, "সত্যদ্রষ্টা পুরুষ, এখনও কাউকে না বলেন না। মাতালকেও ঠাকুর মদ খেতে বারণ করতেন না। শুধু বলতেন, খাবে, তবে মাথা কিংবা পা টলমল করবে না।"

"ঘনশ্যাম তুমি তো চিরকাল অতিমাত্রায় সাবধানী রয়ে গেলে, ভুলেও কোনোদিন মাল খেলে না। কিন্তু বুঝলে ব্যাপারটা ? আমাদের ঠাকুর মাতালকে একেবারে গোড়ায় মেরে দিলেন। টলমলে অবস্থায় কোথাও যাবো না ভাবলেই, নিজে থেকেই ড্রিংক করবার ইচ্ছেটা কমে যায়। গদাধরের ফাঁদে যে পড়লো তার কপালে অনেক দুঃখু ঘনশ্যাম। কোনো অন্যায়, কোনো নির্লজ্জ ভোগসুখ তার সহ্য হবে না। সুঁড়ির দোকানে ভিড় জমিয়ে মাল খাওয়া ছাড়ো, তার বদলে কুলফি বরফ ধরো। ইচ্ছে হলে গরম জিলিপি খাও, মাঝে মাঝে মাখন-মিছরি মুখে দাও। সন্ধেবেলায় মাল খাওয়া ছেড়ে দিয়ে আমি ডেলি একটা কেশর কুলফি খাচ্ছি। আমার রকমসকম দেখে বাড়ির লোকরা তো তাজ্জব। আর এক গেলাশের বন্ধুরা তো রাগে আমাকে একঘরে করে দিয়ে কেটে পড়েছে।"

ট্যাংরা আরও বলেছিলেন, "তোমার বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন, তবু বলতে লজ্জা নেই। মদ খাওয়ার পরে যারা এদিকে-ওদিকে যাতায়াত করে, তাদেরও মোক্ষম ওষুধ দিয়েছেন ঠাকুর। আমি এখন আইন বইটই সব বিক্রিওয়ালাকে দিয়ে দিয়ে কয়েকখানা ঠাকুরের বই

নিয়ে মজে আছি। ঠাকুর বলছেন, সব সময় মনে করবি তোর মা সঙ্গে রয়েছেন। নিজের মাকে সঙ্গে করে যেখানে যাওয়া যায় না সেখানে কোন দুঃখে যাবি ? বুঝলে সনাতন, লোকটা মরে গিয়েও মজাচ্ছে। যার ঘাড়ে একবার চাপলেন ঠাকুর, তার আর কিছুতেই সুখ নেই, নিজের কোনো স্বাধীনতাও নেই। সব তখন ঠাকুরের ইচ্ছেয়। এই ঠাকুরকে বোঝা ভার ! নরেন দত্তকে বলছেন, তুই যেখানেই কাঁধে করে নিয়ে যাবি আমি সেখানেই থাকবো, আবার রসিকতা করে কতো লোকের কাঁধে যে ভর করছেন—এদের কেউ দুষ্টু, কেউ মাতাল, কেউ ঠগ, কেউ ফেরেব্বাজি করে সুখ পেতে চাইছিল, ঠাকুরের খেয়ালে এখন সে গুড়ে স্যান্ড !"

ঠাকুরকে আবার নমস্কার করলেন ঘনশ্যাম। ঠাকুরকে পুজো করার মস্ত সুবিধে, নিজের মতন করে নিজের ভাষায় ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলা যায়। অন্য দেবদেবীরা সংস্কৃত ছাড়া কিছু বোঝেন না, একমাত্র মা তারা ছাড়া।



ঠাকুরের সঙ্গে এইভাবে একান্তে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরেই বেল বাজালেন ঘনশ্যাম। মেনন খাতা হাতে এবং খবরের কাগজের তাজা কাটিংগুলো নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

ঘনশ্যাম জিজ্ঞেস করলেন, "মেনন, তোমার ওয়াইফ কেমন আছেন ?"

"ওয়াইফ ভাল না থাকলে, পৃথিবী ভাল থাকে না, মেনন"— রসিকতা করলেন ঘনশ্যাম।

এবার মেননকে কয়েকটা চিঠি ডিক্টেশন দিলেন ঘনশ্যাম। বাবা মারা যাবার পরে নিজেকে অনেক পরিশীলিত করেছেন ঘনশ্যাম। মাইনে করে মেমসায়েব মাস্টার রেখে স্পোকেন ইংলিশ আয়ত্ত করেছেন। আর একজন মাস্টার পরবর্তী স্টেজে তাঁকে ইংরিজি চিঠি লেখা শিখিয়েছেন। ঝটপট উত্তর দেওয়াটা সেরা বিজনেসম্যানের ধর্ম। চিঠির মধ্যে অনেকেই প্রাণ আনতে পারেন না। ঘনশ্যাম সে-রহস্য ভালভাবেই শিখে গিয়েছেন।

এই ইংরিজি শেখা নিয়ে সেবার হুটকো হালদার কিছু মজার খবর দিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বাঙালি বিজনেসম্যান রামদুলাল সরকার আমেরিকান ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। গরিবের ছেলে রামদুলাল ইংরিজি শেখার সুযোগ পান নি, পরে যখন কিছুটা শিখলেন তখন ভীষণ বানান ভুল হতো, তখন রামদুলাল বাংলা হরফে ইংরিজি চিঠিগুলো লিখে ফেলতেন। পরে কেরানি এসে ওই 'বাংলিশ' চিঠিকে ইংরিজি অক্ষরে লিখে দেশেবিদেশে পাঠাতেন।

যথাসময়ে ইংরিজিতে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দেবার প্রশিক্ষণও নিয়েছেন ঘনশ্যাম। এই ব্যাপারে প্রথমে একটু লজ্জা পেতেন ঘনশ্যাম, তারপর মহেন্দ্রনাথ দত্তর বইতে পড়লেন, রামকৃষ্ণ মিশনের বাঘা-বাঘা সন্ন্যাসীদের স্বয়ং স্বামীজি বেতহাতে এবং ঠোকর দিতে দিতে বক্তৃতা শিখিয়েছেন। বক্তৃতা দেবার ভয়ে পরমশ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীরা সিঁটকে উঠেছেন। বলেছেন, এ-জানলে সাধু হতাম না। তবু স্বামীজির হাত থেকে ট্রেনিং-এর ছাড় নেই। এঁরাই পরে জগদ্বিখ্যাত বক্তার সম্মান অর্জন করেছিলেন।

মেনন বললো, "স্যর, গতকাল আপনার স্পিচ খুব ভাল হয়েছিল।"

হাসলেন ঘনশ্যাম। বললেন, "অনেকে ভয়ে ভয়ে সারাজীবন

লিখিত বক্তৃতা পাঠ করে—কিন্তু তাতে প্রাণ আসে না। কেউ কেউ কার্ডে পয়েন্ট লিখে আনে। আর কেউ কেউ ভেবেচিন্তে রিহার্সাল দিয়ে আসে। তারা জানে, কী বলতে হবে, কোথায় কোথায় শ্রোতাদেরও সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।"

গতকাল জাতীয় বিস্কুট অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় সভাপতির ভাষণ দিয়েছেন ঘনশ্যাম। ভেবেচিন্তে পড়াশোনা করে তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন এই শিল্প সম্পর্কে। কিন্তু আজ সংবাদপত্রে এক লাইনও খবর বেরোয়নি। অথচ কাগজে ছবি বেরিয়েছে সনাতন সান্যালের—বঙ্গীয় পাঁউরুটি অ্যাসোসিয়েশনে সভাপতির দায়িত্বভার তিনি গ্রহণ করেছেন।

সনাতনের ছবি সমেত কাগজের কাটিংগুলো আবার দেখলেন ঘনশ্যাম। মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠলো।

তারপর ঘনশ্যাম ফোন করলেন বিস্কুট সমিতির সেক্রেটারি চিন্তাহরণ চ্যাটার্জিকে।

চিন্তাহরণ ঘাবড়ে গেলেন। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললেন, "আজ কাগজে ভীষণ প্রেসার ছিল স্যার—শহরে এতো চুরি-ডাকাতি হয়েছে না গতকাল। তার ওপর বিলেতের টেস্ট সিরিজ। তারপর আমেরিকান প্রেসিডেন্টের স্টম্যাক আপসেট। ইংল্যান্ডের রাজপরিবারেও কি যেন হয়েছে, স্যার। বিশেষ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট—উনি হাঁচলে পৃথিবীর কাগজের সর্দি ধরে যায়। স্টক মার্কেটেও সিরিয়াস রি-অ্যাকশন হয়।"

কিন্তু দুনিয়াতে যত অঘটনই ঘটুক, তার জন্যে ব্রেড বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত সভাপতির ছবি বেরুতে কোনো অসুবিধে হয়নি!

ঘনশ্যামবাবুর কথা শুনে খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন চিন্তাহরণ। বললেন, "একচোখোপনা স্যার। সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে পি-আর-ওর মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনলে কাগজের কর্তারা মুহূর্তে গলে যান!"

"চ্যাটার্জিমশাই, বড় বড় কাগজের কর্তাদের খোঁজখবর কিছুটা রাখি। লাটসায়েবের বাৎসরিক টিপার্টিতে ওঁদের সঙ্গে সস্ত্রীক দেখা হয়। কর্তারা ওঁদের কাগজের বাণিজ্যপাতাগুলোর তেমন কোনো খোঁজই রাখেন না।"

"ঠিক বলেছেন স্যার। সেইজন্যেই তো ইকনমিক এডিটর, চিফ সাব এডিটর, রেসিডেন্ট এডিটর সব মাথায় চেপে বসে থাকেন। বলতে কি ওঁরা কেলোর কীর্তি লাগিয়েছেন।"

"সেটা আবার কী ব্যাপার, চিন্তাহরণ?"

"কেলো স্যর। সেটা এক্সপ্লেন করতে লজ্জা হয়।"

"কালো টাকা? টেবিলের তলার টাকা?"

"না স্যর, আরও সিরিয়াস। আসলে ভীষণ জটিল খেলা, অভিমন্যুর ব্যূহভেদের মতন। আমাদের সমিতির অফিসার ফটো, এসপিচ, হ্যান্ডআউট সব নিয়ে ইকনমিক এডিটরকে জপিয়ে এলো, কিন্তু তাঁর শালীর যে বিয়ে তা জানা ছিল না। পেজ মেক-আপের আগেই তিনি চলে গেলেন বেহালা. আর নাইটসাব ডায়াবিটিক। মিষ্টি খাওয়া বারণ বলে বিস্কুটের ওপর জাতক্রোধ। দিলেন আমাদের আইটেমটা খচাং করে উড়িয়ে।"

"আমাদের নোনতা বিস্কুটও আছে, চিন্তাহরণবাবু!" বিরক্ত ঘনশ্যাম ঘোষাল মনে করিয়ে দিলেন।

"ওঁর সেখানেও প্রবলেম, স্যর। হাইপারটেনশনও আছে। ডায়াবিটিস উইথ ব্লাডপ্রেসার, একেবারে রাজযোটক স্যর।"

"চিফ এডিটরকে ভালভাবে জানেন আপনি?" প্রশ্ন করেন ঘনশ্যাম।

এবার একটু ভেঙে পড়লেন চিন্তাহরণ চ্যাটার্জি। বললেন, "কতজনকে আর জানবো স্যর? প্রতি রাত্রে ইংরিজি খবরের কাগজের অফিসে নিউ নিউ ফেস। ওখানে লোক টিকছে না স্যর, মোটা মাইনেতে সব বোম্বাই, দুবাই. হংকং, সিঙ্গাপুর চলে যাচ্ছে।"

"শুনুন চাটুজ্যে মশাই, বাজে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি আরও

একবছর বিস্কুট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট থাকছি। আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করছে আপনার পদোন্নতি এবং চাকরিতে এক্সটেনশন। একটু নড়েচড়ে বসুন। একটু অ্যাকটিভিটি দেখান। বেঙ্গল পাঁউরুটি সমিতির সেক্রেটারিকে বাবা-বাছা করে জেনে নিন কী করে সনাতন সান্যালের অতবড় ছবিটা খবরের কাগজে ছাপা হলো। শুনুন মশাই, একটা কাগজের বাণিজ্য সম্পাদকের না হয় বাড়িতে বিয়ে ছিল, কিন্তু অন্যসব কাগজে আমরা ব্ল্যাক-আউট হলাম কেন ?"

ঘনশ্যাম এবার টেলিফোন নামিয়ে মেননকে একটা চিঠি ডিকটেট করলেন—সনাতন সান্যালকে অভিনন্দন জানালেন, তাঁর নতুন সম্মানের জন্য। চিঠিটা টাইপ হয়ে আসার পরে কী ভেবে ঘনশ্যাম সই করলেন না, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন।

মনে মনে ঘনশ্যাম বললেন, "গতবছর আমি বিস্কুট সমিতির সভাপতি হয়েছি, একশ আশিখানা অভিনন্দনপত্র এসেছে, টেলিগ্রাম এসেছে, ফ্যাক্স এসেছে, কিন্তু সনাতন সান্যালের কাছ থেকে একটা চিরকুটও আসেনি।"

তা হলে ঘনশ্যাম ঘোষালই বা অভিনন্দন পাঠাবেন কেন ? স্বয়ং ঠাকুর বলেছেন, "পেটে এবং মুখে আলাদা হওয়াটা ভাল নয়। খল লোকদের জন্যে তো এই পৃথিবী নয়।"

কথাগুলো মেনন নোট করছে দেখে বকুনি লাগালেন ঘনশ্যাম, "কী লিখছো ?"

মেনন নিজেও কথামৃতের ইংরিজী অনুবাদ গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ একখানা সংগ্রহ করেছে এবং পড়ে ফেলেছে।

মেনন হঠাৎ জানতে চাইছে, "রামাকৃষ্ণা কোথায় এই মন্তব্য করেছেন ?"

চটে উঠলেন ঘনশ্যাম ঘোষাল, "আঃ জ্বালাতন কোরো না। ঠাকুর কোথায় এই কথা বলেছেন তা আমার মাথায় নেই ; তবে ইউ উইল এগ্রি উইথ মি, ঠাকুর এমন কথা ইচ্ছে করলেই বলতে পারতেন।

চাটুজ্যে হলে কী হয়, খুব সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন গদাধর, বিষয়ী মানুষের প্যাঁচপয়জার একদম বুঝতেন না।"

"হিজ সন বিবেকানন্দ," মেনন কী বলতে গিয়ে তোতলামি শুরু হয়ে গেলো।

"নট জেনুইন সন—স্পিরিচুয়াল সন নরেন দত্ত। কুটিল সমাজে দত্তকায়স্থদেরও বদনাম আছে, মেনন। ওনলি এ বারেন্দ্র সান্যাল ক্যান ম্যাচ দেম।"

মেননও দমবার পাত্র নয়। জিজ্ঞেস করলো ওঁদের 'এনটুরেজ'-এ কখনও কোনো সানিয়াল ছিল না ?

"ভাল প্রশ্ন করেছো মেনন", চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন ঘনশ্যাম। তারপর ঘনশ্যাম উত্তর দিলেন, "বৈকুণ্ঠ সান্যাল বলে একজন ছিলেন। কিছুদিন সাধুও হয়েছিলেন, নাম হয়েছিল স্বামী কৃপানন্দ। কিন্তু সন্ন্যাসজীবনের চাপ সহ্য করতে পারলেন না, গৃহী হয়ে ফিরে এলেন। ঠাকুর সম্বন্ধে বইপত্তর কীসব লিখেছিলেন। এই মহা সমস্যা, মেনন। আমি যদি কোনো কারণে বিখ্যাত হই, তাহলে আমার ধোপা, নাপিত, ড্রাইভার, পাওনাদার, পি এ সবাই একখানা করে লীলাপ্রসঙ্গ লিখে ফেলবে।"

আর চিত্তবিক্ষেপ নয়, এবার কিছু কাজ।

কয়েকটা ব্যবসায়িক কাগজ মন দিয়ে পরীক্ষা করলেন ঘনশ্যাম, তারপর গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। শুধু সনাতন সান্যাল নয়। তাঁরও একাধিক বিস্কুট কারখানা আছে। কিন্তু কয়েকদিন হলো ঘনশ্যামের গোডাউনে অবিক্রিত বিস্কুটের স্টক বেড়েই চলেছে, অথচ কারখানার উৎপাদনও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ঘনশ্যাম একটু উদ্বিগ্ন হয়ে এবার ফোনে ডাকলেন উপেনকে। "কী ব্যাপার ? লোকে বিস্কুট খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে নাকি ?"

ঘনশ্যাম শুনলেন, খাওয়া কমানো দূরে থাক, ভাল বিস্কুটের চাহিদা

বেড়েই চলেছে। যাদের আগে দুবেঁলা ভাত জুটতো না তারাও এখনও বিস্কুট ছাড়া চা খাচ্ছে না।

"তাই তো হওয়া উচিত উপেন। এদেশে লোক গিজগিজ করছে—দিনে দু'খানা করে বিস্কুট সকালে খেলে আমরা ডজন ডজন সোনার বিস্কুট প্রত্যেকদিন বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো।"

উপেন স্বীকার করলো, "বাজার বাড়ছে। কিন্তু একই তালে ঘনশ্যামের মার্কেটশেয়ারও কমছে।" আরও খোঁজখবর করার জন্যে উপেন আজ সকালে কয়েকটা হোলসেল মার্কেটে খোঁজ করতে যাবে।

ঘনশ্যাম এবার অফিসের রেসিডেন্ট দুই বেয়ারাকে ডাকলেন। এই অফিসটা তাদেরই জমিদারি। আলাদা আলাদা দুটো দোকান থেকে একশ গ্রাম থিন আনতে বললেন দুই কর্মীকে।

মেনন জানতে চাইলো, ঘনশ্যাম বিস্কুট খাবেন কি না, তা হলে অফিসেই টাটকা স্টক আছে।

ঘনশ্যাম তাকে ইঙ্গিতে কোনো মন্তব্য করতে বারণ করলেন। লোকটা জানে না, কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের মাঝে মাঝে বাজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ রাখতে হয়। ভারতের সেরা কোম্পানি হিন্দুস্থান লিভারের চেয়ারম্যান এখনও মাসে একদিন ফেরিওয়ালা সেজে সানলাইট লাইফবয় সাবান অথবা পেপসোডেন্ট দাঁতের মাজন বিক্রি করেন বাজারে।

"আমার অফিসাররা সব সায়েব হয়ে যাচ্ছেন, শুধু অফিসের পেপার দেখেই তাঁরা ডিউটি সেরে ফেলছেন।" বিরক্ত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন ঘনশ্যাম ঘোষাল।

দোকান থেকে বিস্কুট এলো। দুটো প্যাকেটই খুলে ফেললেন ঘনশ্যাম। এবার তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। দুই দূতই বাজার থেকে সনাতনের স্যান্টান বিস্কুট কিনে এনেছে।

রাগে ফুঁসতে লাগলেন ঘনশ্যাম। তারপর মেননকে পাঠালেন স্থানীয় দোকানগুলোতে খবর করতে।

মেননের রিপোর্টও ভাল নয়। সনাতনের সেলস রেপ লড়াকু

মেজাজে এখানকার বাজারে নেমেছে। তারা বাড়তি বিক্রির জন্যে দোকানদারকে ইনসেনটিভ বোনাস দিচ্ছে। ফলে দোকানদার অন্য সব বিস্কুট ফেলে স্যান্টানকেই খরিদ্দারের কাছে ঠেলছে।

"শুধু দোকানদার ঠেললেই জিনিস বিক্রি হয় না, মেনন। মার্কেটিং-এর গীতায় এমন কথা তো বলে না।" মন্তব্য করলেন ঘনশ্যাম।

"খরিদ্দারও খেয়ে পছন্দ করছে স্যর। কুড়মুড় বলে সনাতনের কোম্পানি নতুন যে মাল ছেড়েছে তা এখন বেস্ট সেলার।"

গম্ভীর হয়ে উঠলেন ঘনশ্যাম। মেনন বললো, "ব্লাইন্ড টেস্টে ওরা ভাল পয়েন্ট পেয়েছে, স্যর।"

"এর মধ্যে আবার অন্ধদের টেনে আনছো কেন, মেনন ?" বিরক্তি প্রকাশ করলেন ঘনশ্যাম।

মেনন তখন ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। আমেরিকান কোম্পানিরা এইসব টেস্ট এনেছেন। চোখ বন্ধ করে বিভিন্ন কোম্পানির বিস্কুট খেয়ে যাবেন অতিথিরা, তারপর বলবেন কোনটা কেমন লাগলো। স্যান্টানের স্কোর হায়েস্ট, বিলিতি কোম্পানির ব্রান্ড থেকেও বেশি পয়েন্ট।

"আর ওই কুড়মুড় ?" জানতে চাইলেন।

"স্যান্টানের এই নিউ প্রোডাক্ট জন্ম থেকেই উইনার। দিশি বিস্কুট নেড়োকে সায়েব সাজিয়ে নিউ প্রোডাক্ট করেছেন মিস্টার সনাতন সান্যাল—একটু মিষ্টি, একটু ঝাল। শিওর হিট।"

"হুম !" একটা চাপা এবং অস্পষ্ট আওয়াজ ছাড়লেন ঘনশ্যাম। এতোদিন বিস্কুটের স্থানীয় জমিদার ছিলেন ঘনশ্যাম ঘোষাল। "এই লাইনে প্রথম কে এসেছে, মেনন ?"

"আপনি স্যর। সান্যাল তো অনেক পরে ঢুকলেন।" সবিনয়ে নিবেদন করলো মেনন।

"আমার মাত্র চারটে কারখানা। আর সনাতনের ?"

ইতিমধ্যে উপেন মুখুজ্যে এসে গিয়েছেন। বুঝছেন অফিস তোলপাড় হবে আজ।

সায়েব জানতে চাইছেন সনাতনের বিস্কুট কারখানা কতগুলো ?

"খাতায় কলমে চারটে।"

"তা হলে কুরুক্ষেত্তরের লড়াই হবে না কেন ?"

"হবে কি করে ? আরও তিনটে কারখানা চুপি চুপি লিজ নিয়েছেন সনাতন।"

এ ছাড়া বর্ধমানেও বোধহয় একটা বেনামী কারখানা রয়েছে এবং সেই সঙ্গে বোলপুরেও কিছু হয়েছে। "বিশ্বভারতী গিয়েছিলাম স্যর, ওখানে রতন কুঠি গেস্ট হাউসে স্যান্টান দিল। ফিরলাম দুর্গাপুর হয়ে। শতাব্দী এক্সপ্রেসে প্যাসেঞ্জারদের চায়ের সঙ্গে বিস্কুট দিল। এগেন..."

"স্যান্টান। এই তো ? আমাদের এস বি জি বিস্কুটের দেখা নেই কোথাও !"

এবার টগবগ করে ফুটছেন ঘনশ্যাম ঘোষাল। "অথচ এই সনাতন যেদিন মিষ্টির লাইন থেকে বিস্কুটের লাইনে ঢুকলো তখন তোমরা সবাই বললে, লোকটা ছ'মাসে দেউলিয়া হয়ে যাবে, বিস্কুট লাইনে আমরা কিং ছিলাম, আছি এবং থাকবো। এখন তো দেখছি, এইভাবে আমরা বিস্কুট লিগের লাস্ট টিম হয়ে যাবো।"

এতো বিরক্ত হচ্ছেন কেন ঘনশ্যাম ?

ব্যাপারটা ক্রমশ বোঝা যাচ্ছে। "আমার বিস্কুটটা শুধু বিজনস নয়, উপেন। প্রত্যেক বিস্কুটে আমার বাবার নাম সুখবিলাস ঘোষাল লেখা আছে—এস বি জি। বাবার নাম ভুলতে আমি রাজি নই উপেন।"

ঘনশ্যাম এবার জানতে চাইলেন, "স্যান্টান কোম্পানি দোকানদারকে বেশি কমিশন দিচ্ছে কী করে ?"

"বেশি কমিশন নয়, বেশি ইনসেনটিভ বোনাস। যত বেশি স্যান্টান বিক্রি করবে তত বেশি কমিশন পাবে। যারা টপে থাকবে তাদের সামনের পুজোতে হংকং-এ ফ্রি হলিডে। এ-মাসের শেষে রেজাল্ট বেরুবে, তাই স্যান্টানের বিক্রি বাড়াবার জন্যে দোকানদাররা পাগল হয়ে

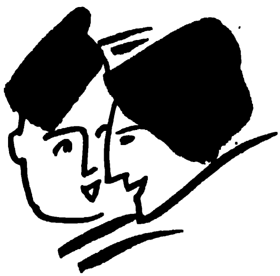
উঠেছে স্যর, এমন কি বহুজাতিক কুইন ভিক্টোরিয়া ব্রান্ডও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে।"

"আমাকে বোকা বানিয়ো না। যা জানতে চাইছি তা সোজাসুজি বলো উপেন।" ঘনশ্যাম তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

"বিনা পয়সায় দেশভ্রমণ করবার সুযোগ পেলে মানুষ পাগল হয়ে যায়।"

"হংকং তো বিনা পয়সায় যাওয়া যায় না। টাকা খরচ হয়। সেই টাকা সনাতন সান্যালের আসছে কোথা থেকে ?"

হাওয়া বুঝে কেউ উত্তর করলো না। ঠোঁটে তালা লাগিয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলো।



কিছুদিন আগে ঘনশ্যাম এক মিটিং-এ বলেছিলেন, বাইরের কোনো কোম্পানিকে দিয়ে মার্কেট রিসার্চ এবং মার্কেট অডিট্ করাও। তারপর নিজেই হেসেছিলেন। "আগেকার যুগে স্রেফ হিসেবের কারচুপি ধরবার জন্যে অডিটর আসত। এখন শুনি পঞ্চাশ-ষাট রকমের অডিটর। এমন কি সোশ্যাল অডিট।"

"সেটা আবার কী জিনিস স্যার ?" জানতে চেয়েছিল উপেন মুখার্জি।

"বড় বড় কোম্পানিরা এই অডিট করাচ্ছে—সমাজের সব সাধ-

আহ্লাদ পূরণ করছে কি না কোম্পানি তা খতিয়ে দেখবার জন্যে নামকরা লোকরা সোশ্যাল অডিটর হচ্ছেন এবং রিপোর্ট দিচ্ছেন।"

উপেন হেসে বলেছিল, "ওসব স্যর বড় বড় মালিকদের বড় বড় খেয়াল! পাঁচ বছর দশ বছর নিজের খেয়ালে চলে তারপর একবার সোশ্যাল অডিটর লাগিয়ে দেওয়া। আমাদের স্যর পাবলিক নিত্য অডিট করে। একদিন মাল খারাপ হলে, দাম বেশি হলে, মুখে না রুচলে সব সম্পর্ক সঙ্গে সঙ্গে কাট করে দেবে। আপনি এ বি সি বিস্কুট দেখুন। প্রতিষ্ঠাতা এ বি চ্যাটার্জির আদি বিস্কুট—স্লোগানই ছিল 'শতাব্দীর উপরে সুপরিচিত'। কিন্তু ফরেন কোম্পানির কুইন ভিক্টোরিয়া ব্রান্ড এসে ওদের এই লাইন থেকে বার করে দিল। এখন কারখানায় ক্লোজার হয়ে তালা ঝুলছে, পাবলিকের মাল পছন্দ হলো না বলে।"

মার্কেট অডিটরকে ডেকে পাঠালেন ঘনশ্যাম। মার্কেট রিসার্চ রিপোর্ট পেশ করবার জন্যে ওদের বম্বে অফিসের মিজ্ বিলি ভোজওয়ানি নিজে কলকাতায় আসবেন এই পরিকল্পনা ছিল। ঘনশ্যাম দেরি করতে রাজি হলেন না। কাজ যদি হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে আজই রিপোর্ট চান ঘনশ্যাম। এখানকার মিস্টার তালুকদার এলেই কাজ হবে। এজেন্সি জানাল, তালুকদারের সঙ্গে থাকবেন মিজ্ সানন্দা সরখেল, যার হাজবেন্ড আই টি সি-তে ভিপি হয়ে রয়েছেন।

বিরক্ত হয়ে ঘনশ্যাম বললেন, "দেরিতে ঘুম ভাঙার জন্যেই এ বি সি বিস্কুট শেষ হয়ে গেলো। চলবে কী করে? চাটুজ্যেদের একছেলে ফুটবল নিয়ে দিনরাত মেতে রইলেন, আর একজন সাউথের কোন যোগী বাবার খপ্পরে পড়লেন। বাবাজির নির্দেশে উষাকাল পর্যন্ত জেগে থাকতে হতো, ফলে ঘুম থেকে উঠতে সকাল সাড়ে দশটা। তারপরে তৈরি হওয়া। কোনোদিন একটার আগে কর্তাদের অফিসে পাওয়া যাবে না। ওই সময় আবার কোম্পানির কর্মীদের টিফিন আওয়ার। ফলে দুটোর সময় কাজ আরম্ভ। তখন ইট ইজ টু লেট!"

উপেনকে জিজ্ঞেস করলেন ঘনশ্যাম, "সনাতন সান্যালের কোম্পানি বাড়তি কমিশন দিচ্ছে কী করে ? ঘরের টাকা বাজারে দানছত্র করবার জন্যে তো কেউ বিজনেসে আসে না।"

মাথা চুলকোচ্ছে উপেন মুখুজ্যে। ঘনশ্যাম বললেন, "ওরাও যেখান থেকে ময়দা চিনি মাখন এটসেটরা কেনে আমরাও সেখান থেকে কিনি।"

"লিজে যে বিস্কুট কোম্পানিগুলো ওরা নিয়েছে সেগুলো ধুঁকছিল, স্রেফ খুলে রাখবার জন্যে শ্রমিকের মাইনেপত্তর কম। তাই ওখানে লাভের মার্জিনটা বেশি। ওই মার্জিনটা অন্য কেউ হলে বাড়ি নিয়ে যেতো, কিন্তু স্যান্টান ওই টাকাটা ডিসকাউন্টে ঢেলে বাজারটা বাড়িয়ে নিতে চায়। একেই বলে মাছের তেলে মাছ ভাজা। ইলিশ মাছে এক একসময় ভীষণ তেল হয় স্যর !"

উপেন আরও বললো, "এই অঙ্কটা বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এ দেশে মাথা খাটিয়ে বার করেছিল। অসুস্থ কারখানাগুলো সময়মতো কব্জা করে নাও, তোমার নিজস্ব কারখানার ইনএফিসিয়েন্সি বা অকর্মণ্যতা ওখানকার ঘাড়ে চাপিয়ে দাও, ওরা কম মাইনেতে বেশি কাজ করুক, যাতে তোমার বেশি লাভ হয়। সেই লাভের টাকায় মার্কেট খারাপ করে দাও, তখন আরও কয়েকটা কারখানা অসুস্থ হয়ে পড়ুক। তখন সেগুলো টুক করে কব্জা করে নাও। ওসব কোম্পানিকে ওরা নিজের করে নেয় না, কনভার্টার হিসেবে কাজে লাগায়।"

"তুমি যে ট্রেড ইউনিয়ন নেতার মতো কথা বলছো, উপেন," মন্তব্য করলেন ঘনশ্যাম।

"না স্যর, সত্যি বলছি। কারখানা বন্ধ হবে শুনলেই আজকাল শ্রমিকের হাত-পা হিম হয়ে যায়, তালা চাবি কেনা হচ্ছে বুঝতে পারলেই অতিমাত্রায় কোঅপারেশন করে ! আপনি তাকিয়ে দেখুন সমস্ত বেঙ্গলের দিকে। এই কনভার্টার বিজনেসটা বেশ ভাল জমেছে। তোমার কাঁচামাল কেনবার ক্ষমতা নেই, মাল বেচবার ক্ষমতাও তুমি হারিয়েছ। থাকার মধ্যে শুধু আছে গতর অথবা শ্রম। কুছ পরোয়া

নেই! বহুজাতিক কোম্পানি তোমাকে পঙ্গু অবস্থায় প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে। তাঁরা তোমাকে কাঁচামাল পাঠাচ্ছেন, মোড়ক পাঠাচ্ছেন, তাঁদের ব্রান্ড নেম পাঠাচ্ছেন, তুমি স্রেফ মালটা ওঁদের ইচ্ছে অনুযায়ী তৈরি করে তাঁদের হাতে তুলে দাও। গতর খাটাবার জন্যে কিছু টাকা নাও, তারপরে মুখে মৌরি পুরে বসে থাকো। পেটে যত খিদেই থাকুক। অর্থাৎ স্রেফ বেঁচে থাকো এবং খাটো, খাটো এবং বাঁচো।"

"বহুজাতিকদের পথ ধরে এই পলিসি যদি স্যান্টান নিয়ে থাকে তা হলে আমরা এতোদিন এ লাইনে যাইনি কেন ?" এ-প্রশ্ন কাকে করবেন ঘনশ্যাম ঘোষাল ?

যথাসময়ে হোটেলের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বিজনেস রুমে সপার্ষদ ঘনশ্যাম ঘোষাল পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী হাজির হলেন।

এইখানেই তাঁদের নিযুক্ত মার্কেট রিসার্চ কোম্পানি বিশেষজ্ঞের বক্তব্য পেশ করবে। এইভাবে কাজ করাই এখনকার স্টাইল—বড় বড় কাজগুলো নিজের অফিসে আর হয় না।

মিজ্ সানন্দা সরখেল ইতিমধ্যেই উপস্থিত হয়েছেন। কালো হয়েও যে কত সুন্দরী হওয়া যায় তার প্রমাণ এই মিজ্ সরখেল। স্বয়ং ঈশ্বর যামিনী রায় স্টাইলে এই কোমল পেলব শরীরটাকে এমনি কাষ্ঠখণ্ড থেকে কুঁদে বার করেছেন। একই সঙ্গে নরম এবং সুকঠিন!

শুধু সুশাসিত রমণী শরীর থাকলেই এযুগে হয় না, সেই সঙ্গে প্রয়োজন বিবিধ যত্নের। আজকালকার মেয়েদের এই দিকটা খুব ভাল লাগে ঘনশ্যামের। অফিসে এরা প্রচণ্ড কাজ করে, অথচ প্রসাধনে বিন্দুমাত্র অবহেলা নেই। শরীরকে এরা সম্ভ্রম করে এবং মূল্যবান ব্যক্তিগত মূলধন বলে মনে করে। প্রাচীন ভারতীয় ভেষজের সঙ্গে ফরাসি আঘ্রানের সমন্বয় ঘটিয়ে আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র ভারত-ললনাদের জয় জয়কার। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সুমধুর মিলন ঘটেছে একালের সানন্দাদের শরীরে, ব্যক্তিত্বে এবং মানসিকতায়।

বিলি ভোজওয়ানির জরুরি ফ্যাক্স বার্তা ঘনশ্যামের হাতে নিজে তুলে দিলেন মিজ্ সরখেল। বার্তায় ঘোষালের কোম্পানিকে গ্রিটিংস আছে, আর কিছু ইঙ্গিত তেমন নেই। এই কোম্পানি চান, ঘনশ্যামের এস বি জি বিস্কুট ব্রান্ডের প্রতিপত্তি সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়ুক।

"ইমাজিন দ্য মার্কেট!" বলে যামিনী রায় মার্কা চোখদুটো আরও বড় বড় করলেন আমাদের মিজ্ সানন্দা সরখেল। "জাপানিদের তুলনায়, ফরাসিদের তুলনায়, তাইল্যান্ডের তুলনায় ভারতীয়রা এখনও কত কম বিস্কুট খান। হোয়াই? হাউ? অ্যান্ড হোয়েন?"

অধৈর্য হয়ে আছেন ঘনশ্যাম। ভারতীয়দের বিস্কুটপ্রেম সম্বন্ধে তিনি গবেষণা চান না।

"স্যান্টান সম্বন্ধে কী পেলেন তাই বলুন, মিজ্ সরখেল," আলোচনাকে অর্থবহ করে তোলার আহ্বান জানালেন ঘনশ্যাম।

"মার্কেটে স্যান্টান সম্বন্ধে কৌতূহল এবং প্রেফারেন্স দুইই বাড়ছে," স্বীকার করলেন মিজ্ সরখেল। "প্রথমত প্রতি দেড়শ গ্রামে দু'খানা বিস্কুট বেশি দেওয়া হচ্ছে ওঁদের প্যাকে। ওঁরা কোনো ক্লেভার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রক্রিয়ায় বিস্কুটের ওজন কমিয়ে দিয়েছেন—স্যান্টান লাইট।"

"এতে লাভ?" জানতে চাইলেন সনাতন।

"অনেক লাভ। যাঁরা লুজ বিস্কুট বিক্রি করছেন, তাঁদের প্রতি ইউনিটে দাম অনেক কম পড়ছে। প্লাস স্পেশাল ডিসকাউন্ট।"

"কাস্টমার বুঝতে পারছেন না যে তিনি ওজন কম পাচ্ছেন?"

"বিস্কুটের মার্কেটে ওজন নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, মিস্টার ঘোষাল। কানাডিয়ান ফ্যামিলি রিসার্চেও একই কথা বলছে। ওয়ার্লডের কোথাও কেউ ময়দার ঢিবি চায় না, চায় মুচমুচে ভাব, চায় প্লিজিং ডিজাইন, চায় স্বাদ। অ্যান্ড দোকানদাররা চায়..."

"হায়েস্ট ডিসকাউন্ট," কথাটা নিজেই তিক্তভাবে শেষ করে দিলেন ঘনশ্যাম। মনের জ্বালা চেপে তিনি রাখতে পারলেন না।

উপেন মুখার্জির সংযোজন : "অ্যান্ড ধার। পকেটে পয়সা থাকলেও ক্রেডিট রাখতে পেলে মানুষ ভীষণ খুশি হয় স্যর। ধার জিনিসটার প্রতি টান মানুষের রক্তের মধ্যে রয়েছে বোধ হয়। নগদ পেমেন্টের কথা তুললেই অনেক ডিলার মিইয়ে যাচ্ছে লজ্জাবতী লতার মতন।"

"ধার চায়, কিন্তু পায় না সব সময়, মিস্টার ঘোষাল।" মিজ্ সানন্দা সরখেল লীলায়িত ভঙ্গিমায় মহামূল্যবান ঊর্ধ্বশরীরকে শতদল পদ্মের মতন বিকশিত করে বললেন, "মার্কেট লিডাররা ধার দেন না। কুইন ভিক্টোরিয়া কোম্পানি, এমন কি স্যান্টান কোম্পানিও রিটেল ক্রেডিট প্রায় 'নিল' করে দিয়েছে। মার্কেট লিডাররা ধারের মার্কেটটা অন্যের দিকে ঠেলে দেন। দুটো বিক্রির লোভে ছোট কমপিটিটর ধার দিয়েছেন তো নিজের বিপদ ডেকে এনেছেন! আপনার মাল বেচা পয়সা বাকি রেখেই লোভী ডিলার সেই পয়সায় প্রতিযোগী কোম্পানির মাল স্টক করবে। অথচ রিটেলারের অন্য কোনো পথ নেই, কারণ বাঘাবাঘা বহুজাতিকরা তার সমস্ত ক্যাশ সপ্তাহের শুরুতেই টেনে নিয়েছে। হিন্দুস্তান লিভার, ব্রিটানিয়া, গোদরেজ, কোলগেট-পামঅলিভের সেলস্ রেপ দোকান ঘুরে যাবার পরে কোন্ দোকানির কাছে নগদ টাকা পড়ে থাকবে?"

গম্ভীর হয়ে উঠলেন ঘনশ্যাম। পাঁচতারা হোটেলে কাপের চা তাঁর কাছে বিস্বাদ লাগছে! তার ওপর মেজাজ খারাপ হলো এখানেও স্যান্টান বিস্কুট সার্ভ করা হয়েছে।

"পাঁচতারা হোটেলেও ওরা কী করে ঢুকলো উপেন?" রাগে ফুঁসছেন ঘনশ্যাম ঘোষাল।

মিজ্ সানন্দা সরখেল আলতোভাবে ঠোঁটটা মুছে নিয়ে বললেন, "লেটেস্ট ক্রেজ অ্যামং স্মল কোম্পানি। সবাই প্রেস্টিজ তৈরির জন্যে হায়েস্ট লেভেলে উঁকি মারতে চাইছে। রাইটার্সের কেরানি যদি জানে যে ফাইভ স্টার হোটেল ও রেস্তোরাঁয় যে বিস্কুট দেওয়া হয়, সেই বিস্কুটই সেও ফাটা কাপ ডিসে পাচ্ছে তা হলে সে অনির্বচনীয় মানসিক আনন্দ

পায়। যেজন্যে এই সেগমেন্ট ধরবার জন্যে অনেক কোম্পানি মরিয়া হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনে কেউ কেউ ফ্রি সাম্পলিং করছে, মিস্টার ঘোষাল।"

"মানে বিনা পয়সায় মাল দিয়ে যাচ্ছে ফাইভ স্টারকে এবং এরোপ্লেন কোম্পানিকে স্রেফ ভিজিব্‌ল হবার বাসনায়। ভাবা যায় না।"

মিজ্‌ সরখেল বললেন, "নাউ অ্যাবাউট 'কুড়মুড়'। প্রথমত এটা• জেনেরিক নেম, তবু রেজিস্ট্রির আবেদন হয়েছে ফ্রম স্যান্টান। মনে হয়, কুইন ভিক্টোরিয়া প্রতিবাদ জানিয়ে ব্রান্ড উকিলের চিঠি দেবে। এনিথিং মুচমুচে মিনচিং ইজ কুড়মুড়! কথাটা নো লঙ্গার ইন্ডিয়ার নিজস্ব সম্পত্তি, এটা ইংরিজি ভাষার অঙ্গ হয়ে গিয়েছে, যেমন 'হাঙ্গামা', কিংবা 'আয়ারাম গয়ারাম'। এটা খুব এক্‌সাইটিং সাবজেক্ট মিস্টার ঘোষাল, ইন্ডিয়ার নিজস্ব সব স্পেশাল শব্দ ঝটপট রপ্তানি হয়ে যাচ্ছে ইংলিশে, শেষপর্যন্ত আমাদের নিজস্ব বলে তেমন কিছু থাকবে না, যেমন 'ভুজিয়া', 'কুড়মুড়', 'চিড়বিড়' এটসেটরা। বহুজাতিকরা এই সব ওয়ার্ড মোটা দামে কিনে নিয়ে রেজিস্ট্রি করে নেবে, আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। ঘামাচির পাউডার—চিড়বিড়। ভাবুন তো নামখানা।"

গুম হয়ে শুনছেন ঘনশ্যাম। মিজ্‌ সরখেল বললেন, "এমনকি 'ভদ্রলোক' কথাটা ইতিমধ্যে এক্সপোর্ট হয়ে গিয়েছে। নতুন অক্সফোর্ড অভিধান অনুযায়ী তেইশ শ কথা ইতিমধ্যেই আমাদের হাতছাড়া হয়ে ফরেনে চলে যাচ্ছে, যেমন প্রতিদিন গড়ে দুনিয়ায় চার হাজার লোক ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। প্রধান লাভ হচ্ছে চার্চের। প্রধান ক্ষতি হচ্ছে মন্দিরের। অবশ্য তার জন্যে দু'লাখ বাষট্টি হাজার মিশনারি প্রতিদিন দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে, বছরে খরচ হচ্ছে অন্তত আটশ কোটি ডলার, এইট বিলিয়ন ডলার। ভগবানেরও নিয়মিত মার্কেটিং অডিট হচ্ছে!"

মেয়েটা কত কিছু জানে, ভাবলেন ঘনশ্যাম। এ-বিষয়ে দরিদ্র ভারতবর্ষের কি অবস্থা জানবার ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু ঘনশ্যামের মন পড়ে রয়েছে বিস্কুট ইনডাসট্রিতে।

"এই বেলায় কম দামে তুলে রাখুন কিছু শব্দ, পরে ভীষণ কাজে লেগে যাবে—'হুড়মুড়', 'চটপট', 'ফটাফট'।" প্রস্তাব দিলেন সানন্দা সরখেল যাঁর ব্যক্তিত্বের পিছনে বহুজাতিক আই টি সি-র আলো দপদপ করছে।

"লাস্ট শব্দটা নিয়ে কোম্পানি কী করবে?" জানতে চাইলেন ঘনশ্যাম।

"কুড়মুড় আপনার হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু হাল্কা স্ন্যাক্স বিস্কুটের সেগমেন্টে 'ফটাফট' কীরকম ড্রামা আনতে পারে ভেবে দেখুক আপনার অফিস।"

"ওরা কি মা এবং বাবাকেও ইংরিজিতে নিয়ে নেবে?" জানতে চাইলেন ঘনশ্যাম।

"মা সম্বন্ধে জানি না, কিন্তু ইংরিজিতে 'বাবা' নাউ হ্যাজ এ স্পেশাল মিনিং, মিস্টার ঘোষাল। বাবা মানে ফাদার নয়, যেমন বেলুড় মঠের স্বামী মানে হাজবেন্ড নয়। সোয়ামীর আগে 'দ্য' জুড়ে দিলেই একেবারে অন্য মানে হয়ে যায়—সামওয়ান যে ইচ্ছে করলেই হাজব্যান্ড হতে পারতো, কিন্তু বাই চয়েস ওই লাইফের ধারে কাছে যাচ্ছে না। জামাকাপড়ের দোকানে এখন ইংরিজিতে বাবাস্যুট মানে বেবিদের জামাকাপড়। দ্য স্বামী অর্থে ইতিমধ্যেই 'সনিয়াসি' বোঝাচ্ছে।"

মিজ্ সানন্দা সরখেল স্বীকার করলেন, সনাতন সান্যালের কোম্পানি অনেকদিন আগেই মার্কেট রিসার্চ করে ভেবেচিন্তে নোন্‌তা বিস্কুটের দিকে ঝুঁকেছে।

সানন্দার মতে "কুড়মুড় ইজ এ নাইস স্লট, অস্বীকার করে লাভ নেই। দেশের যত সমৃদ্ধি হবে মানুষের ওজন তত বাড়বে, শরীরের যত ওজন বাড়বে ততো অরুচি হবে মিষ্টিতে, তখন নোনতার দিকেই সকলের টান হবে, মিস্টার ঘোষাল। আমাদের রিসার্চ তো তাই বলছে। কানাডায় তাই হয়েছে, ফিজিতেও তাই হয়েছে, তাইওয়ানে একই ব্যাপার লক্ষ্য করা গিয়েছে।"

তা হলে কি সনাতন সান্যালের কনফেকশনারি চেন তখন ডকে উঠে যাবে?

সনাতন অত বিজনেসম্যান বোকা নয়। সে জানে, যতোদিন মানুষ থাকবে ততদিন মিষ্টি থাকবে। মিষ্টির লাভের টাকাতেই সনাতন সান্যাল পেসট্রি চেন করেছে, বিস্কুট ফ্যাক্টরি করেছে। আর পাউরুটির কোম্পানিগুলি স্রেফ ঘোষাল ফ্যামিলিকে একটু নাড়া দেবার জন্য কেনা হয়েছে।

বিরক্ত ঘনশ্যাম ঘোষাল মন্তব্য করলেন, "কুড়মুড়ের মার্কেট রিসার্চ সম্বন্ধে আগে কিছু করা হয়নি কেন?"

ঘনশ্যামের অফিস থেকে কোনোরকম অনুরোধ অথবা নির্দেশ আসেনি।

"ক্লায়েন্ট না চাইলে আজকাল বোম্বাইতে আমরা প্রোপোজাল দিতে দ্বিধা করি, মিস্টার ঘোষাল। আসলে আপনার কোম্পানি এবং আমাদের মধ্যে ইন্টারঅ্যাকশন অনেক বেশি হওয়া প্রয়োজন। হলিডে আইসক্রিম কোম্পানির মিস্টার ঝুনঝুনওয়ালার সঙ্গে আমি নিয়মিত ইন্টারঅ্যাকশন করি। কোম্পানির কোনো এজেন্ডা থাকুক আর না থাকুক এভরি টেন ডেজ সন্ধ্যাবেলায় আমরা ফাইভস্টার হোটেলের পুল সাইডে মিট করি ফর ইন্টারঅ্যাকশন।"

"ঝুনঝুনওয়ালা সাঁতার কাটে নাকি?" জানতে চাইলেন উদ্বিগ্ন ঘনশ্যাম।

"না, সাঁতারে ওর ইন্টারেস্ট নেই! তবে সুখকর পরিবেশে ওপেন এয়ারে বসে কিছু কথা বললে মাথায় নানা রকম বিজনেস আইডিয়া এসে যায়। মিস্টার ঝুনঝুনওয়ালা নেন ব্লাডি মেরি। আর আমি ভার্জিন মেরি।"

সর্বনাশ! এ-মহিলা বলেন কি? ভার্জিন মেরি! সানন্দা সরখেলের বোধহয় মাথার ঠিক নেই।

সানন্দা সরখেল ততক্ষণে ভার্জিন মেরির গ্লাশ ঘনশ্যামের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলছেন, "যারা কুইক গ্রোথ চাইছে তাদের নজর অজানা অচেনা নতুন মার্কেটের দিকে—ভার্জিন মার্কেট পেনিট্রেট করে ভীষণ আনন্দ পান মিস্টার ঝুনঝুনওয়ালা। ভার্জিন মার্কেট ভীষণ একসাইটমেন্ট সৃষ্টি করে ওঁর মধ্যে, উনি স্পেশাল কিক পান।"

"সেটা আবার কি জিনিস ?"

"সরকারি আপিসে কিক ব্যাক মানে ঘুষ ! কিন্তু আমাদের কাছে এর মানে তো স্রেফ ধাক্কা—ঘাড় ধাক্কা নয়, মিষ্টি ধাক্কা, যে ধাক্কা আপনাকে ফিজিক্যাল সুখ দেয়।"

সানন্দা সরখেল জানালেন, "আরও পয়েন্ট আছে। যতো গভীরে প্রবেশ করবেন ভার্জিন মার্কেটের ততো নতুন নতুন কিক্ পাবেন, মিস্টার ঘোষাল।"

বিজনেসের অবস্থা সম্বন্ধে প্রাণখুলে যা খুশি তা বলবার স্বাধীনতা দিলেন ঘোষাল। মিজ্ সানন্দা সরখেল একটা কার্ড থেকে পয়েন্টগুলো খতিয়ে দেখে নিলেন। তারপর দেহবল্লরী বিকশিত করে বললেন, "রিসার্চ বলছে, এস বি জি বিস্কুট এখন 'মি টু' প্রোডাক্ট হতে চলেছে।"

"সেটা আবার কী জিনিস ? আমরা এ-লাইনে পাইওনিয়ার, অন্তত দিশি কোম্পানির মধ্যে। কোন্ অপরাধে 'মি টু' হতে যাবো ?"

হাসলেন সুদেহিনী মিজ্ সরখেল। তারপর বললেন, "মিস্টার ঘোষাল 'স্কুইজ' মি, আমাদের প্রোডাক্টগুলো যেন বিউটি কনটেস্টে যোগ দিয়েছে। অসংখ্য সুন্দরী ব্রান্ডের মধ্যে আপনার প্রোডাক্টও যেন বলতে চাইছে, 'আমিও আছি' ! অর্থাৎ কিনা ভাবভঙ্গিতে নানা ইঙ্গিত দিয়েও তোমার মনোহরণ করতে পারছি না। এই সিচুয়েশনে বেশিরভাগ মেয়ের সাইকোলজি ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠে, মিস্টার ঘোষাল।"

গুম হয়ে মন্তব্য হজম করে যাচ্ছেন ঘনশ্যাম। স্যান্টানের আকর্ষণ নাকি বেড়েই চলেছে। কাস্টমার খুব সুখ পাচ্ছে।

"কাস্টমার তো সেই থিন অ্যারাবুট বিস্কুট খাচ্ছে ! যা কিছু বাড়তি সুখ সব দোকানদারের মিজ্ সরখেল।"

মিজ্ সরখেল একমত হলেন না। তিনি এবার বললেন, "আমাদের ফরেন সাইকোসোমাটিক কনসালটেন্ট ডক্টর তাকামারি হাতাহাতি জাপানি হয়েও প্যারিস থেকে অপারেট করেন। উনি বলছেন, সুন্দরী মহিলাদের যত বয়স বাড়ে তত বেশি সাজগোজ প্রয়োজন হয় !"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন খরিদ্দারের সঙ্গে ব্রান্ডের সম্পর্কটা হিন্দু ম্যারেজের মত চিরকালের বন্ধন নয়।"

"মোটেই নয় অ্যাকর্ডিং টু ডক্টর হাতাহাতি। আমাদের মনে রাখতে হবে, পৃথিবীতে প্রত্যেকটা সম্পর্ক কনট্রাকচুয়াল, এক্সেপ্ট মায়ের সঙ্গে সন্তানের। ওখানে দু'পক্ষেরই কোনো চয়েস নেই। আমি কার গর্ভে জন্ম নেবো, অথবা আমার গর্ভে কে আসবে তা আমি ঠিক করতে পারি না। কিন্তু এর বাইরে সব সম্পর্ক চুক্তি থেকে শুরু হয়। কিন্তু অনেক পুরনো সম্পর্ক যাতে সময়ের স্রোতে শিথিল না হয়ে যায় তার জন্য প্রয়োজন নতুন স্বপ্নের জাল। আপনি বিজ্ঞাপন দেখুন স্যান্টানের। ওয়ান্ডারফুল অ্যাড সিরিজ চলেছে।"



গম্ভীর হয়ে অপিসে ফিরে এসেছেন ঘনশ্যাম ঘোষাল। উপেন মুখার্জিকে জিজ্ঞেস করলেন, "বিজ্ঞাপনে মোহিত হয়ে কেউ সত্যিই জিনিস কেনে, উপেন ?"

মাথা চুলকে উপেন মুখুজ্যে জিজ্ঞেস করলেন, "কেনে স্যর।"

"সনাতন সান্যাল কী এমন বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যে মানুষের মাথা ঘুরে যাচ্ছে ? বেচবে তো ময়দা আর চিনি মেশানো থিন অ্যারারুট বিস্কুট !"

"আপনার যে টিভি খুলবার ফুরসত নেই। ছোট ছেলেমেয়েদের এবং বাড়ির গিন্নিদের জিজ্ঞেস করুন, স্যান্টান সিরিজ সম্পর্কে! সবসময় জোড়ে অ্যাপিয়ারেন্স, অনেকটা মেড্ ফর ইচ আদার-এর মতন!"

"মানে?"

"মানে এই ধরুন, যে স্লোগান ইদানীং কামাল করে দিয়েছে: 'সায়েব খায়, মেম খায়' স্যান্টান থিন। তারপর টিভিতে এসেছে: 'বাবু খায়, বিবি খায়' স্যান্টান। 'রোগী খায় নার্স খায়' স্যান্টান। 'পাত্র খায় পাত্রী খায় স্যান্টান'। 'টিচার খায় স্টুডেণ্ট খায়' স্যান্টান। 'গুরু খায় শিষ্য খায়' স্যান্টান।"

"ক'দিন এসব চলবে?' জানতে চান বিরক্ত ঘনশ্যাম।

উপেন মুখুজ্যে দুঃখের সঙ্গে বললো, "শেষ নেই, স্যর। ক্রিয়েটিভ লোকের পাল্লায় পড়লে সিরিজটা অনন্তকাল ধরে চালিয়ে যেতে পারে। আপনি রাস্তার হোর্ডিং-এ আমুল মাখনের বিজ্ঞাপন দেখছেন না? সনাতন সান্যাল যদি কিছুদিন পরে তাঁর বিজ্ঞাপন হিউমারাস করতে চান তার পথও খোলা রয়েছে। 'ক্যাপটেন খায় এয়ার হোস্টেস খায়', 'চোর খায় পুলিশ খায়', 'জজ খায় আসামি খায়', 'রেফারি খায় প্লেয়ার খায়'। লাঞ্চের সময় একটু ড্রিংক করতে-করতে বম্বের বিজ্ঞাপন জগতের ক্রিয়েটিভ লোকরা বিজ্ঞাপনের যেকোনো অসম্ভবকে সম্ভব করে দেবে।"

"তুমি বলছো, লোকের এসব ভাল লাগবে?" জিজ্ঞেস করলেন ঘনশ্যাম। তাঁর মানে যেন সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।

"লোকের ভাল লাগছে স্যর। হিরো খায় হিরোইন খায়—এতেই হৈচৈ পড়ে গিয়েছে। লোকে বলছে, নামকরা সমস্ত হিরো এবং হিরোইনকে স্যান্টানের এই সিরিজে দেখতে চাই পরের পর!"

"কিন্তু এঁরা তো কেউ সনাতনের বিস্কুট খান না, উপেন। এরা হাই সোসাইটির লোক। চিত্রতারকা বলে কথা। এঁদের প্রিয় বিস্কুট হান্টলে পামার, তৈরি হয় বিলেতে।"

"তাতে কিছু এসে যায় না স্যর। চিত্রতারকাদের ভক্তরা অবশ্যই জানে এঁরা কমদামি বিস্কুট খান না। তবু ছবিতে স্যান্টান বিস্কুট খেতে দেখে তারা মজা পায়।"

স্যান্টানের ক্রমবর্ধমান বাজার ও অভাবনীয় সাফল্যের কথা ঘনশ্যামের শরীর আর নিতে চাইছে না।

এবার তিনি অফিস ঘর খালি করে দিলেন। তারপর ঘনশ্যাম ভাবতে লাগলেন, সনাতনের পৈতৃক তো কিছুই ছিল না। তবু ঝটপট কয়েকবছরের সাধনায় নিজের গোঁতে বহু টাকা রোজগার করে ফেললো সনাতন।

বাউনের ছেলে খাবারের দোকান দিচ্ছে শুনে সবাই তখন খুব হেসেছিল। একমাত্র হুটকোই তখন বলেছিলেন, "মিষ্টির দোকানে বেজায় প্রফিট, ঘনশ্যাম। তার ওপর সবটাই নগদ নারায়ণ, কেউ আজকাল ধারে মিষ্টি খায় না। যে-বিজনেসে ক্রেডিট নেই সে তো সোনার বিজনেস, ঘনশ্যাম।"

কিন্তু বিস্কুট সম্বন্ধে এতো বুদ্ধি কোথায় পেলো সনাতন? কৌতূহলী হয়ে উঠছেন ঘনশ্যাম ঘোষাল।

একটু খোঁজখবর নিতেই আসল খবরটা পেলেন। রাধারমণ রায়কে বড় পোস্টে নিয়েছেন সনাতন। বিলিতি কোম্পানি কুইন ভিক্টোরিয়া বিস্কুটের প্লানিং ম্যানেজার ছিলেন রাধারমণ। কী একটা কারণে চাকরি গেলো ওখানে। খবর পেয়েই সনাতন তাঁর বাড়ি গিয়ে রাধারমণকে নিয়োগপত্র দিয়ে এলেন। বললেন, আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সব দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে। এখন এই রাধারমণই স্যান্টান বিস্কুটের ব্রেন।

রাগ করতে গিয়েও রাগ করতে পারছেন না ঘনশ্যাম। সুযোগটা তিনিই নিতে পারতেন।

চাকরি থেকে রিজাইন দিয়েই রাধারমণ যোগাযোগ করেছিলেন ঘনশ্যামের সঙ্গে। কিন্তু যা মাইনে চাইলেন তা ঘনশ্যামের কাছে বেশি মনে হলো। সুযোগ বুঝে দরদাম শুরু করলেন ঘনশ্যাম। ঘনশ্যামের পিতৃদেবেরও ওই স্বভাব ছিল। বারগেন না করে কখনও কিছু কিনতেন

না। ঘনশ্যাম নিজেও যেকোনো পারচেজের সময় দুটো পয়সা দাম না কমাতে পারলে আনন্দ পান না।

রাধারমণ রায় মাইনে কমাবার প্রস্তাব মন দিয়ে শুনলেন, তারপর ভেবে দেখি বলে সেই যে চলে গেলেন আর এলেন না। খবর পেয়েই সনাতন সান্যাল ঝপ করে তুলে নিয়েছে মহামূল্যবান এই লোককে।

ছোট্ট একটা কাগজের স্লিপে পয়েন্ট লিখলেন ঘনশ্যাম। "কোনো জিনিস পছন্দ হলে নিয়ে নেবে, বেশি দরদাম করবে না।"

একটা কৌটোর মধ্যে সযত্নে কাগজটা রেখে দিলেন ঘনশ্যাম। এই কৌটোতে ঘনশ্যাম তাঁর ছেলের জন্যে নানা সাজেশন জমা করে রাখেন। বাপের ভুল যাতে ছেলেও না রিপিট করে তা দেখবার জন্যে টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কারা কত চেষ্টা করেন। এইভাবে প্রত্যেকটা খ্যাতনামা ব্যবসায়ী পরিবারের এক-একটা ফিলজফি গড়ে ওঠে। ঘনশ্যাম জানেন, বাবা তাঁকে বেশি স্বাধীনতা দিতে চাইতেন না। অনেকদিন ধরে স্রেফ পিতৃদেবের হুকুম তামিল করে করে মগজে মরচে পড়ে গিয়েছিল। বাবার অকাল মৃত্যুর পরে হঠাৎ স্বাধীনতা পেয়ে তার সম্পূর্ণ সুযোগ নেওয়া যায়নি, ঘনশ্যামের সমস্ত শরীরে তখনও ঝিনঝিনি ধরে আছে, ওই অবস্থায় ইচ্ছে করলেই তড়াং করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ানো যায় না।

ঘনশ্যাম নিজে এই ভুল কিছুতেই করবেন না। সময় থাকতে থাকতে পরবর্তী প্রজন্মকে মাঠে নামিয়ে দেবেন উইথ ফুল ফোর্স। বলবেন, "যে ভাবে খুশি দৌড়ও। রিস্ক নাও নির্ভয়ে। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে যতো খুশি আছাড় খাও, আমি হয়তো তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারবো।"

আরও একটা মডেল ভাল লেগেছে ঘনশ্যামের। বিখ্যাত এক বিজনেস হাউসের কর্তা ছেলের হাতে দায়িত্ব তুলে দিয়ে বলেছিলেন, এখন থেকে যেমন খুশি বিজনেস চালাও, আমার মতামত নেবার প্রয়োজন নেই। তবে প্রয়োজন মনে করলে আমার পরামর্শ নিতে পারো, কিন্তু একটি শর্তে। সেক্ষেত্রে আমি যা মতামত দেবো তা মান্য করতে হবে। ফেলে দেওয়া চলবে না।

এবার মেননকে ডেকে আরও কয়েকটা চিঠিপত্তর ডিকটেশন দিলেন ঘনশ্যাম। ইংরিজি চিঠি লেখা এখন জলভাত, অথচ একসময় ইংরিজিতে কী ভয়ই ছিল। বিবেকানন্দ ইস্কুলে লেখাপড়া করে ভক্তি শেখা গিয়েছে, কিন্তু ইংরিজি ভাষা ও বিজনেস ম্যানার তেমন শেখা যায়নি। ভাগ্যে মাস্টার রেখে এই ইংলিশ কমার্সিয়াল করসপনডেন্স আয়ত্ত করেছেন ঘনশ্যাম।

ঘনশ্যাম শুনেছেন সনাতনও খুব ভাল চিঠিপত্তর লেখে। নিশ্চয়ই কারও কাছে তালিম নিয়েছে। না জানাটা অপরাধ নয়। অপরাধ শেখার চেষ্টা না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা এবং একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে যাওয়া।

বেশ কিছু চিঠি জমা হয়ে রয়েছে। অনেকগুলো ফ্যাক্স মেসেজের মোকাবিলা করলেন ঘনশ্যাম। মানুষ এ যুগে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, ডাকে চিঠি পাবার ধৈর্যও নেই ; ফ্যাক্সই নতুন যুগের বাহন হয়েছে। চটপট চিঠি যাচ্ছে, চটপট উত্তর আসছে। নিজের বাড়িতেও ফ্যাক্স বসিয়েছেন ঘনশ্যাম। যস্মিনকালে যদাচার ! তা ছাড়া উপায় নেই।

আরও কয়েকটা চিঠির উত্তর দিতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু মাঝে-মাঝে সনাতন সান্যালের মুখটা ভেসে উঠছে। মানুষটার মধ্যে অমন দুর্জয় প্রাণশক্তি ছিল তা কে জানতো ? বাঙালদের একটু বেশি গোঁ হয় শুনেছিলেন ঘনশ্যাম। কিন্তু সেই প্রথম যখন একই ক্লাসের পড়ুয়া সনাতনকে বাড়ি নিয়ে গেলেন তখন কে বুঝেছিল এতদূর জল গড়াবে ?

মানসচক্ষে নিজের অতীতকে দেখতে পাচ্ছেন ঘনশ্যাম। বিবেকানন্দ ইস্কুলে নিচু ক্লাশ থেকেই হুটকো পড়তেন ঘনশ্যামের সঙ্গে। সেই ছোটবেলা থেকেই হুটকো যাতায়াত করতেন বন্ধুর বাড়ি। মায়ের ফেভারিট পুত্রবন্ধু এই হুটকো। বাড়ির সর্বত্র তার অবাধ গতিবিধি। এ-বাড়ির কোনো ঘটনা তার অজানা নয়।

আর সনাতন ইস্কুলে এলো ক্লাশ নাইন থেকে। স্বয়ং হেডমাস্টারমশায়

এসে তাকে ক্লাশে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। ভারি মিষ্টি দেখতে ছিল সনাতন, যেমন ফর্সা, তেমন মাধুর্যময় মুখমণ্ডল। আইডিয়াল 'নদের নিমাই' চেহারা! হেডস্যর বললেন, "পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছে। ফরিদপুর ইস্কুলে পড়েছে। সেখানে ভাল ছেলে ছিল, দেখা যাক এখানে তোমরা ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারো কি না।"

এই সনাতন ফরিদপুরে থেকেও হুটকোর মতন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্ত। ওদের বংশে কে যেন তিরিশ বছর আগে সন্ন্যাসী হয়ে মিশনে যোগ দিয়েছেন। তাই ঠাকুরের হাওয়া বইছে সংসারে সনাতনের জন্মের আগে থেকে। সনাতনের ব্যক্তিত্ব, সনাতনের বাচনভঙ্গি, সনাতনের উচ্চাশা সব কিছু মোহিত করেছিল ঘনশ্যাম অ্যান্ড কোংকে। ভক্তি থাকলেও, সনাতন সেই বয়সেও ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল। তখন তার একমাত্র লক্ষ্য পড়াশোনায় ভাল করা।

এই ভাল ছেলেটিকেই ঘনশ্যাম একদিন বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন, "মা, আমার এই বন্ধু হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় অঙ্কে আশি এবং ইংরিজিতে সত্তর পেয়েছে।"

মা এমন ভাল ছেলে দেখে খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। ছেলেটিকে বলেছিলেন, "মা বাবার মুখোজ্জ্বল করো বাবা, তাঁদের দুঃখ ঘোচাও। দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে আসতে কত কষ্ট হয়েছে ওঁদের। তোমাদের দাঁড়াতে দেখলে তাঁরা সুখী হবেন।"

না শুধু বাড়ির কথা ভাববেন না, সনাতনের অন্য অনেক কথাও মনে পড়ছে।

সনাতন সান্যাল এক সময় হুটকোর মতনই থিয়েটারের ভক্ত ছিল। ঘনশ্যাম শুনেছেন, এখন সে থিয়েটারে যায় না। তবে বোধহয় জীবনটাই থিয়েটার হয়ে গিয়েছে।

বাদলবাবু স্যর নিজেও বলতেন, জীবনটাই নাটক। তার অর্থ জীবনে অপ্রত্যাশিত অনেক কিছু ঘটে যায়, যেমন নাটকে ঘটে। আচমকা কিছু না ঘটলে নাটক কখন জমে না। জীবনেও তাই বোধ হয়।

ঘনশ্যামের মনে হলো, আসলে সনাতন নিজেই নাটকের নায়ক হয়েছে। যা ঘটবার নয় তাই ঘটাতে পারছে জীবনে।

এইবার পুরনো দিনের কথা স্মরণ করে হেসে ফেললেন ঘনশ্যাম। সাংসারিক নাটকে তখন ঘনশ্যামের কোনো ভূমিকা ছিল না। যা কিছু দাপট সব পিতৃদেব সুখবিলাসের ওপর। বাবাও কল্পনা করতে পারেননি, এমন হবে।

লাজুক বাঙাল সনাতন যে নিজের গোঁয়ে বিজনেসে নেমে এইভাবে ভাগ্যস্রোতকে পাল্টে দেবে তা ছিল প্রত্যাশার অতীত।



টেলিফোন তুলে দু'একটা এস টি ডি করলেন ঘনশ্যাম। তারপর আর একটা কল করতে যাচ্ছেন ঠিক সেইসময় অপ্রত্যাশিত কল এলো।

"হ্যালো হ্যাদা, হাউ আর ইউ ?"

এ সংসারে ঘনশ্যামকে হ্যাদা বলে ডাকবার লোক বেশি নেই। এ যে মেঘ না-চাইতে জল।

"গলা শুনেই বুঝলে কী করে, হ্যাদা ? বহু বছর তো আমার শ্রীমুখে উচ্চারিত কথামৃত শোনোনি।" ওধার থেকে হুঙ্কার ছাড়লেন হুটকো হালদার।

"হুটকো !" বন্ধুর পাত্তা পেয়ে ফোনেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ঘনশ্যাম। "তুমি কোথা থেকে ?"

"কোথা থেকে আবার ! এই মর্ত্যভূমি থেকে, এখনও ওপারের টিকিট কাটতে পারিনি, ঘনশ্যাম।"

"ওপারে যাবার জন্যে টিকিট কাটতে হয় না, হুটকো। সময় হলে দূত এসে ধরে নিয়ে যায়।"

"তুমি কি ভেবেছো, ঘনশ্যাম ? আন্দাজ করছো, আমি নরকে যাবো ? শোনো, আমরা যাঁর নিরাপদ আশ্রয়ে আছি তাঁর দলের কাউকে মৃত্যুর পরে কষ্ট পেতে হবে না। দলবল নিয়ে আমাদের কুণ্ডু স্পেশাল ড্যাং ড্যাং করে ভববন্ধন ছিন্ন করে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে যাবে। আমাদের আলাদা-আলাদা করে টিকিট আছে কি না তাও কেউ যাচাই করে দেখবে না।"

খুব ভাল লাগছে ঘনশ্যামের। হুটকোর সঙ্গে কথা বলার আনন্দই অন্যরকম ! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ওপর পুরো বিশ্বাস নিয়ে ভক্তিরসের পান্তুয়া হয়ে ভবসাগরে ভাসছে।

"হুটকো তুমি কলকাতায় ফিরে এসেছো এবং এখানে পাকাপাকি থাকবে তা ভাবতেই পারছি না ! হুটকো যদি পারো তো আজই চলে এসো।"

বিস্কুট সমিতির সেক্রেটারি অপেক্ষা করছেন ঘনশ্যামের জন্য। সমিতির কাগজপত্তর নিয়ে সভাপতির সঙ্গে আলোচনার জন্যে সপ্তাহে দু'দিন সেক্রেটারিমশাই আসেন।

চিন্তাহরণ চ্যাটার্জি মাথা নিচু করে বললেন, "কাগজে আমাদের ছবি অপ্রকাশিত থাকার ব্যাপারে তোলপাড় করেছি, স্যর। পাঁউরুটি সমিতির সেক্রেটারিকেও ফোন করেছিলাম। শুনলাম, পাবলিসিটির ব্যাপারটা সমিতি লেভেলে হ্যান্ডল হয়নি। খোদ প্রেসিডেন্ট সায়েব মিস্টার সনাতন সান্যাল প্রচারের সব দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন।"

"কোনো প্রেসিডেন্টের এতো সময় থাকে না, চিন্তাহরণ।" শান্তভাবে মতামত প্রকাশ করলেন অপ্রসন্ন ঘনশ্যাম ঘোষাল।

"না স্যর, কোনো গ্রেটম্যানই নিজের পাবলিসিটি নিজের হাতে করেন না। জে আর ডি টাটা নিশ্চয়ই নিজের হাতে স্টিলও বানান না, ট্রাকও তৈরি করেন না, তাজমহল হোটেলে রান্নাও করেন না। কিন্তু টাটা গ্রুপের সব কাজে, সব প্রোডাক্টে তাঁর অদৃশ্য গোল্ডেন টাচ্‌ থেকে যায়।"

ঘনশ্যাম শুনলেন, পাউরুটি সমিতির প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্যে বিশেষ এজেন্সির লোক রেখেছেন।

"কী যুগ এলো! হুটকোকে বলতে হবে, ভগবানের কাছে দরবার করার জন্যেও এবার থেকে লোক পাওয়া যাবে।"

চিন্তাহরণ বললেন, "কোনো একটা স্পেশাল ইভেন্ট এজেন্সি ওঁদের কাজটা করছে। আজকাল কতরকম যে এজেন্সি হয়েছে। বিজ্ঞাপন এজেন্সি, জনসংযোগ এজেন্সি, নেমন্তন্ন এজেন্সি, অনুসন্ধান এজেন্সি, আরও কত কি। টাকাওয়ালা ব্যস্ত মানুষের কাজের বোঝা হাল্কা করে দেবার বিভিন্নরকম ব্যবস্থা আর কি!"

চিন্তাহরণ তাঁর কাজকর্ম দ্রুত সেরে ফেললেন। তিনি বুঝতে পারছেন, প্রেসিডেন্টের মনমেজাজ আজ তেমন ভাল নয়। তিনি নিজেই বললেন, "খবরের কাগজের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ রাখা প্রয়োজন।"

"যোগাযোগ রাখতে কে আপনাকে বারণ করেছে?" গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন ঘনশ্যাম। তারপর নিজের ব্যাঙ্কের কাগজপত্তর নিয়ে বসলেন ঘনশ্যাম ঘোষাল।

ব্যাংকের ঋণের ইনস্টলমেন্ট পেমেন্ট সামনে। অথচ হাতে তেমন টাকা নেই। "যাদের কাছে টাকা পাওনা তারা কী করছে?" ঘনশ্যাম ডেকে পাঠালেন চীফ আকাউনটেন্টকে।

"কোম্পানির দেনাদাররা সব কোথায় উধাও হলো?" গম্ভীরগলায় জানতে চাইলেন ঘনশ্যাম ঘোষাল।

"কেউ দিতে চায় না প্রাণ ধরে। ধার শোধ না-করার মধ্যে নেশা আছে।"

"পরের ধনে যদি পোদ্দারি করা যায়, তবে কে টাকা শোধ দেবে, মুখুজ্যেমশাই ? টাকা আদায়ের জন্য কসরত করতে হয়। তাগাদা না থাকলে মানুষ কেন নড়েচড়ে বসবে ?"

এই সময় হুটকো হালদার সশরীরে ঘনশ্যামের অফিসে উপস্থিত হলেন। কতদিন পরে দুই বন্ধুর দেখা !

"ঘনশ্যাম ! তুমি অনেক পাল্টেছো। অ্যাদ্দিনে ঠিক যেন পিতৃদেবের জেরক্স কপি হয়ে দাঁড়িয়েছো--সেই পাতা চুল, সেই গলায় সোনার মফচেন, সেই ভাগলপুরী সিল্কের পাঞ্জাবি, সেই নিউকাট জুতো। মায় চশমার ফ্রেমটার স্টাইলও যে বদলায়নি। সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।"

ঘনশ্যাম হাসলেন। "তুমি অবাক করে দিলে হুটকো। তোমার বয়সও বাড়েনি, ওজনও বাড়েনি। শুধু জুলপিতে একটু পাক ধরেছে।"

পুরনো বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে হুটকো বললেন, "ঘনশ্যাম, তুমি আমাদের গর্ব। বাঙালিদের মধ্যে টপ বিজনেসম্যান হবার স্বপ্ন দেখেছো এবং সেই মতো কাজ করে চলেছো। কত বড় বিজনেসম্যান হয়েছো তুমি ভাবা যায় না।"

হাতের কাজগুলো ঝটপট সেরে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ঘনশ্যাম।

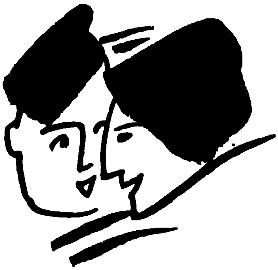
"*এই একটা ইমপর্টান্ট আইটেম পেনডিং রয়েছে। খরিদ্দার বহুদিন* পাওনা টাকা দিচ্ছে না, অথচ আমাদেরও টাকা প্রয়োজন। প্রেমনিবাস কোম্পানিকেই কাজটা দিয়ে দিই, ওরাই আদায় করুক।"

হুটকো হালদার বললেন, "বম্বেতে টাকা আদায় করে দেবার কয়েকটা কোম্পানি হয়েছে। সায়েব কোম্পানিরাও তাদের কাজ দেয়। তবে এইসব কোম্পানি গুণ্ডা পোষে। কোম্পানির নিয়োগপত্র পেলে তারা দেনাদারের জামাজুতো পর্যন্ত গায়ের জোরে কেড়ে নেবে।"

ছুটকো বললেন, "সবচেয়ে বিপদে পড়ে যারা কিস্তিতে মোটরগাড়ি বা স্কুটার কেনে। কিস্তি ফেল করে মজাসে ঘুরে বেড়াবে তার কোনো উপায় নেই। গাড়ি চড়ে মনের সুখে তুমি হয়তো বোম্বাই এয়ারপোর্টে যাচ্ছো। হঠাৎ দুই মস্তান রাস্তার মোড়ে তোমার গাড়ি আটকে তোমাকে রাস্তায় নামিয়ে গাড়ি নিয়ে চম্পট দেবে। পড়ে থাকা কিস্তি জমা দিয়ে পরের দিন তুমি গাড়ি আনতে পারো। সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার অবস্থা দেখবে, কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করবার জন্যে এগিয়ে আসবে না। এজেন্সি হচ্ছে পুলিস ও আইনের সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান। এদেশে আইনের খপ্পরে পড়লে দশটা বছর হাসতে হাসতে কেটে যাবে। তাই এই টোটকা আইনের ব্যবস্থা। এজেন্সিগুলো রমরমা বিজনেস চালাচ্ছে।"

"এখানেও তাই," হাসলেন ঘনশ্যাম। গুণ্ডারা, মাস্তানরা ক্রমশই কমার্সিয়াল লাইনে চলে গিয়ে নিজেদের ট্যালেন্টের সদ্ব্যবহার করছে। হিজড়েরাও এলাইনে ভাল কাজ করছে। কিন্তু এসব কোম্পানির নাম দেখলে কিছুই বুঝতে পারবে না! ভাববে প্রেম নিবেদন করবার জন্যে কেউ প্রেমনিবাস কোম্পানি খুলে বসে আছে! ওরা দশ পার্সেন্ট কালেকশন চার্জ নেয় বটে, কিন্তু প্রয়োজনে খুনখারাপি করে দেবে নিজের দায়িত্বে। আমরা যে কোম্পানিকে রিটেনার দিয়ে রেখেছি তার নাম প্রেমনিবাস অ্যান্ড কোং। কলকাতার বড় বড় সায়েব কোম্পানির হয়ে ওরা বহুদিন কাজ করছে।"





কতদিন পরে সাধের কলকাতায় ফিরেছেন হুটকো। মনে তাঁর প্রভূত আনন্দ। কোনোদিন যে আবার এই শহরে ফেরা হবে তা ভাবতেও পারেননি।

বন্ধুকে হুটকো বললেন, "তবে কি জানো, ঘুরে ফিরে বুঝলাম, নাথিং লাইক হাওড়া। বেস্ট প্লেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।"

"ও কথা জোরে বোলো না হুটকো, এখানকার লোকে হাসবে।" রসিকতা করলেন ঘনশ্যাম। "এখানে প্রদীপের তলায় অন্ধকারের নাম হাওড়া। শহরটা নিয়ে কেউ কোনো মাথা ঘামায় না। কলকাতা শহরের গার্বেজ রুম হলো এই হাওড়া। দুনিয়ার যতো ময়লা ঠেলে দেবার জন্যেই যেন এই শহরের সৃষ্টি হয়েছিল। হাওড়ার উন্নতির কথা বললে মন্ত্রীরা পর্যন্ত হাসি চেপে রাখতে পারেন না।"

"হাসে হাসুক। হাওড়া কার থেকে কীসে কম যায়?"

"হাওড়াকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম না রাখলে কলকাতা শহরটাই একদিন খারাপ হয়ে যাবে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কখনও নিজের টয়লেট নোংরা রাখেন না।"

এবার অন্যপ্রসঙ্গ। ঘনশ্যামের ঝকঝকে তকতকে নতুন অফিস দেখে হুটকোর সত্যিই আনন্দের শেষ নেই। বললেন, "কী দেখে গিয়েছিলাম, আর কি বিরাট বিজনেস ফেঁদেছো ব্রাদার।"

"ওসব বোলো না, লোকে হাসবে। বড় বড় বিজনেসম্যান কাকে বলে তা তুমি বোম্বাইতে নিশ্চয়ই দেখে এসেছো। আমরা চুনোপুঁটি।"

"বললেই হলো ঘনশ্যাম ? কতটুকু ছিল এই রাজা উডমন্ড স্ট্রিটের অফিসে যখন তুমি প্রথম এলে বাবার ইচ্ছে অনুযায়ী। ভাগ্যে এসেছিলে, বাবা তো বুঝেছিলেন তাঁর দিন ঘনিয়ে আসছে, তাই একটু অসময়ে তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলে নিয়ে গেলেন।"

"তোমার পরামর্শর কথা কখনও ভুলবো না হুটকো। তখনও তো আমাব মন পড়ে আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে।"

"আমি নিমিত্তমাত্র, ব্রাদার। ঈশ্বর চেয়েছিলেন, ব্যবসায় তুমি বড় হও। তুমিও সাধনা করেছো, বিজনেসের রহস্য বুঝেছো, মন দিয়ে লক্ষ্মীর সেবা করেছো, তাই না বড় হয়েছো। আমি তো শুনলাম কি নেই তোমার বিজনেসে ! লজেন্স, বিস্কুট, ব্রেড, গুঁড়োমশলা, কিউব সুগার, মিছরি সব তোমার মুঠোর মধ্যে।"

"বাঙালির মুঠো তো, সাইজে খুব ছোট, হুটকো। তবে টুকটুক করে বেড়েছে কাজের পরিধি।"

"ভাই তুমি সত্যিই অবাক করালে। বিস্কুট ল্যাবেনচুসের সঙ্গে সিমেন্ট, স্টিল রড্, রিয়াল এস্টেট—এসব কীভাবে মিক্স করলে ? স্বাধীনতার ঠিক আগে স্যর রাজেন মুখুজ্যের মার্টিনবার্ন গ্রুপ এই রকম ছিল। রিয়াল এস্টেট থেকে রেল, পাওয়ার হাউস, স্টিল প্লান্ট কি না-ছিল বঙ্গলক্ষ্মীর ভাণ্ডারে এবং বঙ্গসন্তানের আন্ডারে ?"

লজ্জা বোধ করছেন ঘনশ্যাম। তিনি বললেন, "উঠতির মুখে অনেক কিছু হয়ে যায়, হুটকো। একটা কাজ থেকে আরেকটা কাজের উৎপত্তি হওয়াটাই বিজনেসের নিয়ম। তুমি তো জানো, আলু পিঁয়াজের বড় কাজ বাবা করতেন পোস্তায়। তারপর পিঁয়াজে মার খেলেন। সেই পিঁয়াজ আমি স্পর্শ করি না হুটকো—না বিজনেসে, না খাওয়ার টেবিলে। চিড়ের স্পেকুলেশন করে সে-যাত্রায় কারবার রক্ষে করা গেল। ভেবেছিলাম এরপর বিগ সাইজে মুড়কিতে যাবো। একসময় বাঙালির বড় প্রিয় খাদ্য

ছিল। এ যুগের মডার্ন ছেলেমেয়েদের অবশ্য মুড়কিতে কোনো আগ্রহ নেই। তা ঠাকুর দয়া করলেন, হাতের গোড়ায় কমদামে পেয়ে গেলাম একটা লজেন্সের কারখানা। সেই কারখানা আমি কতগুণ বাড়িয়েছি ভাবলে নিজেরই আশ্চর্য লাগে। পরে আমি আরও লজেন্সের কারখানা করেছি—নানা জায়গায় ছড়িয়েছি। সেই সময় মনে পড়লো আমাদের ইস্কুলে সবসময় বিস্কুট-লজেন্স এক সঙ্গে বলতেন হেডমাস্টারমশাই। সুতরাং আমার মাথায় ঢুকলো, হোয়াই নট বিস্কুট ? বিস্কুট থেকে ব্রেডে গিয়েছি আমরা। কিন্তু আদি বিজনেসকে আমি কখনও অবহেলা করিনি হুটকো। সব ঠিকঠাক রেখেছি। যথাসময়ে সুযোগ বুঝে হাত দিয়েছি সিমেন্টে এবং আয়রন স্টিলে। এ দুটো থাকলেই একটু বাড়ি তৈরির লাইনে যেতে বাসনা হয়। সুতরাং কিছুটা নাক গলিয়েছি রিয়াল এস্টেটে। শুধু সিমেন্ট বালি ইটে তো বাড়ি হয় না হুটকো, জমি তো চাই। জমি জোগাড় করা এ যুগে সহজ কাজ নয়। সারাক্ষণই জমির দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। তবে আমি জানি, বিস্কুটের বিজনেসই আমার বর্তমান লক্ষ্মী। এর বাড়ের কোনো সীমানা নেই। কোটি কোটি লোকের দেশ এই ভারতবর্ষ। মাসে সবাই যদি দশ টাকার বিস্কুট খেতে আরম্ভ করে তা হলে বছরে ক'হাজার কোটি টাকা হয় তা হিসেব করো ! বিলিতি কুইন ভিক্টোরিয়া বিস্কুটের শেয়ারের লেনদেন দেখো—দাম তাল গাছে চড়ে বসে আছে। হয়তো হান্টলি পামারও কোনোদিন এখানে এসে হাজির হবে।"





হুটকোর সঙ্গে আজ অনেকক্ষণ গল্প করার সাধ ঘনশ্যামের। প্রয়োজনে ওকে পাকড়াও করে বাড়ি নিয়ে যাবার পরিকল্পনা রয়েছে। পুঁটুকেও একটা মজার সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে।

স্বামীর যতো বন্ধু আছে তার মধ্যে এই হুটকোকেই গৃহিণীর সবচেয়ে পছন্দ ছিল। কিন্তু তারপর তো সব যোগাযোগ ভেঙেচুরে গেলো—চাকরি নিয়ে হুটকোকে কলকাতা ছাড়া হতে হলো। এমন একটা লোক কলকাতায় কাজ পেলো না, অথচ লাখ লাখ লোক বাইরে থেকে এসে এখানে রুজিরোজগার করছে।

হুটকোর অবশ্য সে জন্য দুঃখ নেই। তিনি বললেন, "যে যেমন ভাগ্য করে এসেছে, ভাই। একটা চাকরি পেয়ে যে শেষ পর্যন্ত কর্ম জীবনটা ম্যানেজ হয়েছে এইটাই তাঁর অসীম দয়া।" হুটকো বলে চললেন, আমারও ভাই কর্মজীবনে উন্নতি হয়েছে। কট্টর কেরানি হয়ে ছোট্ট অফিসে ঢুকেছিলাম উড বি শ্বশুরের থ্রু দিয়ে। কিন্তু শ্বশুর তো চাকরিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে আর সাপোর্ট দেননি। নিজের চেষ্টায় অ্যাসিসটেন্ট এবং হেড অ্যাসিসটেন্ট হয়েছি। লাস্টে পৌঁছলাম জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট লেভেলে। বুড়ো বুড়ো লোকের পাশে জুনিয়র শব্দটা লিখলে কেমন একটু অস্বস্তি লাগে, কিন্তু অফিসে সব সহ্য হয়ে যায়।

গিন্নিও খুশি, যখন চাকরির পর্ব শেষ তখন ভূতপূর্ব কেরানির ওয়াইফ বলে পরিচয় দিতে হচ্ছে না। মেয়েটারও ভাল বিয়ে হয়েছে, ভাই। বম্বেতেই। ওরা বেঁচেবর্তে থাক! আমাদের পেনসন নেই—হবে শুনেছিলাম, কিন্তু কোম্পানির আর্থিক অবস্থা শেষ দিকে ভাল রইলো না। পি এফ, গ্র্যাচুইটি, লিভ এনক্যাশমেন্ট এটসেটরা এবং একটা ফ্রি হেলথ ইনসিওরেন্স পকেটে পুরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছি ভাই। নবাবী না করলে এবং বেজায় বড় অসুখ না করলে কর্তা গিন্নির নমো নমো করে চলে যাবে। বাজে খরচের মধ্যে এস টি ডির দোকানে গিয়ে মেয়েকে একটু বম্বেতে ফোন করা। তাও রাত দশটার পরে, যাতে খরচ কম লাগে।

ঘনশ্যাম কোনো কথা শুনলেন না। জোর করে নিজের ফোন থেকেই মেয়ে এবং বাবার যোগাযোগ ঘটালেন। এ-কথাও ভাবলেন হুটকো এখনও বেশ অ্যাকটিভ রয়েছে।

এরপর হুটকো উঠে পড়লেন। সরল মনেই জানালেন, তাঁর পরবর্তী গন্তব্যস্থল সনাতন সান্যাল। টেলিফোনে ওখানেও হুটকো কথা বলে রেখেছেন।

ঐ নামটা শুনে ঘনশ্যাম যে একটু গম্ভীর হয়ে উঠলেন তা লক্ষ্য করলেন হুটকো, কিন্তু ব্যাপারটার গভীরে গেলেন না।

হুটকোর বিদায়কালীন মন্তব্য : "সনাতনটাও আমাদের গর্ব! কী ছিলো কী হলো। স্রেফ মনের জোরে।"

কোনোরকম বিরূপ মন্তব্য করলেন না, কিন্তু মনটা কেমন খচে গেলো ঘনশ্যামের।

নিজের অফিস ঘরে বসে সেক্রেটারি মেননের পাঠানো স্লিপের দিকে এবার নজর দিলেন ঘনশ্যাম। সমস্ত কর্তব্যগুলো সময় অনুযায়ী সাজিয়ে একটা সরু স্লিপে টাইপ করা থাকে। এইটাই মাঝে মাঝে সংশোধন এবং পরিবর্তন করে নতুন স্লিপ আসে। স্লিপে একটা গোপন

ইঙ্গিত রয়েছে, হাজরার সঙ্গে যোগাযোগ। এর অর্থ, একটা গোপন এবং জরুরি কাজ রয়েছে, হাজরাদের বিস্কুট কারখানাটা কেনা। প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার হাজরা গত হয়েছেন কয়েক মাস আগে। তারপর থেকেই হাজরা বিধবার সঙ্গে ঘনশ্যামের গোপন কথাবার্তা চলছে। ঘনশ্যাম প্রায়ই হাজরা বিধবাকে বোঝাচ্ছেন, যা দিনকাল, বিস্কুটের ব্যবসা চালানো কঠিন হবে। বিজনেসের একটা দামও দিয়েছেন ঘনশ্যাম। মনে হচ্ছে আজ হয়তো কথাবার্তা পাকাপাকি হবে। ট্যাংরাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে উপেন নিঃশব্দে সব কাগজপত্তর ঠিক করে রেখেছে।

কিন্তু ওখানে আচমকা ধাক্কা খেলেন ঘনশ্যাম। টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাওয়াতে মিসেস হাজরা আজ তেমন আগ্রহ দেখালেন না। বললেন, আরও ক'টা দিন যাক। অমবস্যাটা কাটুক।

উপেন খবর আনলো, সনাতন সান্যাল পরপর ক'দিন হাজরানিবাসে যাতায়াত করছেন। এইসব নেগোসিয়েশনে ওঁর স্পেশাল ক্ষমতা। ওঁর সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেনের কথাবার্তা বললে গ্রানাইট পাথরও নরম হয়ে যায়।

চাপা বিরক্তিতে ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে আরম্ভ করলেন ঘনশ্যাম ঘোষাল।

এবার বিরক্তভাবে তিনি ডাকলেন বিস্কুটের ম্যানেজারকে। "শুনুন মশাই, বিস্কুটের প্রোডাকশন আমি কমাতে পারবো না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবার জন্যে বাবা আমার জন্ম দেননি। প্রোডাকশন না করলেও কারখানার ওয়ার্কারদের মাইনে দিতে হবে আমাকে। চা দিতে হবে, টিফিন দিতে হবে, ই এস আই দিতে হবে, বোনাস দিতে হবে, প্রভিডেন্ট ফান্ড দিতে হবে, গ্র্যাচুইটি দিতে হবে, এমনকি বোনাস এবং বেড়াতে যাবার খরচ দিতে হবে।"

লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলেন ম্যানেজার। ঘনশ্যাম এবার বললেন, "বাড়তি ডিসকাউন্ট পেয়ে পেয়ে দোকানিদের অভ্যেস খারাপ হয়েছে বলছো। বেশ, নো পরোয়া! স্যান্টান যা সুবিধে দিচ্ছে তার ডবল দেবো

আমি। হিসেবটা এবার কষে ফেলো। দরকার হলে ময়দা কেনার সময় যে কমিশনটা আমরা অন্য অ্যাকাউন্টে কোম্পানি থেকে বার করে নিই সেটা নেওয়া বন্ধ করো। জামাই আদরে রাখো খুচরো দোকানদারকে। পরের জন্মে যেন কারখানার মালিক না হই, স্রেফ রিটেল সেক্টরে থাকি পরের টাকায় বিজনেসের সুখ ভোগ করার জন্যে।"

বেশি ডিসকাউন্ট দিলে এখনকার মতন সমস্যা সমাধান হয় এস বি জি বিস্কুটের। কিন্তু ময়দার অ্যাকাউন্টের কাঁচা টাকা থেকেই তো বিভিন্ন সরকারি ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেকটরদের, তাঁদের কর্তাদের এবং ছোট বড় নেতাদের নিত্যভোগ দেওয়া হয়। দেবতার পাওনাগণ্ডা হঠাৎ বন্ধ হলে যে আগুন জ্বলবে তা ইঙ্গিতে বুঝতে পারলেন ঘনশ্যাম।

এই ঘুষের ব্যাপারটা উপেন মুখুজ্যে খুব ভাল বোঝে। উপেন বলে, "ঘুষের নানান রকমফের আছে। কোথাও পাঁচশ টাকার সুবিধে পাওয়ার জন্যে পাঁচটাকা সেলামি কারও হাতে গুঁজে দিতে হয়। কোথাও স্রেফ পেটি হাঙ্গামা কমাবার জন্যে গ্রিজমানির প্রয়োজন হয়। তবে বেশির ভাগ ঘুষ আসলে টিপ্‌স-এর মতন, দুনিয়াভোর এই বকশিসের দোর্দণ্ডপ্রতাপ। আসল ভয়, যেখানে ঘুষের দেবতা নিজেই পার্টিকে তাড়া করেন। মোটা অঙ্কের সেলামি না দিলে সেখানে ভীষণ বিপদ উপস্থিত হতে পারে। সেই কবে পূর্বপুরুষরা বলে গিয়েছেন, জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করা নিরর্থক। কিন্তু কোনো কোনো নদীতে কুমিরের সংখ্যা বড্ড বেশি, কত কুমিরের সঙ্গে তুমি ভাব করবে ? তাই তো শহর থেকে বিজনেসম্যান কমে যাচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে কুমিরের সংখ্যা। মনে রাখতে হবে উপোষী কুমিরের মেজাজ ভীষণ খারাপ, তার খপ্পরে পড়লে আর রক্ষে নেই।"

উপেন চায় না আগ বাড়িয়ে কুমিরের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। সামান্য ভোগ যেখানে নিয়মিত নিবেদন করা হচ্ছে, তা বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

কিন্তু এসব সব সমস্যার কথা পরে ভাববেন ঘনশ্যাম। আপাতত সনাতন সান্যাল ডিসকাউন্টের যে দাবার চাল দিয়েছেন তার যোগ্য উত্তর দেওয়া যাক।

ম্যানেজারকে ঘনশ্যাম ঘোষাল বললেন, "তিনদিন পরে আমি বাজারে বেরুবো। যেন কোনো দোকানে না দেখি স্যান্টান বিস্কুট হি হি করে হাসছে, আর আমার পিতৃদেবের নামে তৈরি এস বি জি কাঁদছে।"

বাড়ি থেকে ফোন এলো। ঘনশ্যাম গৃহিণী তাঁর স্বামীর খোঁজ করছেন, "কখন বাড়ি আসছো ?"

"একটু সময় লাগবে পুঁটু। দু'একটা জরুরি সমস্যার সমাধান করে যেতে হবে। এ দেশে যা করবে তার কিছু ভাল ফল এবং কিছু মন্দ ফল হবেই। বিজনেস প্রায়ই এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে যে এগোলেও অসুবিধে, পিছলেও অসুবিধে।"

পুঁটুর রসিকতা : "যে যেখানে আছে, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকুক।"

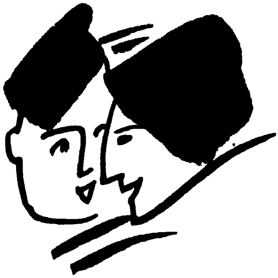
"সে উপায় নেই পুঁটু। যেখানে আছো সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে থাকলে যারা এগোচ্ছে তারা তোমাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে !"

ঘনশ্যাম জানালেন, "গুড নিউজ, আমার বাল্যবন্ধু হুটকো কলকাতায় ফিরে এসেছে।"

সে খবর পুঁটু ইতিমধ্যেই পেয়েছে। হুটকো নিজেই ফোন করেছিলেন। পুঁটু পরামর্শ দিলো, "তোমার এই বন্ধুর সঙ্গে রোজ কিছুক্ষণ গল্পগুজব করবে, তাহলে তোমার ব্লাড প্রেসার কমে যাবে।"

ফোন নামিয়ে রাখলেন ঘনশ্যাম। পুঁটু জানে না, এখন তার স্বামীকে বিস্কুট বাজারে নতুন খেলা দেখাতে হবে। দু'একটা আচমকা বিজনেস কেনাকাটা করে দেখাতে হবে এস বি জি বিস্কুট এখনও জিন্দা রয়েছে।





হুটকো ইতিমধ্যেই সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। বহু কাজের মধ্যে সে ডুবে রয়েছে।

"সনাতন, তোমার হলো কি? তোমার বাঙাল উচ্চারণ তো দেখছি একেবারে ডবল রিফাইন হয়ে গিয়েছে!"

মজা পেলো পুরনো বন্ধু সনাতন সান্যাল। "চেষ্টা করে করতে হয়েছে, ভাই হুটকো। ভাষাটা সড়গড় না হলে বিজনেসে বেশ অসুবিধে হয়। অবশ্য এ-পাড়ায়, বাঙাল বলো ঘটি বলো বিজনেসে কারও কঙ্কে নেই। এ-পাড়ায় তুমি মাড়ওয়ারি ল্যাংগোয়েজে খাতাও রাখতে পারো—সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পর্যন্ত হাসিমুখে মেনে নেবে।"

"খাতা আগে, না বিজনেস আগে?" রসিকতা করে প্রশ্ন তুললেন হুটকো।

"আরে বাবা, যে কোনও ধনীর কাছে, খাতাটাই বিজনেস। প্রোডাকশন, কোয়ালিটি, কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন এসব নিয়ে এদেশে কস্মিনকালে কেউ মাথা ঘামায়নি। এখানে কমোডিটি মার্কেটের হাজার বছরের পুরনো নিয়ম চালু রয়েছে—মাল যখন বেশি সাপ্লাই হয়ে যায় তখন হুট করে দাম কমিয়ে দাও, দরকার হলে পরের লাভে নিজের নাক কাটো, আর যখন ভাটার সময়, যখন চাহিদা আছে অথচ সাপ্লাই

নেই তখন গুছিয়ে নাও। পুরনো লোকসানের শোধ তুলতে মোটেই দ্বিধা কোরো না। মনের আনন্দে টুপাইস কামিয়ে বাড়িতে বউয়ের জন্যে হীরে-পান্না নিয়ে যাও।"

"সনাতন, এসব সাবজেক্ট তুমি এমন সরলভাবে বুঝলে কী করে? তুমি বলছো, বাণিজ্যে বেশি জোগান মানে খারাপ সময়, আর শর্ট সাপ্লাই মানে ভাল সময়।"

হাসছে সনাতন। বন্ধুকে সে বললো, "এতোদিন তাই তো ছিল। অনাবৃষ্টি হবে, অঘটন কিছু ঘটবে, নিদেন ট্রেন বা ট্রাক চলাচল হঠাৎ বন্ধ থাকবে, বড় ব্যবসাদাররা তখন মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে আসবে। তুমি দোষ দিতে পারো না হুটকো। যখন সেই ব্যবসাদাররা ঘরের খেয়ে বোনের মোষ তাড়িয়েছে, মোটা মোটা টাকা মুখ বুজে লোকসান দিয়েছে তখন কেউ তার খবর রাখেনি।"

"সনাতন, তুমি বাংলায় প্রাঞ্জল ভাষায় এ-বিষয়ে বই লেখো। রাতারাতি বেস্ট সেলার হয়ে যাবে।"

আবার হাসলো সনাতন। বন্ধুকে বললো, "কাগজের কালি শুকোবার আগেই এখানকার বিজনেস আবহাওয়া পাল্টে যায়, হুটকো। বড়বাজারের হোলসেল মার্কেটে কখনও মেঘ, কখনও রোদ, তবে না এই ওঠানামার বাজার নিজের ভঙ্গিতে এবং নিজের খেয়ালে চলছে।"

হুটকো বললেন, "ভিতরের রহস্যটা ফাঁস করে বিজনেসে ঢুকিয়ে দাও ডজনে ডজনে আমাদের হাওড়ার সোনারচাঁদ ছেলেদের। ওরা টুপাইস করুক। জানো সনাতন, বোম্বাইতে বসবাস করে আমি এইটুকু বুঝেছি যে সাচ্ছল্যের অভিজ্ঞতা না থাকলে একটা জাত কখনও প্রশান্ত হতে পারে না। এই যে আমাদের পারস্পরিক হিংসে, অপরকে নিন্দে, অপরের সাফল্যে অকারণ সন্দেহ, এসবের পিছনে রয়েছে আমাদের দারিদ্র্য, আমাদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। আমাদের এখানে স্রোতের অভাব। বদ্ধ জলে মশা ডিম পাড়ে, কচুরিপানা নিজের রাজত্ব জাঁকিয়ে বসে। অথচ পুনায়, আমেদাবাদে, বরোদায় এমন কি রাজকোটে এসব

পাবে না। ওখানে সবার চোখের সামনে সাফল্যের একটা নমুনা বলো নিদর্শন বলো রয়েছে।"

নিজের কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সেরে ফেলে সনাতন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে গল্পে বসলো।

হুটকো জিজ্ঞেস করলেন, "বোস ঘোষ মিত্তির দাস হাজরা এমন কি সাহারা বিজনেসে ইদানীং কিছু করতে পারলো না কেন ?"

"কপাল খারাপ বলে। এদের মগজে বুদ্ধি নেই এমন তো নয়।" সনাতন নির্দ্বিধায় উত্তর দিলো।

তারপর একটু ভেবে সনাতন বললো, "বাঙালিদের মুশকিল হলো, সবাই জীবনের সবক্ষেত্রে নিরাপত্তা চায়। কোনো বিজনেসের ওঠানামা আমাদের ভীষণ অপছন্দ, অল্পতেই আপসেট হয়ে পড়ি। অথচ ওঠানামা না থাকলে এই বড়বাজার, সোনাপট্টি, লোহাপট্টি, শেয়ার বাজার, কিরানা বাজার সব উঠে যাবে !"

"এইভাবেই চিরকাল চলেছে এবং চলবে তুমি বলছো ? এখানে এসে দেখছি, কেরানিগিরি কাজটাও কলকাতা থেকে উঠে গিয়েছে। বেয়ারার কাজটাও তো থাকবে না শুনছি। তাহলে কটা স্থানীয় ছেলে আর প্রাইভেট সিকিউরিটি গার্ড অথবা কুরিয়ার অফিসের মেসেঞ্জার হবে ?"

"হুটকো, দেশের জন্যে আমি অত ভাববার সময় পাই না। আমি নিজের কাজই সামলাবার সময় করে উঠতে পারি না, অপরকে কি লেকচার দেবো ?" বললো সনাতন সান্যাল।

একমত হলেন না হুটকো। বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে সোজা মন্তব্য করলেন, "ওসব বাজে কথা রাখো সনাতন। তুমি আমাদের জাতের গর্ব হবে একদিন। অতি সামান্য অবস্থা থেকে নিজের সাধনায় কোথায় উঠেছো তুমি। লোকে বলছে তুমি আরও উঠবে।"

"আমার মতন পুঁচকে ব্যবসাদার এই কলকাতা শহরে ডজন ডজন পাবে, হুটকো। কোনোরকম সাধনা নয়, স্রেফ কপালের জোরে এ-

লাইনে পায়ের বুড়ো আঙুল রাখবার স্থান পেয়েছি।"

"সনাতন, আট ইঞ্চি দশ ইঞ্চি চওড়া কপাল নিয়ে কত লোক বেকার অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের এই বাংলায়, কিন্তু নট্ কিচ্ছু রেজাল্ট। তুমি নিশ্চয় কোনো স্পেশাল মন্তর-টন্তর পেয়েছো এবং তাকে কাজে লাগিয়েছো।"

"আমি কাজে ডুবে আছি, হুটকো। আমি পাঁচ ঘণ্টা ঘুমোই। আর দুপুরে আধঘণ্টা চোখ বন্ধ করে আপিসে বসে থাকি। আমি পড়েছি, আমাদের বয়সে এর বেশি বিশ্রাম দরকার হয় না। অথচ ছোটবেলায় কী ঘুম ঘুমোতাম !"

"তোমার মনে আছে, ইংরিজির ক্লাসে ঘুমোবার জন্যে গুঁইরামবাবু সেবার ক্লাস থেকে বার করে দিয়েছিলেন।" হুটকোর পুরনো কথা মনে পড়ে গেলো।

সনাতন জানালো, "তবে প্রতিদিন কিছুক্ষণ আমি ভবিষ্যৎ ভাবনার জন্যে রেখে দিই। মাথা না ঘামালে, নতুন আইডিয়া পুরনো বাজারে প্রয়োগ না করলে তুমি জিতবে কী করে ? বিজনেসেও বিশেষ একধরনের জপতপ প্রয়োজন হয় হুটকো। এখানে যে জেতে সে জানে সে কী খেলায় নেমেছে এবং কখন তাকে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে হবে।"

হুটকো বললেন, "ঈশ্বরের সাধনায় কোনো প্রতিযোগিতা নেই, সনাতন। যার ইচ্ছে সেই তাঁকে পেতে পারে। কিন্তু বিজনেসটা দেখছি রণক্ষত্রে। একজনের জয় মানেই আরেকজনের পরাজয়।"

সনাতন একটু অবাক হয়ে গেলো। বললো, "ব্যাপারটা এইভাবে কখনও ভেবে দেখিনি, হুটকো। জিততে হবেই, এই নেশায় এগিয়ে চলেছি। আমার কী হবে, অপরের কী হবে, এসব ভাবলে বিজনেস হবে না, হুটকো।"

বহুদিন পরে দেখা। দুই বন্ধুর কথা যেন শেষ হতে চায় না। একটা লাইফ-টাইম কেটে গিয়েছে। গোড়ায় চিঠিপত্তর বিনিময় হতো। তাও

বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হুটকো আজ প্রাণভরে বাণিজ্যের দুর্গমপথে পুরনো বন্ধুর জয়যাত্রার কথা শুনতে চান।

সনাতন কিন্তু শান্তভাবেই রয়েছেন। কথাবার্তার কোথাও অতিমাত্রায় আনন্দ অথবা অত্যধিক চঞ্চলতা নেই। বন্ধুর অনুরোধে সে একটু একটু ভাবছে আর মাঝে-মাঝে উত্তর দিচ্ছে।

সনাতন একসময় বললো, "বিজনেসে আমরা হৃদয়কে লুকিয়ে রেখে মাথাটাকে খাটাবার চেষ্টা করি। আর তুমি আমার কাছে ফিনান্সের প্রাত্যহিক রিপোর্ট না চেয়ে বিজনেস ফিলজফির সন্ধান করছো। আমার মনে হয়, আজকালকার যেসব বিখ্যাত আমেরিকান বা জাপানি টাইকুন ম্যানেজমেন্টের বই লিখছেন তাঁদের কোনো রচনাতেই সব গোপন তথ্য দেওয়া নেই। নিয়ম বাঁচিয়ে যতটুকু লেখা যায় ততটুকুই আছে। আসলে মার্ডারের মতন, বিপ্লবের মতন বিজনেস আজও গোপনীয়তায় ঢাকা। কেউ তার খুঁজে পাওয়া নির্ভেজাল সত্যটুকু প্রকাশ করবে না। সবার জানাজানি হয়ে গেলে সেই সত্য আর মার্কেটপ্লেসে কাজ করবে না।"

এরপরে সনাতন সবিনয়ে বন্ধুকে জানাতে চাইলো, নতুন কোনও তথ্য সে আজও আবিষ্কার করেনি। পুরনো ব্যবসাদারদের মনের কথাগুলোকেই নিজের জীবনের মূলধন করে নিয়েছে। তার পরে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সেগুলো অনুসরণ করে চলেছে। সনাতন কখনও ঠকেছে, কখনও লাভ করেছে ; সমস্ত প্রচেষ্টা কখনও নিস্ফল হয়েছে, আবার কখনও প্রথম চেষ্টাতেই সৌভাগ্যের শিকে ছিঁড়েছে।

সনাতন একসময় হুটকোকে মনে করিয়ে দিল, "ক্লাসে হেডমাস্টারমশাই বিবেকানন্দ থেকে উদ্ধৃতি দিতেন, জন্মালি তো দাগ রেখে যা। মানুষকে এইভাবে ক্ষেপিয়ে তোলার কোনো মানে হয় না। পাঁচশ কোটি মানুষের এই পৃথিবীতে কে কত দাগ রাখবে ? কে তোমাকে মনে রাখবে ? কিন্তু হেডমাস্টারমশায়ের ওই কোটেশনটাই মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। আমার বাবাও নানা স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু পূর্বপাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা উকিল নতুন জায়গায় নিজের প্রতিভা দেখানোর তেমন সুযোগ

পেলেন না। কোনোক্রমে প্রাণধারণ করে গেলেন, তিনিও বলতেন, ওকালতিতে, ডাক্তারিতে এযুগে তেমন কিছু হবে না। যা হবে তা বিজনেসে। সেই কতোকাল আগে ঋষিরা বলে গিয়েছেন, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। বিজনেসের রহস্য বাবা পড়েছিলেন ডেভিড ওগিলভির বইতে। ফাইন্ড এ গ্যাপ এন্ড ফিল ইট। খোঁজখবর নিয়ে বিজনেসে একটা ফাঁক আবিষ্কার করো। তারপর সেই ফাঁকটা বোঝাই করে ফেলো। তবে মনে রাখতে হবে, ফাঁকটা খালি চোখে সব সময় ধরা পড়ে না। প্রকৃতির কোথাও বোধহয় পুরো ফাঁক থাকে না, কোথাও পর্দাটা একটু পাতলা হয়ে থেকে বিভ্রম ঘটায়। সেই পাতলা পর্দা ফুটো করলেই ফাঁক বেরিয়ে আসে।"

"ঠিক বলেছো সনাতন। জন্মেছো, হাসিখুশি থাকো, রুজিরোজগার করো, ঘরসংসার করো, তারপর যথাসময়ে মরে মুক্তি পাও। স্রেফ দুনিয়াতে দাগ কাটার জন্যে পাগলের মতন ছোটাছুটি করে কোনও লাভ নেই।"

কিন্তু কী আশ্চর্য, সনাতন এবার যেন বন্ধুর সঙ্গে একমত হচ্ছে না। পুরনো দিনের পুরনো কোনো কথা যেন তাকে জ্বালা দিচ্ছে।

সনাতন বলছে, "হুটকো, এই পৃথিবীতে একটা দাগ না থাকলে ঠিক চলে না। বাপের দাগ, না হয় নিজের দাগ একটা কিছু প্রয়োজন। অর্ডিনারি লোক হয়ে মাথা নিচু করে বিশ্বসংসারে ঘুরে বেড়ালে মানুষ তোমাকে অকারণে দাগা দিতে চাইবে!"

মনে হয় পুরনো কোনও আঘাতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে সনাতনের।

একটু ভুল করে ফেলেছিলেন হুটকো। না বুঝে হঠাৎ ঘনশ্যামের প্রসঙ্গ তুলে ফেলেছেন।

হুটকো তাঁর স্বভাব মতন হুড়মুড় করে সংগৃহীত খবরাখবর প্রকাশ্যে পরিবেশন করেছিলেন। "ওদের খুবই হ্যাপি ফ্যামিলি সনাতন। ঘনশ্যাম গৃহিণী পুঁটুরানি তো লক্ষ্মীবিশেষ—সারাক্ষণ পক্ষীমাতার মতন স্বামীকে এবং সমস্ত ফ্যামিলিকে আগলে রেখেছেন। পুত্রটিকে চোখে

দেখিনি এখনও। কিন্তু তার ছবি দেখে তাজ্জব। খুব স্মার্ট বয় আমাদের এই অশোক ঘোষাল। সুদর্শন পুরুষ। মুখে হাসিটি সারাক্ষণ লেগে আছে। স্পেশাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স করতে আমেদাবাদে গেছে—ওখানকার বিজনেস স্কুল তো এখন ইন্ডিয়ার সেরা। ওই স্কুলে বিজনেস ফ্যামিলির জন্যে নাকি মাঝে মাঝে স্পেশাল কোর্স শুরু হয়। অন্য কোর্সে ঢোকা তো লটারি পাওয়ার মতন।"

বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন সনাতন। হুটকো না বুঝেই বললেন, "তবে কি জানো, হ্যাপি ফ্যামিলি হয়েও ঠিক হ্যাপি নয়। চাঁদের একদিকে আলো আর একদিকে অন্ধকার। ঘনশ্যামের একমাত্র বোন সঙ্ঘমিত্রার ট্রাজেডি ওরা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কম বয়সে বিধবা হয়ে মেয়েটার জীবনটা কেমন হয়ে গেলো। ঘনশ্যাম বালিগঞ্জে নিজের বাড়ির পাশেই ওকে একটা ছোট বাড়ি করে দিয়েছেন। আমি দেখা করতে গেলাম। নিষ্ঠাবতী বিধবা, সেদিনই কাশী যাচ্ছে। বছরের বড় অংশ সঙ্ঘমিত্রা গয়া-কাশী-বৃন্দাবন-হরিদ্বার করে বেড়ায়। ঘনশ্যাম দুঃখ করছিল ঠিকুজিকুষ্ঠির রাজযোটক করে মিত্রার কি বিয়ে যে হলো।"

হুটকো লক্ষ্য করলেন, সনাতন যেন বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলো। সে অন্য বিষয়ে কথা বলতে চাইছে। কোথায় কে কবে স্বামী হারিয়ে বিধবা হয়েছে তার হিসেব সনাতন সান্যাল রাখতে চাইছে না।

এরপরেও অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু সনাতন যেন একটু অন্যমনস্ক। একটু সন্দেহ করলেও ব্যাপারটা ঠিক আন্দাজ করতে পারলেন না হুটকো হালদার।

অনেকদিন পরে সনাতন নিজের মনেই জিজ্ঞেস করলেন, "শুধু বুদ্ধি, শুধু দূরদৃষ্টি থাকলেই কি জীবনে উন্নতি করা যায়? না একটা কিছু প্রয়োজন যা পিছন থেকে তোমাকে আচমকা ধাক্কা দেয়?"

বন্ধুকেই প্রশ্ন করে বসলো সনাতন, "আচমকা ধাক্কাটা কি জীবনে নিতান্তই প্রয়োজন, হুটকো?"

হুটকো সরলভাবে স্বীকার করলেন, "আমার তো পরের ধনে পোদ্দারি, সনাতন। আমি তো লাইফে অরিজিন্যাল কিছু ভাবিনি বা করিনি—না ইস্কুলে, না কলেজে, না কর্মজীবনে। গয়ংগচ্ছ করে জীবনটা ছেঁদো পথ ধরেই কোনোক্রমে এগিয়ে গেলো। হয়তো এইভাবেই জীবন শেষ হবে। আমার মধ্যে অ্যামবিশন নেই, কাউকে ছাড়িয়ে যাবার বিশেষ তাগিদ নেই। তবে বুঝতে পারি, আচমকা ধাক্কায় কেউ কেউ উল্টে পড়ে, হাঁটু ভাঙে, আর কারুর বন্ধ ইঞ্জিন ঠেলার চোটে স্টার্ট হয়ে হঠাৎ ছুটতে শুরু করে।"

কথাগুলো সনাতনের খুব ভাল লাগলো। মনে মনে সে ভাবলো, গাড়ি স্টার্ট হবার পরে অনেক ড্রাইভার সামনের গাড়িকে ওভারটেক করবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে।

সনাতন আজ সুযোগ পেয়ে অনেক বছর পরে বন্ধুকে প্রশ্ন করছে, "হুটকো, ওভারটেকটা কি ভাল জিনিস ?"

হুটকো বেশ বিপদে পড়ে গেলেন। বললেন, "কখনও ভাল, কখনও মন্দ। প্রতিযোগিতার চাপে গাড়ির কখনও স্পিড বাড়ে, তাড়াতাড়ি লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে যাওয়া যায়, আর কখনও আদৌ পৌঁছনো সম্ভব হয় না, রাস্তার বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘটে ওভারটেকের সময়, তুমি দেখো।"

সনাতনের পারিবারিক প্রসঙ্গে আসতে চাইলেন হুটকো। অনেকদিন কোনো খবরের আদানপ্রদান নেই।

সনাতন জানালো, "তুমি তো জানো, আমি বাঙাল, আমার স্ত্রী ঘটি। আমার মাথায় গোঁ চেপেছিল, ঘটি মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবো না। তা ভগবানের দয়ায় অসুবিধে হয়নি। যদিও তখন হাসাহাসি হতো, বাঙাল-ঘটি যোটক কখনও সাকসেসফুল হয় না, কিন্তু এখন এতোদিন পরে দেখা যাচ্ছে, বাঙালের সঙ্গে ঘর করে ঘটি সব সময় ফুটো হয় না ! তবে বলতে পারো, একজন পাগলের সঙ্গে সংসার করেছে অচলা। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখো। আর আমার মেয়ের নাম তো পত্রযোগে তুমিই দিয়েছিলে।"

হুটকো ভাবতে লাগলেন, লাইফে এক-একটা স্টেজ আসে যখন নো ওভারটেকিং। হুটকো শুধু বললেন, "সনাতন, মনে রাখতে হবে, আমাদের বয়স হচ্ছে। আমাদের প্রত্যেককেই এখন যে যার গ্যারেজে ফিরে যেতে হবে।"

খুব মজা পেলো সনাতন। সে বললো, "চমৎকার মন্তব্য করেছো, হুটকো। বাড়ি ফিরেই অচলাকে বলতে হবে। গ্যারেজ কথাটা চমৎকার লাগিয়েছ হুটকো।"

হুটকো বললেন, "ছোটবেলায় বলতাম, গোধূলি বেলায় গোয়ালে ফেরা। এখন ওসব কথা লোকে নেবে না। সোজা সত্যটুকু হলো, যে যেখান থেকে বেরোয় দিনের শেষে তাকে সেখানে ফিরে আসতে হয়। দৌড় দিয়ে যতই এগিয়ে যাবার চেষ্টা করুক, প্রত্যেক মানুষের একটা পুরনো ঠিকানা থাকে।"

"তাই বুঝি ? হবেও বা।"

সনাতনকে ঠিক বুঝতে পারা যায় না। মানুষটা ভীষণ চাপা, বুঝতে পারেন হুটকো।

এবার সনাতন বললো, "জানো হুটকো, একটা পুরনো বিস্কুট কারখানা ধুঁকছে। ওটার পিছনে আমি ছুটছি।"

"বাঙালিরা অসুস্থ কোম্পানি কিনতে চায় কেন, সনাতন ?" বুঝতে পারছেন না হুটকো হালদার।

"যে সুস্থ সে নিজের গ্যারেজে ফিরবার কথা ভাবে না, হুটকো। সে শুধু এগিয়ে যেতে চায়। আর যে অসুস্থ তার বাজারদর পড়ে যায়। সে তখন সব ঝামেলা বিসর্জন দিয়ে নিজের গ্যারেজে ফিরতে চায়। এই ফেরার সময়টাই কলকারখানা ব্যবসাবাণিজ্য কেনবার শ্রেষ্ঠ সময়। অসুস্থ কোম্পানি কিনে নিয়ে, তার ঘা ধুইয়ে, মলম লাগিয়ে, ব্যান্ডেজ বাঁধিয়ে, ওষুধ খাইয়ে, ভাল করে নিয়ে নিজের কাজে লাগিয়ে নাও। এই ভাবেই তো আমি একের পর এক এতোগুলো বিস্কুট কারখানার মালিক হয়েছি। আরও হতাম, কিন্তু ওই মোগলসম্রাট ঘনশ্যাম ঘোষাল

পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি নতুন কিছু কিনি তা ওঁর পছন্দ নয়। আমি সে জন্য চিন্তিত নই। সামনের পথ রুদ্ধ দেখলে আমাকে অন্য পথ বার করে এগিয়ে যেতে হবে।"

"পুরনো কলকারখানা না কিনে নতুন বিস্কুটের কারখানা করো।" বললেন হুটকো।

"নতুন উদ্যোগে সময় অনেক বেশি লাগে, হুটকো। মাখা ভাত আর গোটা ধান এক জিনিস নয়। ওসব পোষায় যারা সাতপুরুষ ধরে বিজনেস করছে তাদের। ভগবান অনেক কিছু দিয়েছেন, ভাঁড়ার ইতিমধ্যেই বোঝাই হয়ে রয়েছে, অহেতুক ব্যস্ততার কোনও কারণ নেই। কিন্তু যারা সেলফ-মেড তাদের টেকওভার করতেই হবে। সব কিছু নিজের হাতে তৈরি করার সময় কোথায়, হুটকো ?"

এই সেলফ-মেড কথাটা সনাতনের মুখে খুব ভাল লাগলো হুটকোর। "চমৎকার বলছো, সনাতন। সত্যিই, ঠিকমতন ভেবে দেখলে, বিশ্বসংসারে কোনও কিছুই সেলফ-মেড হয় না। যে কোনো সৃষ্টির শুরুতেই পিতৃত্ব লাগে, মাতৃত্ব লাগে। আবার বাবা-মা যে সব তাও ঠিক নয়, পৃথিবীতে সফল হতে হলে অহংকেও প্রয়োজন। পুরুষকারই প্রকৃতিকে জয় করে, ভাগ্যকে বন্দি করতে পারে।"

কিন্তু এই বিজনেসের প্রকৃত রহস্যটা হুটকো একেবারে বুঝতে পারেন না। জাত ব্যবসাদার কখনও এক পুরুষের উটকো ব্যবসাদারকে ভাল চোখে দেখেন না। রাতারাতি কেল্লাফতে করার নেশায় নবাগতরা যা করার নয় তাও করতে পারে। সাধু সাবধান। অথচ এরা তৈমুর লঙ অথবা আট্টিলার মতন বাণিজ্যের সব আইন লণ্ডভণ্ড করে সবার ত্রাসের কারণ হতে পারে। এদের হাতে সবরকম সম্পদ থাকে, কেবল থাকে না সময়। তাই দ্রুততম অশ্বে আরোহণ করে সময়ের দূরত্বকে তারা পরাভূত করতে চায়। ঘনশ্যামের কাছে এর কিছুটা ইঙ্গিত পেয়েছেন হুটকো। সনাতন সান্যালের প্রতাপ ঘনশ্যাম অনেক বেশি বুঝেছেন হুটকোর তুলনায়।

এ যুগেও এখনও বাণিজ্য ও শিল্পজগতে বিত্তসন্ধানীদের কেউ কেউ এক পুরুষেই দুই পুরুষের কাজ সেরে ফেলেছে। বিত্তের রণভূমি তাদের তরবারিতে বারেবারে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। সময় তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে না বলে তারা মাঝে মাঝে অজানা আশঙ্কায় মায়ামমতাহীন হয়ে ওঠে।

নমুনা চাইছো ? এ যুগেও রয়েছে। ঘনশ্যাম দাশ বিড়লা এবং ধীরুভাই আম্বানির মধ্যে প্রকৃতিগত তফাতটা যাচাই করে দেখতে পারো। তবে গুজরাতি ধীরুভাই এ যুগের প্রত্যেকটি উচ্চাভিলাষী মানুষের সামনে যেন কর্ণসুলভ মহিমা নিয়ে উদ্ভাসিত হচ্ছেন। দরিদ্র ইস্কুলমাস্টারের সহায় সম্বলহীন সন্তান এক প্রজন্মে অসম্ভবকে সম্ভব করলেন বিত্তযুদ্ধের কুরুক্ষেত্রে। তাঁর জীবন ও কর্ম এই ভাগ্যহীন দেশের প্রতিটি বিত্তহীন বালকবালিকার পাঠ্য হওয়া উচিত।

অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন তিনি দুর্জয় উদ্যমে ও প্রতিভায়। কিন্তু সাফল্যের সিংহাসনে বসেও ধীরুভাই আম্বানির অনেক দুর্বলতা আছে, মহানুভবতার ঘাটতিও আছে, কিন্তু দুর্জয় প্রাণশক্তির অনুপস্থিতি নেই কখনও। এ দেশের উচ্চাভিলাষীরা সবাই যেন বিত্তহীন স্কুলমাস্টারের এই সন্তানটির মধ্য দিয়ে অনন্তকালের পুরুষকারকে অভিনন্দিত করছে, জানিয়ে দিচ্ছে, এই পৃথিবী যারা জয় করতে এসেছে তাদের কাছে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।





অচলার সঙ্গে দেখা হয়েছে হুটকোর। খুব ভাল লেগেছে মেয়েটিকে। ওদের মেয়েটিকেও নিজের চোখে দেখেছেন হুটকো।

অনেকদিন আগেকার রসিকতা, বাঙাল-ঘটি যৌথ উদ্যোগের নিবেদন 'বাঘ'। পূর্ব-পশ্চিমি বিবাহবন্ধন থেকে মেয়ে হলে তা বাঘিনী। কিন্তু এই অতি মধুরস্বভাবা সুনয়নটি তো কোনোক্রমেই বাঘিনী নয়—একে একমাত্র হরিণী বলা চলতে পারে! আশ্রমপালিতা হরিণীর এ দেশের বড়ই আদর, সেই ঋষি কন্বমুনির যুগ থেকে এই বেলুড় মঠ পর্যন্ত। দুনিয়া ঘুরে এসে শেষ জীবনে বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে শখ করে হরিণ পুষেছিলেন। ভদ্রলোকের যে কত রকম খেয়াল ছিল! বিশ্বটাকেই খেলাঘরের মত ব্যবহার করে, অসময়ে ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙিয়ে এবং কাঁচা ঘুম ভাঙানোর মজা দেখে, নিজেই বিদায় নিলেন বিশ্বের খেলাঘর থেকে! পিছনে রেখে গেলেন শুধু দুর্গম যাত্রাপথের সামান্য নিশানা।

কিন্তু মোদ্দা কথা হলো, ওঠ জাগো, নিজেকে খুঁজে বার করো, তারপর চরে খাও।

হুজুরে হুজুর বলবার জন্য বা অপরের এঁটো বাসন মেজে হাতে হাজা ধরাবার জন্যে তোমাকে বিশ্বসংসারে পাঠানো হয়নি, হে অমৃতস্য পুত্র। গৌর মুখার্জি লেনের দত্ত মহাশয়, যে অসীম প্রাণশক্তি নিয়ে

আপনি ধরায় এসেছিলেন, তাকে ধারণ করবার মতন শক্তিশালী শারীরিক আধার নিয়ে আপনি আসেননি, ফলে যেতো হলো অকালে।

অচলাও প্রায় ওই ধরনের এক অজানা আশঙ্কায় ভোগে। সারাক্ষণ প্রাণশক্তিতে চনমন করছে তার স্বামী, কিন্তু তাঁর শরীর কি অতো অনুগত থাকবে ? শরীরেরও তো সহ্যের সীমানা আছে।

অচলা বলে, "বলুন না বন্ধুকে, এবার একটু দৌড় কমাতে। অনেক তো হয়েছে, আর কেন ?"

কিন্তু যে একবার গতানুগতিকতার লাগাম ছিঁড়েছে সে তো সহজে স্থির হবার পাত্র নয়। অশ্বমেধের ঘোড়ার মতন সে এখন টগবগ করে নিজের লক্ষ্যের দিকে বল্গাহীনভাবে ছুটেছে।

"আর কেন ?" প্রশ্নটা শুনে হেসেছে সনাতন। "জানো হুটকো, কিছুদিন আগে লন্ডনে গিয়েছিলাম বিজনেসের কাজে। একটা দোকানের সামনে রাত্রে দাঁড়িয়েছিলাম, তার নাম হোয়াই নট ?

"ওসব ফিলজফি সায়েবদের জন্যে, সনাতন।"

সনাতন হেসে বলেছিলেন, "যথাসময়ে খবর নিয়ে দেখি ওটা নাচের দোকান ! আবার এক বুড়ি মেমসায়েব ওই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে প্রভু যীশুর হ্যান্ডবিল বিলোচ্ছে। সেখানেও লেখা, 'হোয়াই নট' ! ত্যাগে বলো, ভোগে বল সব বিষয়ে সায়েবদের অফুরন্ত এনার্জি।"

"মেমসায়েবদের ওই সীমাহীন এনার্জির কণামাত্র পেয়ে তো আমরাও বর্তে গেলাম। ওই মেমসায়েবরাই তো বিদেশের মাটিতে নরেন দত্তকে প্রাণে রক্ষে করলেন, আশ্রয় দিলেন, সেবাযত্ন করলেন, বিশ্বসভায় পাঠালেন, আবার ভারতে এসে বেলুড় মঠের জমি কিনে দিলেন, ঠাকুরের মন্দির গড়লেন, আবার কেউ কেউ প্রয়োজনে সাধুভাইদের সঙ্গে ঝগড়াও করলেন।"

অচলা বললো, "উঃ, হুটকোদা, প্রত্যেক সাধুর হাঁড়ির খবর রাখেন আপনি !"

হুটকো উত্তর দিলেন, "নরেন দত্ত নিজেও এক-আধজন মেমসায়েবকে

নিয়ে ফাঁপরে পড়েছেন। পড়ে দেখো মহিনবাবুর লন্ডনে বিবেকানন্দর কথা। একদিন আশ্রয়দাত্রী মেমসায়েবের বকুনি খেয়ে স্বামী সারদানন্দ দুঃখ করেছেন, ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট, তুষ্ট রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে! তারপর বিবেকানন্দ তাঁকে যে ভাষায় সান্ত্বনা দিচ্ছেন তা নাই বা শুনলে।"

'হোয়াই নট' কথাটা যথাসময়ে ঘিরে ধরেছে বন্ধু সনাতন সান্যালকে।

সনাতন বেশ খোজ মেজাজে রয়েছেন। বিরোধীদের হাত থেকে আজ একটা নতুন বিস্কুট কোম্পানিকে ছিনিয়ে আনতে পেরেছেন বলে।

এই কারখানা কেনবার জন্যে অনেক চেষ্টা হয়েছিল ঘনশ্যামের পক্ষ থেকে, কিন্তু ফল হয়নি। সনাতন শিখে ফেলেছেন কেমন করে কোম্পানি কেনার সময় দাবার চাল দিতে হয়। যারা ভাবে শুধু টাকার জোরেই সম্পত্তি কেনা যায় তারা এ লাইনের এবিসিডিও জানে না। সম্ভাব্য বিক্রেতাকে সর্ব বিষয়ে আশ্বস্ত করতে শিখতে হয়, তাকে সম্মান করতে হয়, টাকাটাই যে দুনিয়াতে সব নয় তা পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হয়।

এই মহিলার কাছ থেকেই দু'বছর আগে একটা কোম্পানি কিনেছিল সনাতন। দলিল সই হবার পরে সনাতন বলেছিল, "মাসিমা আপনাকে এই কোম্পানির ডিরেক্টর থাকতে হবে। সকলের কাছে আপনার পোজিসন আগে যেমন ছিল পরেও তেমন থাকবে।"

মাসিমা কোম্পানির ডিরেক্টর থাকতে রাজ হননি, কিন্তু সনাতন এই কারখানার প্রতিষ্ঠাতার জন্মদিন প্রতি বছর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছেন। মাসিমাকে সেদিন সনাতন কারখানায় নেমন্তন্ন করেছে। তাঁর হাত দিয়ে কারখানার কর্মীদের পুরস্কার বিতরণ করিয়েছে সেই এবার বিনিয়োগের হাতে হাতে ফল পাওয়া গেলো—বাড়তি টাকার লোভ দেখিয়েছেন ঘনশ্যাম ঘোষাল, তবু কাজ হয়নি। সবচেয়ে যা আশ্চর্য, পুরো টাকাটাও নগদ দিতে পারেনি সনাতন; তবু মাসিমা বিশ্বাস করেছেন সনাতনকে।



এদিকে আহত বাঘের মত আচরণ করেছেন এস বি জি বিস্কুটে ঘনশ্যাম ঘোষাল। ঘনশ্যামের ধারণা, সনাতন সান্যাল সমস্ত বাজারটাই খারাপ করে দিচ্ছে। তার ওপর কাগজে খবর বেরিয়েছে, স্যান্টান বিস্কুটের জয়যাত্রা। এদিকে ক্রমশই উৎপাদন পড়ছে ঘনশ্যামের এবং সেই হারে বিক্রি কমছে।

কাগজের হেডিং পড়লেন ঘনশ্যাম—'স্যান্টান এবার সিঙ্গাপুরে।'

বেজায় বিরক্ত হয়ে ম্যানেজার উপেনকে ডাকলেন ঘনশ্যাম। জিজ্ঞেস করলেন "উপেন কাগজওয়ালারা কি আরম্ভ করলো ? আমরা তো কবে থেকে সিঙ্গাপুরে বিস্কুট রপ্তানি করছি। আমাদের কথা তো কখনও লেখেনি ওরা।"

উপেন এই ব্যাপারটা বোঝেন না। তিনি বললেন, "যে রোগের যে ডাক্তার। এই সব কাজ সনাতন সান্যাল নিজের হাতে করেন না। ওঁর মেয়ে দেখাশোনা করে পাবলিসিটি।"

"মেয়ে ?" অবাক হয়ে গেলেন ঘনশ্যাম। "নিজের মেয়েকেও বিজনেসে টানছে সনাতন !"

এই মেয়ের নাম যে বিভাবরী এবং সে নাম যে অনেকদিন আগে তাঁর প্রাণের বন্ধু হুটকো প্রবাস থেকে পাঠিয়েছিলেন তা জানলে আরও কষ্ট পেতেন ঘনশ্যাম।

নিজের বিজ্ঞাপন এজেন্সির সঙ্গেও অনেকক্ষণ কথা বললেন ঘনশ্যাম।

তারা বললো, "রপ্তানির খবরটা দিয়ে আপনিও কাগজে বড় বড় করে বিজ্ঞাপন করুন। প্রয়োজনে হাফ পেজ নিন। লোকে বুঝুক এস বি জি বিস্কুট যে-সে প্রতিষ্ঠান নয়।"

চটে উঠলেন ঘনশ্যাম। "বিস্কুটের কোনো বিজ্ঞাপন ইদানীং স্যান্টান করেনি, তবু সিঙ্গাপুরে রপ্তানির খবরটা বেরিয়েছে কাগজে।"

ঘনশ্যামের এজেন্সি স্বীকার করেছে, এসব জনসংযোগ কোম্পানির কাণ্ডকারখানা, ক্লায়েন্টের ছবি ছাপাবার জন্যে ওরা পারে না এমন কাজ নেই। হয়তো ইন্ডিয়ান কোনো সুন্দরী চলে যাবেন সিঙ্গাপুরে, ওখানকার প্রাইম-মিনিস্টারকে টী-টাইমে স্যান্টান বিস্কুট পরিবেশন করতে।"

জনসংযোগের কথা এবার থেকে নিজেই ভাববেন ঘনশ্যাম। কিন্তু এস বি জি বিস্কুটের বিজ্ঞাপনে কামড় চাই।

"পোচিং বিজ্ঞাপন করবেন, মিস্টার ঘোষাল ? উইথ নকিং কপি ?" প্রশ্ন করলো বিজ্ঞাপন এজেন্সির সুভদ্রা সিং।

"সে আবার কি জিনিস ? পোচ তো ডিমেরই হয় !" একটু বিরক্ত কণ্ঠেই জানতে চাইলেন ঘনশ্যাম।

বিজ্ঞাপন এজেন্সির সুভদ্রা সিং এবার ফিসফিস করে কীসব কথা বললো, শুনে গেলেন ঘনশ্যাম।

সুভদ্রা উত্তর দিলো, "বিজ্ঞাপনে পোচিং আজকাল দেশে-বিদেশে আখছার হচ্ছে স্যার। একটা ব্রান্ড অন্য একটা ব্রান্ডকে প্রকাশ্যে নাম করে অ্যাটাক করছে ওপেনলি, হাটে হাঁড়ি ভাঙছে কমপিটিটরের প্রোডাক্টের।"

"খোঁজখবর করুন, রিসার্চ চালান, আমরা খোলা মনে সব বিচার করবো," নির্দেশ দিলেন ঘনশ্যাম।

তড়িৎগতিতে অনেকগুলো কাজকর্ম সেরে দুদিন পরেই এজেন্সির প্রতিনিধিরা আবার হাজির হলো হোটেলের চেম্বারে। সব রকম কেমিক্যাল

রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হয়েছে। ফুড টেকনলজিস্ট বলছে, ঘনশ্যামের বিস্কুট অত্যন্ত কম সময়ের মধ্যে মিইয়ে আসে, মুচমুচে কম থাকে। তার কারণ বেকিং-এ দামী কেমিক্যালস একটু কম থাকছে।

বিরক্ত হলেন ঘনশ্যাম। "দোকানদারের ডিসকাউন্ট বাড়বে আর আমার খরচ কমবে না তা কেমন করে হয় মিজ্ সুভদ্রা সিং ? আপনারা কী চান আমার কোম্পানিও 'সিক' হোক। এই শহরে কম বিস্কুট এবং পাঁউরুটি কোম্পানি ইদানীং লালবাতি জ্বালেনি।"

"এগজ্যাক্টলি," বললেন এজেন্সির ক্রিয়েটিভ কোঅর্ডিনেটর মিস দময়ন্তী দামানিয়া। এই জাঁদরেল মহিলা সবে মন্টিকার্লো থেকে স্পেশাল ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরেছেন। ওখানে সারাক্ষণ ব্র্যান্ডে ব্র্যান্ডে ট্যাংক ব্যাটল। দময়ন্তী বললো, "আমাদের ব্র্যান্ডের দুর্বলতাকেই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে প্রপোজড্ নিউ ক্যামপেনে। আমরা দেখাবো, আমাদের বিস্কুটে কেমিক্যাল ভীষণ কম। আর স্লোগান হবে, আর কত কেমিক্যাল শরীরে ঢোকাবেন ? তারপর লেখা থাকবে, সায়েব খান, মেম খান, তো কী হয়েছে ? আপনার শরীরটা তো কেমিক্যালসের ডাস্টবিন নয়।"

"এর অর্থ ? লোকে বুঝবে, প্রতিযোগী ব্র্যান্ডে প্রচুর পরিমাণে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক কেমক্যালস আছে। বডি কপিতে অ্যাটাক করা হবে এই মুচমুচে কুড়মুড়ে খাওয়ার দুর্বলতাকে। আফটার অল প্রথম কামড়েই যা একটু স্পেশাল কিক পাওয়া যায়, তারপর এস বি জি, স্যান্টান, কুইন ভিক্টোরিয়া এবং দিশি স্মল সেক্টরের বিস্কুট সব এক !"

"সত্যিই আপনাদের চিন্তা করবার ক্ষমতা আছে, মিজ দামানিয়া।" তারিফ করলেন ঘনশ্যাম।

খুশি হয়ে, ডিপ ব্রিদ নিয়ে মিজ্ দময়ন্তী দামানিয়া বললেন, "ইন দ্য লং রান, আমাদের চেষ্টা করতে হবে পুরনো কিছু হ্যাবিটকে নতুন ভাবে ফ্যাশনেবল করে তোলা। যেমন, আমার দাদু চায়ে ডুবিয়ে বিস্কুট খেতেন, সুতরাং মুচমুচে কুড়মুড়ে ব্যাপারটাই ছিল না।"

"কিন্তু হ্যাবিটটা তো সেকেলে। আমি এইভাবে খেতাম বলে বিয়ের পরে আমার স্ত্রী ভীষণ রাগ করলো। বললো ওটা আজকাল চলে না।" জানালেন ঘনশ্যাম ঘোষাল।

"পুরনো হ্যাবিট ফিরিয়ে নিয়ে আসা কোনো ব্যাপারই নয়। যখন পাবলিক দেখবে ফাইভস্টার ফিল্মস্টাররা এবং টপ ক্রিকেটাররা ম্যান অব দ্য ম্যাচ ট্রফি হাতে নেবার পরে চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে তবে খাচ্ছে তখনই অভ্যাসটা ফিরে আসবে। ক্যামপেনটা প্রস্ফুটিত হতে দিন একটু, তারপর দেখুন।"

ঘনশ্যাম সন্দেহ প্রকাশ করলেন, "ওইভাবে ক্রিকেটাররা এস বি জি বিস্কুট খাবে?"

"পয়সা পেলে বিষ পর্যন্ত খাওয়ানো যাবে, মিস্টার ঘোষাল। দেখলেন না, ক্যানসার হয় জেনেও কেমন মনের আনন্দে সিগারেটের নামাঙ্কিত ড্রেস পরে ওরা দলবদ্ধভাবে মাঠে নামছে? ওটা কোনো ব্যাপারই নয়। বড় জোর আমাদের কোনো নামকরা প্লেয়ারের প্রাইভেট গার্লফ্রেন্ড যে এজেন্সি খুলেছে তার মাধ্যমে যেতে হবে।"

"এই বিজ্ঞাপনে ফল হবে?" জানতে চাইছেন ঘনশ্যাম।

"ভীষণ রেজাল্ট পাবেন। স্যান্টান একসময় আপনার কাছে সারেন্ডার করবে। আপনি দেখবেন।"

কথা শুনে খুব খুশি হলেন ঘনশ্যাম। "একটা মোক্ষম ধাক্কা দেওয়া গেলো মিজ্ দামানিয়া।"

তারপর ঘনশ্যাম ডাকলেন, "বুঝেছো উপেন! বেকিং কেমিক্যালসের পরিমাণ আরও কমিয়ে দাও, বিজ্ঞাপনের খরচটাও ওইভাবে তুলবো।"

তারপর ঘনশ্যাম প্রশংসা করলেন, "মিজ্ দময়ন্তী আপনার বিদেশে ট্রেনিং সার্থক হয়েছে। আমি কতদিন থেকে ভাবছি, ওই সায়েব খায় মেম খায়, বর খায় বউ খায় ক্যামপেনের যোগ্য উত্তর মার্কেটপ্লেসে কীভাবে দেবো। আপনারা জনসংযোগের কাজ করছেন না কেন?" মিজ্ দামানিয়া খুব প্লিজড হলেন। জানালেন, এখনও ওই কাজটা ওঁরা

সরাসরি করেন না, তবে প্ল্যান আছে সেপারেট পি আর এজেন্সি খোলবার। তার আগে অবশ্যই ঘনশ্যামের সঙ্গে তিনি এবং মিজ্ সিং ইন্টার-অ্যাক্ট করবেন।

এই ইনটার-অ্যাক্ট শব্দটা কানে কেমন অদ্ভুত লাগে, বিশেষ করে যখন কোনও মহিলা বলেন। কিন্তু কী করা যাবে, যে যুগে যেমন ভাষা!

বিজ্ঞাপন বেরুলেই অনেক সময় হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়, ঘনশ্যাম শুনেছেন মিজ্ দামানিয়ার সঙ্গে। স্যান্টানের বিক্রি কমার সময়ে এস বি জি-র সাপ্লাই নিয়মিত বাড়াতে হবে, সুতরাং নতুন প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি রেডি রাখা প্রয়োজন। কিন্তু খোঁজ করতে গিয়ে ঘনশ্যাম শুনলেন, পাখি হাতছাড়া, বিধবা মহিলার সঙ্গে সনাতনের চুক্তি সই হয়ে গিয়েছে।

কলকাতায় ফিরে এসে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছেন হুটকো হালদার। ঘনশ্যাম ও সনাতন দু'জনকেই তিনি প্রাণভরে ভালবাসেন, প্রাণ থেকে চান ওদের দু'জনেরই মঙ্গল হোক, শ্রীবৃদ্ধি হোক। কিন্তু দুই পক্ষের গুলিবিনিময়ের মধ্যে যেন চোখ বন্ধ করে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হুটকো হালদার।

অথচ দু'জনেই ছাড়ছে না হুটকোকে। ঘনশ্যামের স্ত্রী বিভাবতী অনুরোধ করলেন, "হুটকোদা মাঝে মাঝে ওঁকে একটু সান্নিধ্য দেবেন। আপনার সঙ্গে থাকলে ওঁর মনের গুমোট কেটে যায়, আমরা বুঝতে পারি।"

ঘনশ্যাম নিজেও প্রতিবাদ করেননি। বলেন, "দুনিয়াটা যেন কেমন হয়ে উঠেছে, হুটকো। সবাই ধান্ধায় ডুবে রয়েছে। কারও সঙ্গে কথা বলে আনন্দ নেই। সুধাংশুবাবু, হিমাংশুবাবু এঁরা সব বৃথা জীবনটা নষ্ট করে গেলেন, দুনিয়ার কোনও উন্নতি হলো না।"

"মানুষ আরও খারাপ হতে পারতো, ঘনশ্যাম," সান্ত্বনা দেন হুটকো। "মানুষ কিন্তু ক্রমশই ভাল হচ্ছে, তুমি ভালভাবে নজর করে দেখো।"

"সত্যিই তুমি পারো, হুটকো। তুমি ধরে বসে আছো, ঠাকুর একবার ধরাধামে এসেছিলেন, কথা দিয়ে গিয়েছেন, আর একবার আসবেন।"

"কর্তার না এসে উপায় আছে ? উপর থেকে তো সব নিজের চোখে দেখছেন ! বেলুড় মঠ থেকে রোজ সকাল-সন্ধ্যায় তো ভোগ নিবেদন করা হচ্ছে। হুট করে চলে আসবেন কোন্ দিন।"

"আমি চেষ্টা করি, হুটকো, কিন্তু কিছুতেই এই সব লীলায় বিশ্বাস করতে পারি না। পুনর্জন্ম ব্যাপারটাই আমার কাছে ঘোলাটে। তাই চেষ্টা করে নিজের বিজনেসটা এমন শক্ত ভিতের ওপর রেখে যাবো যে কোনও শত্রু বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু এমনই পোড়া কপাল, শত্রুতা ছাড়া, রেষারেষি ছাড়া এদেশে বিজনেস হয় না।"

এরপর ঘনশ্যাম আবার অনুরোধ করেছেন হুটকোকে তাঁর কাছে চাকরি নিতে।

"হুটকো, ঘরের টাকা ভেঙে ভেঙে কেন খাবে ? শরীর স্বাস্থ্য ভাল রয়েছে, আমাদেরও প্রয়োজন রয়েছে তোমাকে, ঠাকুরের নাম নিয়ে এখানে কাজে নেমে পড়ো।"

সন্তুষ্ট হলেন না হুটকো, "চাকরি মানে আবার খোঁটায় বাঁধা পড়া। বেশি টাকা আমার বউও চায় না। সিগারেট খাওয়া ছেড়েছি, মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়েছি, ঘি সহ্য হয় না, মিষ্টি খাওয়া ডাক্তারে বারণ করেছে, বাড়ি ভাড়া লাগে না, মেয়ের শ্বশুর দশ লাখপতি, বুড়ো হিসেব করে করে প্রতিটা পাই জমিয়ে গিয়েছে। সুতরাং ওখানে টাকা ঢালবার প্রয়োজন নেই। আরও অর্থ নিয়ে কী করবো ঘনশ্যাম ?"

এ রকম অদ্ভুত কথা আজকাল কেউ ভুলেও বলে না, অভিজ্ঞ ঘনশ্যাম বোঝেন। হুটকো বললেন, "আমার মেয়ে সব জানে। আমার কুষ্টিতে আছে আগে আমার গিন্নী টাঁসবে, তারপর আসবে আমার ডাক। যাবার সময়ে অবশিষ্ট কিছু থাকলে আমার মেয়ে বেলুড় মঠে নগদ দিয়ে আসবে, সাধুদের ভাণ্ডারার জন্যে। ওখানে সারা জন্ম ধরে পাত পেতে অনেক খেয়েছি, ঘনশ্যাম।"

ঘনশ্যাম এরপর বেরিয়ে পড়েছেন ক্যালকাটা সিমেন্ট সোসাইটির মিটিঙে। ওই প্রতিষ্ঠানে তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট। সিমেন্ট ডিলারের মনে যে সুখ নেই তা হুটকো তাঁর বন্ধুকে দেখেই বুঝতে পারেন। সরকারের ধারণা, ডিলাররা সিমেন্টের নাম করে পাবলিকের কাছে টাকা লুটছে।

"যেখানেই গভরমেন্ট সেখানেই প্রবলেম, হুটকো। খরিদ্দার-দোকানদারের সম্পর্কটা বিষময় করে তুলছেন ওঁরাই। আমি প্রেসিডেন্ট হলে ব্যাপারটা সমাধানের চেষ্টা করবো। কিন্তু সেখানেও বাধা। ভাইস প্রেসিডেন্ট যাতে টার্মের শেষে প্রেসিডেন্ট না-হতে পারেন তার জন্য গোপন ষড়যন্ত্র চলেছে। হুটকো, তুমি আমার পাশে সারাক্ষণ থাকলে এই ব্যাপারগুলো দেখতে পারবে।"

এর পরে বেশ মজা হয়েছিল। সনাতনের অফিসেই হুটকো শুনলেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে তাঁর সিমেন্টের দোকানগুলো এখন খুব ভাল চলছে। সিমেন্টের ডিলারশিপ পাওয়া বেশ শক্ত। তাই সনাতন কোথাও কোথাও পার্টনার হয়ে ঢুকেছেন। অবশ্য নাম-কা-ওয়াস্তে পার্টনার, আসলে মালিক, আস্তে আস্তে অন্য শ্রীখণ্ডি পার্টনারকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সর্বময় কর্তা হয়ে বসবেন।

সনাতন তার বন্ধুকে বলেছিল, "সিমেন্ট, লোহা এসবের ওপর চিরকাল সরকারি খবরদারি থাকবে না, তুমি দেখে নিও। তখন যোগ্য ব্যবসায়ীরা ওখানে যোগ্য খেলা দেখাবে। এখন তো জমিদারদের রাজত্ব— ওঁরাই সমিতি চালাচ্ছেন, জানো হুটকো। আমাকে এবছরেই প্রেসিডেন্ট করবার জন্যে বেশ কয়েকজন উৎসাহ দেখাচ্ছেন।"

"প্রেসিডেন্ট হয়ে কী লাভ সনাতন? শ্বশুরবাড়িতে প্রেস্টিজ বাড়ে?"

হা-হা করে হাসলো সনাতন। "শ্বশুরবাড়িই ফিনিশড— সব মরে হেজে গিয়েছে। নেহাত গরিব বলেই অতোদিন আগে ঘটি হয়েও বাঙালের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। সনাতন সান্যাল সিমেন্ট সভার

প্রেসিডেন্ট হলে আপাতদৃষ্টিতে লাভ নেই, বরং গাঁটের কড়ি খরচ হবে। মেম্বারদের চা-খাওয়াও, পার্টি দাও, নিজের তেল পুড়িয়ে সমিতিতে যাও, অঢেল সময় দাও। কিন্তু পদাধিকার সূত্রে অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ হবে, মাননীয় মিনিস্টাররাও আলাপ করবেন, তুমি সমাজের কেষ্টবিষ্টু হয়ে উঠবে। তারপর বুদ্ধি থাকলে সেই সম্পর্কটা কাজে লাগিয়ে বিজনেস আরও বাড়াও। "বিচক্ষণ মাড়ওয়ারিদের কাছে বহুচেষ্টায় এসব গুপ্ততথ্য সংগ্রহ করে, চলেছি, ছুটকো। বেলুড়মঠে তোমরা তো কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ ছাড়া আর কোনও সাবজেক্টে নো-হাউ দেবে না।"

ছুটকো একবার ভাবলেন রিকোয়েস্ট করেন, "সনাতন এ বছর তুমি সিমেন্ট সমিতিতে অমনভাবে প্রত্যাশার নজর দিও না।" কিন্তু আবার ভাবলেন অযাচিত পরামর্শ ঠিক মতন কাজ করে না।

শেষ পর্যন্ত ইঙ্গিতে কথাটা পাড়লেন ছুটকো। কিন্তু কোনও ব্যাপার অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করার সময় নেই ব্যস্ত ব্যবসায়ী সনাতনের। তিন পুরুষের আরব্ধ কাজ এক পুরুষে সারতে না পারলে সেলফ-মেড ব্যবসাদার মনে সুখ পাবে না। বিজনেসের প্রথম ডিভিশন লিগে প্রমোশন না-পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই সনাতনের মতন মানুষদের।

এরপর সনাতনও অবাক করলো ছুটকোকে। বললেন, "গিন্নি, কন্যা এঁরা সবাই মন্ত্রণা দিচ্ছেন তোমাকে সারাক্ষণের জন্যে নিজের কাছে টেনে নিতে। সবার ইচ্ছে তুমি এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে একটা চাকরি নাও। আমি চাই তুমি এই কোম্পানিতে এসো। আমি বড় হতে চাই, তুমি পাশে থাকলে আমার স্বপ্ন সফল হবেই। ছুটকো, দুতিন বছরের মধ্যে বিস্কুট, পাঁউরুটি এবং সিমেন্টে আমি এক-নম্বর হবো। তারপর সনাতন বন্ধুকে বুঝিয়েছিল, "এই ওভারটেক করার হাঙ্গামাটা তখন উঠে যাবে।"

একটু থেমেছিল সনাতন। তারপর বন্ধুকে বুঝিয়েছিল, "আমার স্টাইল অন্য, ছুটকো। ঘনশ্যাম ঘোষালের মতন আমি পিঁপড়ের পশ্চাৎদেশ টিপে গুড় মুছে নিই না। যাকে আমি মূল্যবান মনে করি

তাকে সুখে-সাচ্ছন্দে রাখবার জন্যে আমি কি করি দেখো। তোমার নিয়োগপত্র লিখে আমি সই করে দিয়েছি। খালি আছে শুধু মাইনের জায়গাটা। কত টাকা হলে তোমার পোষায় ওটা তুমি ভর্তি করে নেবে, আমাকে কেবল চিঠির একটা কপি দিয়ে দেবে।"

হুটকো হালদার এমন বিপদে কখনও পড়েননি। একসময় চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। চাকরি জোটেনি। ঠাকুরের ইচ্ছেয় চলে যেতে হয়েছে দূর দেশে। আর এখন তিনি মজা দেখছেন। একদিনে দুদুটো চাকরির লোভ দেখাচ্ছেন।

হুটকো অতো সহজে অর্থের ফাঁদে পা দিচ্ছেন না। তিনি বললেন, "সনাতন, "আমি শ্রেফ কুঁড়েমি করার জন্যে কলকাতায় ফিরে এসেছি। আমাকে একটু ভেবে দেখার সময় দাও।"

"তুমি আমাকে অবাক করলে হুটকো। ব্ল্যাংক চেকও তুমি নিতে চাইছো না। কিন্তু আমার মেয়ে বলেছিল, উনি কি রাজি হবেন ? এস বি জি বিস্কুটকে হুটকো কাকা অত ভালবাসেন।

চুপ করে রইলেন হুটকো। এস বি জি, স্যান্টান কোনো প্রতিষ্ঠানই তিনি চিনতেন না, তিনি ভালবাসতেন তাঁর ইস্কুলের দুই সহপাঠীকে। তাঁর ইস্কুলের দুই বন্ধু ঘনশ্যাম ও সনাতনকে। তারা যে প্রতিযোগিতায় নেমে জেতার নেশায় পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে সম্পর্কের এই পর্বে পৌঁছে যাবে তা কে জানতো ?

ভাগ্যে হুটকো গৃহিণীরও পয়সায় কোনো বিশেষ টান নেই, যদিও ঠাকুর নিজেই বলেছেন, টাকা হলো গেরস্তর বুকের রক্ত। অমন যে অমন পরমহংসদেব, তিনিও বউয়ের জন্যে সোনার বাজু গড়িয়ে দিয়েছেন। ভক্ত মথুর যখন তাঁর সহধর্মিনীকে সোনার গহনা উপহার দিয়েছেন তাঁকে বাধা দেননি। কিন্তু হুটকো হালদারের বউ কখনও গহনার জন্যে বিরক্ত করেননি স্বামীকে। বরং মেয়ের বিয়ের সময় শরীরের সমস্ত গহনা খুলে দিয়েছেন হাসিমুখে।

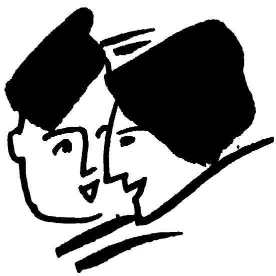
প্রতিদ্বন্দ্বী দুই বন্ধুর কথা ভাবতে লাগলেন হুটকো। ওরা বিজনেসে

নেমে মালক্ষ্মীর মন জয় করে ঘরে দুটো পয়সা এনেছে যে তো আনন্দের কথা। বাঙালিরা ওদের দুজনের দিকেই তাকিয়ে দেখুক, একটু অনুপ্রেরণা পাক। হবে না, হবে না, ভেবেই সমস্ত জাতটা গেঁজে গেলো, হারিয়ে ফেলতে, তার পুরুষকার। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার চরম পর্যায়টাও কাম্য নয়। ঘনশ্যাম ও সনাতনের মধ্যে এই পারস্পরিক রেষারেষি কেন ? এর তো কোনো প্রয়োজন নেই। এই কলকাতা শহরটা তো মস্ত বড় জায়গা, এখানে দুজন কেন, দু'হাজার বিজনেসম্যান হাসতে হাসতে একই সঙ্গে বসবাস করতে পারেন।

ঘনশ্যামের স্পষ্ট ধারণা, দোষটা মোটেই তাঁর নয়। তাঁরা তো তিন পুরুষ ধরে বিজনেস করে যাচ্ছেন, কারও বাড়া ভাতে তো কখনও ছাই দেননি।

আর সনাতন ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন, তাঁর একপুরুষের খেলা। গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে হর্ন দেওয়ার মতন সময় নেই, দেরি হলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছনো সম্ভব হবে না। অনেক ড্রাইভার তাদের আদ্যিকালের মোটরের ইজ্জত রাখবার জন্যে এখনও এমনভাবে অন্য গাড়ির পথ অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে যে আর কেউ তাকে পাশ কাটিয়ে এগোতে পারবে না।

ঘনশ্যাম উল্টো মত পোষণ করেন, তাঁর ধারণা, ওসব দুর্বিনীত ড্রাইভারদের ব্যক্তিগত মতামত। জীবনের রাস্তা এখনও মস্ত চওড়া, কাউকে ধাক্কা না দিয়েও ঔদ্ধত্যের প্রকাশ না ঘটিয়েও এখনও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।





ঘনশ্যাম ঘোষাল ও সনাতন সান্যালের ব্যবসায়িক দ্বৈরথ ক্রমশ গুরুতর রূপ ধারণ করছে।

উপনের এক ভাগ্নে জনসংযোগ এজেন্সির ক্যালকাটা ব্রাঞ্চ চালাচ্ছে। এজেন্সির নাম আদান-প্রদান লিমিটেড। এই প্রতিষ্ঠানকে সনাতন মোটা মাসিক রিটেনার দিচ্ছেন এবং হাতে হাতে ফল পাচ্ছেন।

এই যে বড় বড় বিদেশি কোম্পানির ভাল ভাল খবর রোজ কাগজে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তা এমনি বেরুচ্ছে না, এর পিছনে পরিকল্পনা আছে এবং প্রচেষ্টা আছে। এই যে বম্বে দিল্লির কয়েকজন বিজনেসম্যান প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে উঠলেন সংবাদপত্রে তার পিছনে রয়েছে আদান প্রদান লিমিটেড অর্থাৎ এ-পি-এন-এর জনসংযোগ নৈপুণ্য। বোম্বাই এবং দিল্লির ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো ভালভাবেই জানেন নিয়মিত প্রচারের জোরে অনেক কাক অল্পসময় শ্বেতকপোত হয়ে উঠছে।

উপেন মুখুজ্যে তার কর্তাকে বললো, "পি আর এজেন্সি শুধু সুখের পায়রা না স্যর। পাঁচতারা হোটেল থেকে এক বিখ্যাত শিল্পপতি জেল হাজতে গেলেন। অন্য সময় হলে পুলিশ স্রেফ বদনাম ছড়িয়ে দিতো এবং কাগজওয়ালা শুধু সেই খবরই ছাপতো। কিন্তু আদান-প্রদানের দিল্লি ব্রাঞ্চ খেলা দেখিয়ে ছাড়লো— এমনভাবে ঘটনা সাজানো হলো যে

ভদ্দরলোক রাতারাতি হিরো হয়ে গেলেন। জেলে গেলেও আজকাল মানুষের ভাবমূর্তি কালো হয় না, যদি তার পিছনে পি-আর এজেন্সি থাকে।" ঘনশ্যাম ঘোষাল সে খবরে আরও বিস্মিত হলেন, বি এ অনার্স ইংরিজিতে পরীক্ষা দিয়েই এই আদান-প্রদানেই কাজ করছে সনাতনের মেয়ে বিভাবরী।

উদ্বিগ্ন ঘনশ্যাম বললেন, "তার মানেটা বুঝছো উপেন? এবার নিজের ঘরেই হোলটাইম জনসংযোগ শক্তি থাকবে সনাতনের। নিজের কূট বিজনেস বুদ্ধি এবং কন্যার জনসংযোগ শক্তি মিলিয়ে দুর্জয় কোম্পানি হয়ে উঠবে স্যান্টান কোম্পানি।"

বিরক্ত ঘনশ্যাম এবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের ছবি খবর কাগজে বেরোয় না, আর সনাতনের কী করে বেরোয়?"

"ওইটাই তো কায়দা, স্যর। মন্ত্রগুপ্তি আছে। ওদের স্পেশাল উপায়গুলো খুলে বলতে চায় না।"

নিরুপায় ঘনশ্যাম বললেন, "সনাতন যতটাকাই ঢালুক জনসংযোগে, ওতে সম্মানিত নাগরিক হয়ে উঠতে পারবে না। উপেন, মনে রেখো এ দেশে সবাই ভক্তির লাইনে যেতে চায়। বিত্তের লাইনে কোনও সম্মান নেই। বিজনেসম্যান যতো চেষ্টাই করুক সমাজের সম্মান পাবে না।"

"আদান-প্রদানের লোকরা বলে, "কবি, খেলোয়াড়, তারকা, সাধু সন্ন্যাসী সবাই যাচ্ছেন ওদের কাছে, নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে। বুদ্ধদেবও এ যুগে জন্ম নিলে ওদের কাছে যেতেন।"

শেষপর্যন্ত মত পাল্টালেন ঘনশ্যাম। "আমাদের কাজটাও ওদের দাও," অনুমতি দিলেন ঘনশ্যাম।

তারপর ভেবে বললেন, "আমাদের যে কারও সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা আছে, রেষারেষি আছে তা বলো না, এমনিই দাও। আমরাও তো বাঙালিদের মধ্যে একটা বড় বিজনেস হাউস, আমরাও প্রচার চাই।"

"প্রচার নয় স্যর, ওরা বলে প্রকাশ। আপনি যেন জনসাধারণের

মানসচক্ষে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠছেন ফুলের মতন। অনেক নতুন নতুন বাংলা ওয়ার্ড সৃষ্টি হচ্ছে—বেতারে 'সম্প্রচার', কিন্তু দূরদর্শনে সংবাদ 'প্রসারিত' হয়। ভগবান জানেন কেন।"



আদান-প্রদান লিমিটেড-এর বিভাবরী সান্যাল ও ডেপুটি ম্যানেজার রব রয় এসেছিলেন ঘোষালের অফিসে ব্যবসায়িক আলোচনার জন্যে।

খোদ ঘনশ্যাম ঘোষাল তাঁর ম্যানেজারদের সামনে বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে এই পি-আর এজেন্সিকে ব্রিফ করলেন।

ওরা বিদায় নেবার পরে ঘনশ্যাম স্বীকার করলেন, "মেয়েটির বয়স কম কিন্তু খুবই বুদ্ধিমতী। আমাদের ছোটবেলায় ধারণা ছিল সুন্দরী মেয়ে মানেই পলাশ ফুল, ঘটে কোনও বুদ্ধি থাকে না। কিন্তু এই মেয়েটি জনসংযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে যে সব কোশ্চেন করলো তাতে অবাক হলাম। মেয়েটি আমাকে বুঝিয়ে ছাড়লো, এদেশে যে নতুন যুগ আসছে তখন পারসেপশন ম্যানেজমেন্টের ওপরই ছোট বড় সবরকমের বিজনেসের ভাগ্য নির্ভর করবে।"

"সেটা আবার কি জিনিস ?" হুটকো বুঝতে পারছেন না। তিনি এ-ধরনের কোনো কথা আগে শোনেননি।

ঘনশ্যাম বললেন, "আমিও কি এসব খবর রাখতাম। এখন বুঝতে

হবে যদি বিজনেসে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়। লোকে তোমাদের কি চোখে দেখছে, সেইটা হলো পারসেপশন। তুমি নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা করে বসে আছো তার সঙ্গে প্রায়ই জনগণের পারসেপশনের আকাশ-পাতাল তফাত। এই পারসেপশনকেই ম্যানেজ করতে পারে আদান-প্রদান কোম্পানির ডেপুটি ম্যানেজার। প্রত্যেকটি মানুষ এবং প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেরই মাঝে-মাঝে আত্মঅনুসন্ধানে বসা প্রয়োজন। তোমার নিজের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তোমার যা ধারণা তার সঙ্গে জনসাধারণের মতামতের দূরত্ব রয়েছে কি না। যদি দেখা গেলো দুটোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তখন তোমাকে ঠিক করতে হবে কোন্ ধরনের ভাবমূর্তি তোমার সাফল্যের জন্যে প্রয়োজন। সেইটা ঠিক করে মাঠে নেমে পড়ো জনচিত্তে যে ভাবমূর্তি আঁকা হয়ে রয়েছে তার সংশোধনের জন্যে। এই ধরো হেনরি ফোর্ডের কথা। তাঁর নিজের ধারণা ছিল মানুষটি বেশ। রিসার্চ বললো, লোকে ভাবছে লোকটা ঝানু বিজনেসম্যান, স্বার্থপরতায় ভরা। তখন বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিলেন, কৃপণ ও স্বার্থসর্বস্ব এই ভাবমূর্তি মুছে ফেলবার জন্যে আপনি দান শুরু করুন। প্রতিষ্ঠিত হলো ফোর্ড ফাউন্ডেশন। তারপর যতই ফোর্ড ফাউন্ডেশনের খ্যাতি প্রসারিত হলো ততই পৃথিবীর লোকরা ভেবে নিলো ফোর্ডের মতন মহানুভব মানুষ পৃথিবীতে জন্মাননি।"

এই পারসেপশন পরিবর্তনের বিজ্ঞানটা অতি কমবয়সে চমৎকার আয়ত্ত করেছে আদান-প্রদান কোম্পানির তরুণ ডেপুটি ম্যানেজার। কলকাতা অফিসে ম্যানেজার কে তা ঠিক বোঝা গেলো না। এটা ইয়ং প্রফেশন, যারা এখানে নাম করছে তারা কমবয়সী। বিজ্ঞাপনে, পি-আর-এ, কমপিউটারে অভিজ্ঞতার জন্যে প্রিমিয়ম নেই, উঠতি এই সব প্রফেশনে যৌবনের জয়জয়কার।

ঘনশ্যাম বললেন, "জানো হুটকো, ইয়ং ম্যানের নামটাও অদ্ভুত—রব রয়। রব মানে তো লোকের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া।"

হা হা করে হাসলেন হুটকো। বললেন, "আসল নাম রবীন্দ্রনাথ

রায়—ডুন ইস্কুলে গিয়ে রব রয় হয়ে গিয়েছে। স্পেশাল নামটা পি-আর লাইনে কাজে লাগছে! কমপিউটর থেকে আয়ুর্বেদিক সালসা কোম্পানি পর্যন্ত সবাই জনসংযোগকে কাজে লাগাতে চাইছে!"

"কলি যুগ একেই বলে।" হতাশভাবে বললেন ঘনশ্যাম। "প্রোডাক্টের নামে খোঁজ নেই, বিজনেস নির্ভর করছে জনগণ তোমার সম্বন্ধে কি ভাবছে তার ওপর। জনগণমন অধিনায়ক কথাটার মানেই এবার পাল্টে যাচ্ছে।"

হুটকো বললেন, "রাগ করছো কেন ঘনশ্যাম ? আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো একসময় বলতেন, যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা! তাঁরা আরও বলেছেন, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। সুন্দর মুখ মানে শুধু সুন্দর শরীর নয়, সুন্দর ভাবমূর্তিও বটে।"

ঘনশ্যাম ফিসফিস করে বললেন, "বম্বেতে খবর পেলাম ধুরন্ধর পি-আর কোম্পানি ফি এর পরিবর্তে শুধু তোমার মুখে স্নো-পাউডার মাখায় না, উল্টো কাজটাও প্রয়োজনে করে দেয়, তবে খুব গোপনে। সে কাজটা হলো শত্রুর মুখে চুনকালি মাখানো—এই স্পেশাল কাজের নাম ইমেজ টার্নিশিং সার্ভিস। খুব শক্ত অ্যাসাইনমেন্ট, কিন্তু এ দেশে বড় স্কেলে ব্যাপারটা চালু হয়ে গিয়েছে। নিজের সুনাম সুনিশ্চিত করার জন্যে প্রতিপক্ষর নামে বদনাম ছড়িয়ে বেড়ানো খুবই আকর্ষণীয় পথ।"

কলকাতায় আদান-প্রদানের মতন এজেন্সির খবরাখবর পেয়ে ঘনশ্যামের চিন্তা কিছুটা কমেছে। কেউ বেশি তড়বড় করলে তার ল্যাজটা কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। মডার্ন বিজনেসে টাকা ফেললে বহু কাজই অন্য কেউ করে দিতে রাজি থাকে। তুমি মূল ব্যবসাটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকো এবং অঢেল টাকা রোজগার করো। কারণ সব লাইনেই ওপরের দিকে ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত পরামর্শ দেবার প্রফেশনে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের দাম একটু বেশি।

শিক্ষা নিতে শিখেছেন ঘনশ্যাম তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে, দর কমাবার ব্যর্থ চেষ্টা কোরো না, বার্গেনে শেষ পর্যন্ত 'ক্রেতার' হার হবেই।

কারণ অপর পক্ষ তো তার নিম্নতম দাম জেনে বসে আছে, তার তলায় সে তো যাবে না। দাম কম দিলেই এ-সংসারে তোমার ঝটতিপটতি মাল পাওয়ার সম্ভাবনা। বাবার ভুল উপদেশে কয়েকটা বছর বাজে নষ্ট হয়েছে ঘনশ্যামের।

"এতোসব করে কী লাভ হবে, ঘনশ্যাম?" জিজ্ঞেস করেছিলেন হুটকো।

গম্ভীর মুখে ঘনশ্যাম উত্তর দিয়েছিলেন, "কী বলছো, হুটকো। পৈত্রিক ব্যবসাকে ডকে পাঠাবার জন্যে বাবা তো আমাকে গদিতে বসিয়ে যাননি। এই যে স্যান্টান বিস্কুট। এর উদ্দেশ্য ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা পাওয়া নয়, এর একমাত্র লক্ষ্য ঘোষালদের এস-বি-জি বিস্কুটের সর্বনাশ করা। সব বুঝে-সুঝে তা আমি কি কী করে স্বীকার করে নেবো, হুটকো? আমাকেও দেখাতে হবে যে ঘোষালরা বেঁচে রয়েছে। তারাও বিজনেসের কিছু জানে। মার্কেটের লিডার হবার জন্যেই এস-বি-জি বিস্কুটের জন্ম। যেদিন প্রথম এই বিস্কুট তৈরি হলো সেদিন বেলুড় মঠে ভরত মহারাজের কাছে গিয়েছিলাম। বিস্কুট মুখে দিয়ে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন, বিজয়ী হও। আমি বিজয়ী ছিলাম, আছি এবং থাকবো, তুমি দেখে নিও।"

সনাতন সান্যালের কাছে গিয়ে হুটকো যা শুনলেন তাতে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

সনাতন বললেন, "যার কেউ নেই তার জন্যে ঠাকুর আছেন, হুটকো। যেদিন স্যান্টান বিস্কুটের উৎপাদন করলাম সে দিন সকাল থেকে নির্জলা উপবাস করেছিলামা। তারপর বিস্কুটের প্রথম প্যাকেট নিয়ে ছুটলাম বেলুড়ে। প্রেসিডেন্ট মহারাজের পায়ের কাছে রাখলাম ঐ বিস্কুট। তিনি আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন, ঠাকুরের ভোগে পাঠাও এই বিস্কুট। না হলে সনাতনের মন প্রসন্ন হবে না। তারপর ঐ প্রসাদী বিস্কুট নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। মহারাজ আশীর্বাদ করলেন,

এমন ব্যবসা করো যেন সারা দুনিয়া একদিন তোমাকে এক ডাকে চিনতে পারে।"

কোনো উত্তর দিতে সাহস পাননি হুটকো। সনাতন এখন স্বপ্ন দেখছে স্যান্টান বিস্কুটকে বিদেশে পাঠানোর।

"যেদিন ইংলন্ডের মার্কেট আমার কব্জায় আসবে সেদিন আমি একশো সাধুর ভাণ্ডারা দেবো।"

দুই বন্ধুর অফিসে ঘুরে ঘুরে ব্যাপারস্যাপার দেখছেন আর ক্রমশই বিভ্রান্ত বোধ করেছেন হুটকো হালদার। কারুর সান্নিধ্যেই তিনি শান্তি পাচ্ছেন না।

আরও কিছু অঘটন যে অপেক্ষা করছে তা আন্দাজ করা উচিত ছিল হুটকোর।

সকালের কাগজ খুলে প্রথম পাতায় হুটকো দেখলেন : 'হিরো খায় হিরোইন খায় স্যানট্যান বিস্কুট'। হুটকো তিনের পাতায় দেখলেন রাজ্যের নবনিযুক্ত পূর্তমন্ত্রী হরিধন হাজরার গলায় সবিনয়ে মাল্যদান করছেন সনাতন সান্যাল। দেশের শিল্পপতিদের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সিমেন্ট শিল্প সম্পর্কে উজ্জ্বল আশা প্রকাশ করেছেন সনাতন।

হুটকো মনে মনে ভাবলেন, সনাতনটা সত্যিই কর্মবীর হয়ে উঠেছে। হাওড়ার সেই সবু গলি থেকে বেরিয়ে সাফল্যের প্রশস্ত রাজপথে উপস্থিত হয়েছে সে ঠাকুরের আশীর্বাদে। বিজনেসে নবনব উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ করে সে সবাইকে চমকে দেবে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কাগজের শেষ পৃষ্ঠায় উপস্থিত হয়ে হুটকো একেবারে ব্যোম মেরে গেলেন। আধপাতা জোড়া মস্ত বিজ্ঞাপনে ঘনশ্যামের এস বি জি বিস্কুট কোম্পানি প্রশ্ন করছেন, "আপনারা বিস্কুটে আর কত কেমিক্যাল খাবেন ?"

মুহূর্তে বিজ্ঞাপনের কপিটা পড়ে ফেললেন হুটকো। 'আপনার বহু যত্নের পৈত্রিক শরীরটা তো ডাস্টবিন নয়, যে যতরকমের বিপজ্জনক

কেমিক্যালস্ সেখানে ডাম্প করবেন। বিস্কুট মুচমুচে করাটা কোনো কাজই নয় যদি প্রতি মিলিগ্রামে বেশ কিছুটা রাসায়নিক হজম করতে প্রস্তুত থাকে কেউ। দুঃখের ব্যাপার, শরীর এই বিষ গ্রহণ করলেও ত্যাগ করতে পারে না, সময় লেগে যায় সতেরো দিন, ততদিনে আরও কত কেমিক্যাল দেহের ডাস্টবিনে জড়ো করে দিয়েছেন সেইসব বিস্কুট কোম্পানি যাঁদের ধাঁরণা আপনার শরীরের সর্বনাশ হয় হোক কিন্তু বিস্কুট যেন কুড়মুড়ে হয়। এস বি জি বিস্কুট শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক নয় কারণ কেমিক্যালস ব্যবহার করা হয় না।'

একটু পরেই ঘনশ্যামের টেলিফোন এলো, "হ্যালো হুটকো, বিজ্ঞাপন পড়লে লাস্ট পেজে ? স্পেশাল পোজিসনের জন্যে ডবল দাম দিতে হলো। ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে ! বিজ্ঞাপন এজেন্সির মিজ্ দামানিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন একদিনে স্যানটানের বাজার চুপসে হাফ হয়ে যেতে পারে !"

হুটকো তাঁর বন্ধুকে বললেন, "রেষারেষি করে কোনও লাভ হয় ঘনশ্যাম। মনে নেই ইস্কুলে হাঁদুদা বলতেন, ভালবাসার কোন বিকল্প নেই।"

ঘনশ্যাম প্রথমে কোনও উত্তর দিলেন না। তারপর বললেন, "ব্যাপারটা আমি শুরু করিনি, হুটকো। বাপের টাইম থেকে আমি এই বিজনেস লাইনে রয়েছি। আমরা জানতাম, নিজে বেঁচে থাকো, অপরকেও বাঁচতে দাও। লিভ অ্যান্ড লেট লিভ।"

সনাতন সান্যাল অন্য কথা বলবে, "রেষারেষি না থাকলে দুনিয়া আলুনো হয়ে যেতো হুটকো। রেষারেষি যদি খারাপ হতো তা হলে কোকাকোলা আর পেপসি কোম্পানি কবে উচ্ছন্নে যেতো। কুরুবংশ যেমন কুরুক্ষেত্রে ধ্বংস হয়েছে, তেমন কোক-পেপসিও লক্ষ্মীর কৃপাধন্য হয়ে কোটি কোটি ডলার উপার্জন করছে !"

চিন্তার বোঝা নিয়েই হুটকো সেদিন সনাতনের গৃহে হানা দিয়েছে। এই দ্বন্দ্বের অর্থ বোঝবার ক্ষমতা যে তাঁর নেই তা সোজাসুজি বলবেন বন্ধুকে।

কিন্তু সনাতনের সঙ্গে দেখা হলো না, বিনা নোটিশে সেই ভোরবেলায় সে বেরিয়ে গিয়েছে। বন্ধুপত্নী অচলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। অচলা যে প্রখর বুদ্ধিমতী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই হুটকোর। স্বামীর সমস্ত কাজে তার তীব্র সমর্থন। এমন প্রশ্রয় না পেলে সনাতন এই ভাবে কাজে ডুবে থাকতে পারতো না।

হুটকো ভেবেছিলেন সনাতন ও অচলা সর্ব বিষয়েই একমত। কিন্তু আজ হুটকো আবিষ্কার করলেন যে অচলারও নিজস্ব চিন্তাধারা আছে।

স্বামীর সুখদুঃখের অংশীদার সে, কিন্তু মাঝে মাঝে নিজের মতামত দিতে সে দ্বিধা করে না।

স্বামীর বন্ধুকে দেখে অচলা বললো "অনেক তো হয়েছে, আর এগিয়ে কী হবে বলুন তো ? মানুষটার মাথায় পোকা ঢুকেছে, যে করেই হোক আরও এগোতে হবে। শুধু এগোলে হবে না, স্কুলের বন্ধু হাওড়ার বিজনেস কিং ঘনশ্যামের থেকে অনেক এগোতে হবে। এই খেয়ালের মানে হয় কোনও !"

বিভাবতীর সঙ্গেও দেখা হয়েছে হুটকো এবং গৃহিণীর। গৃহিণীকে তিনি বলেছেন, "আপনাদের দু'জনকে আমি হিংসা করি। কেমন ভোলাবাবা হয়ে আছেন হুটকোদা। বিজনেসে কে এগলো কে পেছলো সে নিয়ে কোনও ভাবনা নেই। আমার কর্তার যে কি নেশা চেপেছে, জানাশোনা কেউ তার থেকে এগোতে পারবে না। অচেনা লোক টাটা বিড়লা রথচাইল্ড গেট্স হলে আপত্তি নেই, কিন্তু চেনা-জানা কেউ এগিয়ে থাকলে চলবে না। আমি বলি, তোমার তো ভাত-কাপড় জুটছে। তারপর সনাতনবাবু কী করলেন তাতে আমাদের কী এসে যায় ? কিন্তু ওসব কথা ওঁর কানে ঢোকে না। দিনরাত খবর করছেন, সনাতন কী করলো, আরও কতটা এগলো।"

হুটকো গৃহিণী বলেছেন, "পুঁটুদিদি, শুনেছি এইভাবেই মানুষ এগিয়ে যায়।"

উত্তর শুনে সন্তুষ্ট হলেন না বিভাবতী। বললেন, "চিন্তা হয়

শরীরস্বাস্থ্য নিয়ে। সেকালে জমিদাররা এরকম লড়াই করতেন, দ্বৈরথ না কী বলতো।"

বিভাবতী বললেন, "খবরের কাগজে কী এক বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, উনি ভীষণ খুশি। খরিদ্দাররা নাকি স্যানটান বিস্কুট কোম্পানি সম্বন্ধে সাবধান হয়ে যাচ্ছে।"

পরের দিন সকালেও খুব প্লিজ্‌ড ঘনশ্যাম। উপেনকে তিনি বললেন, "হাতিকে জ্বালাতন করলে এই হয়! আমি বিজ্ঞাপনটা আরও বড় সাইজে রিপিট করতে বলেছি মিজ্ দামানিয়াকে। বাংলা, হিন্দি, ইংরিজি সব কাগজে এবং কিছু ম্যাগাজিনেও বেরোবে। টাকা লাগলে লাগবে। কিন্তু শত্রুর শেষ রাখতে নেই।"

কিন্তু এতো আয়োজনের পরেও তার পরের দিন ভোরবেলাটা ঘনশ্যাম ঘোষালের কাছে খুব সুখপ্রদ হলো না।

খবরের কাগজে হাফপেজ বিজ্ঞাপন নিয়েছে স্যানট্যান। সরকারি টেস্ট হাউসের সার্টিফিকেট ছেপেছে—সবচেয়ে বেশি কেমিক্যালস রয়েছে এস বি জি বিস্কুটে, যাঁরা আপনাদের কেমিক্যালস খেতে বারণ করছে। চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জনের জন্য সরকারি টেস্ট হাউসের রিপোর্ট নিচে ছাপানো হলো।

বিজ্ঞাপনটা পড়ে রাগে ফেটে পড়লেন ঘনশ্যাম। সাতসকালে ঘনশ্যাম ছুটলেন অফিসে। হুঙ্কার ছাড়লেন, "মিথ্যাচার। আজই মামলা করবো স্যানটানের নামে, দাবি করবো দশ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ।"

কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ ভাল নয়, অফিসে এসে খবর পেলেন সনাতনের এজেন্ট বর্ধমান ও আসানসোল থেকে এস বি জি বিস্কুটের বেশ কয়েক টিন সাম্পল্ আনিয়েছে। যাহা রটে কিছু বটে।

"সেখানে কেমিক্যালস বাড়লো কী করে?" থরথর করে রাগে কাঁপছেন ঘনশ্যাম।

উপেন নতমস্তকে মনে করিয়ে দিল, "বাইরে যাতে বেশিদিন বিস্কুট

মুচমুচে থাকে তার জন্যে আপনিই তো ফ্যাকটরি ম্যানেজারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওরা সেই অনুযায়ী কাজ করেছে।"

সন্ধেবেলায় পরিস্থিতি আরও খারাপ দিকে গড়ালো। দু' নম্বর কারখানায় গভরমেন্টের ইন্‌সপেক্টর এসে গিয়েছে। এস-বি-জির টিন সিল করছে স্থানীয় সাক্ষী রেখে। খবর এসেছে, সরকারি বিভাগকে বিশেষ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে স্যানটান বিস্কুট।

রাত্রে টিভির স্থানীয় খবর দেখতে গিয়ে আঁতকে উঠলেন ঘনশ্যাম। "বিস্কুটের কারখানায় আচমকা হানা। কোম্পানির অন্য কারখানাতেও সার্চ চলছে।"

ইনসপেক্টরদের হাঙ্গামা সামলে উপেন যখন ফিরলেন ঘনশ্যাম তখনও অফিসে চুপচাপ বসে আছেন।

উপেন জানালো, "আপনার বিজ্ঞাপনের জন্য 'রেড' হয়নি স্যর, দূষণ প্রতিরোধের ব্যাপারে কেউ সরকারি ডিপার্টমেন্টকে লেলিয়ে দিয়েছে। কারখানা থাকবে, চিমনি থাকবে অথচ একটু-আধটু ধোঁয়া থাকবে না তা কেমন করে হয় ?"

অপমানে ও বিরক্তিতে টগবগ করে ফুটছেন ঘনশ্যাম। বললেন, "আদানপ্রদান কোম্পানিকে একটু ফোনে ধরো—এতো পি-আর এমার্জেন্সি। এখনই মাঠে না নামলে আগামী কাল তো কাগজে কোম্পানি সম্বন্ধে যা তা বেরুবে।"

ম্যানেজারের উত্তর শুনে স্তম্ভিত হলেন ঘনশ্যাম। বন্ধুবর হুটকোর সামনেই ম্যানেজার জানালেন, "আপনাকে বলা হয়নি, পি-আর এজেন্সির চিঠি গতকাল এসেছে। এই অ্যাকাউন্ট এই মুহূর্তে অন্য এক ক্লায়েন্টের স্বার্থে ওদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।"

হতাশায় ভরে উঠে ঘনশ্যাম প্রশ্ন করলেন, "মনে হচ্ছে এই পি আর এজেন্সিগুলো ডাক্তার নয়, এরা উকিল। একই উকিল শত্রু-মিত্র দু'জনেরই ব্রীফ নিতে পারে না। কিন্তু একই ডাক্তার অর্জুন ও কর্ণের, কিংবা পুলিস ও ডাকাত দু'জনেরই চিকিৎসা একই দিনে করতে পারেন। "সেইজন্যেই

তো আমি ওকালতির কথা না ভেবে হোমিওপ্যাথি লাইনে যাচ্ছি, ঘনশ্যাম। আমার তো আইনের ডিগ্রি ছিল, কিন্তু কাজে লাগাতে মন চায় না। কিন্তু ডাক্তারি ব্যাপারটাই আলাদা। একটু গরিবের সেবা হবে, একটু মজা হবে। ঠাকুরের শেষ চিকিৎসা হয়েছিল হোমিওপ্যাথের হাতে। ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।"

কথাগুলো শুনে খুব সুখী হলেন না ঘনশ্যাম। তিনি বললেন, "হুটকো, এই শক্ত সময়ে তুমি আমার অফারটা নিলে না।"

হুটকো ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। দোষটা মোটেই তাঁর নয়। তাঁর ভাগ্নে যে কোম্পানিতে কাজ করে তাঁদের সিদ্ধান্ত। ঘশন্যাম বললে বিশ্বাস করবে না যে বিভাবরী এই কাজটা নেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছিল। আফটার অল এর মধ্যে চ্যালেঞ্জ আছে। কিন্তু ডেপুটি ম্যানেজার রব রায় ভরসা পেলেন না। তাঁর ধারণা হলো, মিস্টার সনাতন সান্যাল ব্যাপারটা স্পোর্টিংলি নেবেন না। ফলে একদিন দুটো অ্যাকাউন্টই হাতছাড়া হয়ে যাবে।

ঘনশ্যামের অফিস থেকে বেরুবার সময়ে হুটকো দেখলেন, ঝানু রিটায়ার্ড পুলিশ এসি সরল গুহ কর্তার দর্শন প্রত্যাশী হয়ে বসে আছেন। যাঁরা এই লোকটিকে জানেন তাঁরা বলেন, বুঝেসুঝে বাপ ভাল নাম রেখেছেন। মিস্টার গুহ হাজার রকম হাঙ্গামায় নিজে জড়িয়ে আছেন, অপরকেও জড়াচ্ছেন। যখন থানার ক্ষমতায় ছিলেন তখন রাত চারটের সময় বড়লোকদের অ্যারেস্ট করতে যেতেন। ওতে রোজগার ভাল হয়, আর ধনীর দুলালদের জোর করে সুখশয়ন থেকে তুলে স্পেশাল মজা পাওয়া যায়। সরল গুহর নিজেরও কোনও অসুবিধে নেই, কারণ রাতে ওঁর ঘুমই আসে না।

সরল গুহর উপস্থিতির কারণটা সরকারিভাবে যা জানা গেলো : ছোট্ট একটা সিকিউরিটি অডিট করাবার কথা ভাবছেন ঘনশ্যাম। কলকারখানা, অফিস সবই এখন বিপজ্জনক জায়গা হয়ে উঠছে। শুধু টাকাপয়সা নয়, কাগজপত্তর চিঠিচাপাটির জন্যেও কর্মক্ষেত্রে ছিনতাই অথবা ডাকাতি হচ্ছে।



কয়েক দিন ধরে বেশ খোশমেজাজে রয়েছেন সনাতন। স্যানট্যানং বিস্কুটের বিক্রি ঘনশ্যামের বিজ্ঞাপনের ধাক্কায় কয়েকদিন গোঁত খেয়ে আবার যথাস্থানে ফিরে এসেছে।

পাঁচতারা হোটেলে সনাতন মস্ত ডিনার পার্টি দিলেন বিক্রেতাদের সম্মানার্থে!

ব্যাপারটা হুটকো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। "ভূতভোজন করিয়ে লাভ কী?"

কিন্তু সনাতন দামী এজেন্সির সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তাঁদের মতে ডিলারদের জন্যে ডিনারপার্টি হামেশাই দেওয়া হচ্ছে।

মুচকে হেসে সনাতন তাঁর বন্ধুকে বোঝালেন, "দিনকাল বদলে যাচ্ছে হুটকো। যারা গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি পরে দোকানের টুলে বসে সারাদিন বিস্কুট বেচে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, একদিন ফাইভস্টার হোটেলে তাদেরই ডিনার খাওয়ালে তারা খুব খুশি হয়।"

সনাতনকে কোনো পরিশ্রম করতে হয়নি। তাঁর নির্দেশ মতন পি-আর এজেন্সি নিখুঁত ব্যবস্থা করেছিল। ভোজনের আগে ককটেল। ককটেলের মধ্যপর্বে বাংলা ফিল্‌মের পড়ন্ত নায়িকা ড্র তুললেন। এই লটারিতে ভাগ্য পরীক্ষা হলো সেইসব ডিলারের যাঁরা বাড়তি বিস্কুটের

অর্ডার প্লেস করলেন। একজন ভাগ্যবান তো বোম্বাই যাবেন সুটিং দেখতে এক উঠতি তারকার গেস্ট হয়ে। শেষে স্পেশাল মিউজিক উষা উত্থুপের—স্পেশালি কমপোজ্‌ড—নো প্যানপ্যান ওনলি স্যানট্যান। ও ডিয়ার নো ঘ্যানঘ্যান, ওনলি স্যাটন্যান।

এই গানের ছন্দে অতিথিদের অনেকে নাচতে শুরু করেছেন। পেটে একটু স্পেশাল লিকুইড পড়লে ডান্সিং-এর মেজাজ এসে যায়।

পরবর্তী ডিলার উৎসব হবে ১৫ই আগস্ট। এবার হুটকোকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন সনাতন। কলকাতা কত এগিয়েছে তার নমুনা দেখাবেন বন্ধুকে। কিন্তু সনাতনকে মনে করিয়ে দিতে হলো, ও দিন হুটকোর উপোস।

"কেন গো ? ইন্ডিয়া পার্টিশন হবার জন্যে দুঃখ ?"

"না গো না। বিবেকানন্দ স্কুলের ছেলে হয়ে ভুলে গেলে সনাতন, ১৫ আগস্ট রাত একটার সময় ঠাকুর দেহ রাখলেন কাশীপুরে। অনেক বছর ধরে আমি উপোস করছি, যেমন আমাদের হাঁদুদা করতেন।"

বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন হুটকো। "লোভ দেখিয়ে এইভাবে বাড়তি অর্ডার যোগাড় করা কি ভাল, সনাতন ?"

"দুনিয়ার সবাই করছে, আমি কেন বাদ যাই ? আফটার অল এরা তো নাবালক নয় ! মাল যখন তুলছে বিক্রি তখন ঠিক করবেই। বড় জোর অন্য একটা ব্রান্ড কেনবার মতন লিকুইড ক্যাশ থাকবে না। আমরা তো এগজ্যাক্টলি তাই চাই," বলে হা-হা করে হাসতে লাগলেন সনাতন সান্যাল।

"এসব কী বলছো সনাতন ? এই পৃথিবীতে স্থিতধীরা সারাক্ষণ বলছেন, লিভ অ্যান্ড লেট লিভ। নিজেও বাঁচো অপরকেও বাঁচতে দাও।"

সনাতন বলে উঠলেন, "হুটকো, ওসব কথা অনেকদিন অকেজো হয়ে গিয়েছে। এখন যদি সত্যি-সত্যি নিরাপদে নির্ঝঞ্ঝাটে বাঁচতে চাও তাহলে পায়ের গোড়ায় আগাছা বাড়তে দিও না।"

যে সনাতনের এতো মনোবল সে ক'দিনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত বিপদে পড়লো। বিনামেঘে বজ্রপাত। হঠাৎ পুলিশ এসেছে তাকে ধরতে। সনাতন তখনও ফোঁস দেখাচ্ছে, "সোজা পথে বিজনেস করি, হাজতে যাবার মতন কিছু করি না। তবে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।"

থানা থেকে ফিরে গম্ভীরভাবে অফিসে বসেছিল সনাতন সান্যাল। আর একটু অসাবধান হলে আজ কপালে হাজতবাস ছিল।

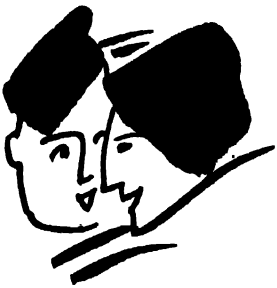
দুঃখের সঙ্গে সনাতন তাঁর বন্ধু হুটকোকে বললেন, "কোথায় একটা বাড়ি ভেঙে পড়েছে, আট বছর আগে তার কিছু সিমেন্ট সাপ্লাই হয়েছিল আমাদের কোনো সিমেন্টের দোকান থেকে। সব ব্যাটাকে ছেড়ে দিয়ে ধরো বেঁড়ে ব্যাটাকে। হয়তো কিছু ভেজাল সিমেন্ট ব্যবহার হয়েছিল সেখানে।

ঠিক সময়ে অভিজ্ঞ উকিল বিষ্ণুচরণ ঘোষ ও সুশান্ত দত্তকে একসঙ্গে পাওয়া গেলো তাই রক্ষে। পুলিশের ওসি বেশি টানাটানি করতে সাহস পেলেন না ! আট বছর আগে যিনি এই সিমেন্ট দোকানের মালিক ছিলেন তিনি কবে দেহরক্ষা করেছেন। স্যানট্যান গ্রুপ এই দোকান কিনেছেন মাত্র গত বছরে। ফৌজদারি অপরাধ তো রিট্রসপেকটিভ এফেক্টে করা যায় না ! সামান্য এই ব্যাপারটুকু বোঝাতেই ডিজি, সিপি, হোম সেক্রেটারি, মিনিস্টার পর্যন্ত অনেককে ছোটাছুটি করতে হলো।

রাগে ও অপমানে ফুঁসছেন সনাতন। বন্ধুকে তিনি বললেন, "আমাকে হাজতে ঠেলবার জন্যে কেউ স্পেশাল চেষ্টা চালাচ্ছিল। আমাদের খবর করতে হবে রিটায়ার্ড পুলিস এসি সরল গুহ কোন্ স্বার্থে এবং কার স্বার্থে থানায় ঘুরঘুর করছিল ?"

সরল গুহ নামটা শুনে হুটকো নিজেও বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

সনাতন এবার বললেন, "দেখাচ্ছি মজা।"



মজাটা কীরকম হতে পারে তা হুটকো ঠিক আন্দাজ করতে পারেননি। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে খবর পেলেন, পুলিশের হাঙ্গামায় মিইয়ে পড়া তো দূরের কথা, স্যানটানের সনাতন সান্যাল দুম করে দুটো সিমেন্ট গোডাউন কিনে ফেললেন।

খবরটা বন্ধুবর ঘনশ্যামের অফিসেই প্রথম পেলেন হুটকো। তারপর তিনি এলেন সনাতনকে অভিনন্দন জানাতে।

"তোমার তুলনা নেই সনাতন। সিমেন্ট গোডাউনের ইঁদুর হিসেবে বিজনেস শুরু করে তুমি এখন সিমেন্ট কিং হয়ে বসলে!"

একটু থেমে হুটকো রসিকতা করলেন, "বললে দেখাচ্ছি মজা। তারপর কয়েকদিনের মধ্যে কিনে নিলে আরও দুটো ছোট সাইজের সিমেন্ট গোডাউন।"

"লজেন্স কিং, বিস্কুট কিং, কনফেকশনারি কিং—আরও কত কিছুর কিং হবে তুমি সনাতন? বিশাল এই রাজত্ব চালাতে গিয়ে তুমি তো ঘুমোবার ফুরসত পাবে না।"

"দুটো নতুন কোম্পানির মালিক হয়েও তেমন সুখ হলো না, হুটকো। শুনলাম, তাঁতিয়া হাউজিং কোম্পানির হাফ পার্টনার হয়ে গিয়েছে ঘনশ্যাম ঘোষাল। আমি সুযোগটার গন্ধ পেয়েও মনস্থির

করতে একটু দেরি করে ফেললাম। ঘনশ্যাম এখন আমার কায়দা শিখে নিয়েছে। বেশি দরদস্তুর করে না। বিজ়নেসটা পছন্দ হলে ঝপ করে কিনে নেয়, অন্যপক্ষকে ভাববার সময় দেয় না।"

হুটকো অঙ্কটা বুঝতে পারছেন না। সনাতন ও ঘনশ্যাম দু'জনেরই সমৃদ্ধি হচ্ছে ঠাকুরের ইচ্ছায়। ঠাকুরের ইচ্ছায় দু'জনেরই প্রফিট ও প্রতিপত্তি বাড়ছে। তবু দু'জনের মধ্যে এই উত্তেজনা কেন ? একজন এক পা এগোলে আর-একজন দেড়পা এগোবার জন্যে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠবে কেন ?

"ঠাকুর, এদের তুমি কি বাসনার পাগল করে তুলেছো ?"

সনাতন এসব কথার উত্তর দিতে আগ্রহী নয়। এবার ঘনশ্যামের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন হুটকো হালদার।

ঘনশ্যামের বাড়িতে পৌঁছে হুটকো যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই। এখনও তার নো পাত্তা, বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে, ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন বিভাবতী দেবী। স্বামী কখন ফিরবেন তা ঠিক আন্দাজ করতে পারছেন না।

"হুটকোদা আপনি এসেছেন, খুব ভাল লাগছে। বউদিকে আনলে পারতেন।" তারপর বিভাবতী দুঃখ করলেন, "এরা কাজের নেশায় মাতাল হয়ে পড়ছে। হুটকোদা এদের নিয়ে আমি কী করি বলুন তো ? ছেলেটা আমেদাবাদ থেকে ফিরছে, সেও এবার এই জাঁতাকলে জড়িয়ে পড়বে।"

হুটকো আজ বন্ধুর অনুপস্থিতিতেও একটা কাচের প্লেটে বুটি ও আলু পোস্ত চচ্চড়ি নিয়ে বসেছেন। রেঁধেছেন স্বয়ং বিভাবতী দেবী।

কোটি কোটি টাকা কামাতে গিয়ে বউয়ের হাতে তৈরি আলুপোস্ত চচ্চড়ি খাবার আনন্দটাই পেলো না ঘনশ্যাম। কিন্তু তক্কোবাজ আছে ঘনশ্যাম। দরকার হলেই একটা উদ্ধৃতি দেয়, কোথায় বিবেকানন্দ বলেছেন, মরচে পড়ে ধ্বংস হওয়ার চেয়ে ঘষে ঘষে ক্ষয় হয়ে যাওয়া

ভাল। ওঃ, ঠাকুরের এক নম্বর চেলাটি গেরস্তদের কোনও দিন শান্তিতে পাশবালিস নিয়ে একটু ঘুমোতে দেবে না!

সনাতন তো শোবার ঘরের দেওয়ালে বড় বড় করে লিখে রেখেছে, "জন্মালি তো দাগ রেখে যা।"

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও ঘনশ্যামের পাত্তা পাওয়া গেলো না। সে এখন জেতার খেলায় বুঁদ হয়ে আছে।

হুটকোর মনে দুঃখের অন্ত নেই। বাড়ি ফিরে গৃহিণীকে বললেন, "আমি মাথা ঘামাচ্ছি, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছি না। ঠাকুর আমার মাথায় বোধ হয় গোবর ছাড়া আর কিছুই প্যাক করেন নি। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। এই ঘোষাল ভারসাস সান্যাল এবং সান্যাল ভারসাস ঘোষাল ফ্যামিলির লড়াই আমি মোকাবিলা করাবোই।"

হুটকো গৃহিণী উৎসাহ দিলেন। লাজুক হেসে বললেন, "দ্যাখো, যদি কিছু করতে পারো।"

উৎসাহ পেয়ে হুটকো যখন সমস্যার গভীরে যাবার চেষ্টা করছেন তখন গৃহিণী ইঙ্গিত দিলেন, লড়াইটা দুই পরিবারের নয়। তিনি তো সনাতন সম্বন্ধে কোনো বিদ্বেষ শোনেননি ঘোষালদের অন্দরমহলে। বরং দুঃখ করতে শুনেছেন বিভাবতীকে ননদের জন্যে। বলছেন, তখন শ্বশুরমশাই যদি ওইভাবে বেঁকে না বসতেন! তবে ভাগ্যে হয়তো মিত্রার জন্যে এইসব দুঃখ লেখা ছিল।

তড়াং করে উঠে পড়লেন হুটকো। মনে হচ্ছে এই পরিবারের সংঘর্ষের গোড়ার কথাগুলোই এতোদিন তাঁর নজরে পড়েনি। হুটকো গৃহিণীও ব্যাপারটা ঠিকমতন জানেন না।

হুটকো যতই ভাবছেন ততই যেন ঘন অন্ধকারে ঠিকপথের ইঙ্গিত পাচ্ছেন ক্ষীণভাবে।



অযথা সময় নষ্ট না করে পরের দিনই হুটকো হাজির হলেন ঘোষাল ভবনে, এমন এক সময়ে যখন ঘনশ্যাম তার বড়বাজার অফিসে কাজের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে আছেন।

হুটকো লক্ষ্য করলেন বিভাবতীর মধ্যে প্রবল উদ্বেগ। স্বামীদেবতা বিজনেসের নেশায় কী আরম্ভ করেছেন ? কে কাকে জেলে পাঠাবে তার হিসেব হচ্ছে মনেমনে।

হুটকো বললেন, "এমনও হতে পারে, দু'জনেই শেষপর্যন্ত দু'জনকে ভীষণ বিপদের মধ্যে ঠেলে দিলে। মেমসায়েব দু'পক্ষেরই হার হয়েছে এমন যুদ্ধ পৃথিবীতে অনেক হয়েছে, আমাদের হেডমাস্টার বলতেন !"

হুটকো দুঃখ করলেন, "আমার দম্ভ ছিল, দু'জনেই আমার ওপর ভরসা রাখে, একটা কিছু মিটমাট হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ আমার ওপর বিশ্বাস রাখে না।"

এরপর হুটকো আরও দুঃখ করলেন, "সনাতনটা আগে কত প্রাণের কথা বলতো। কিন্তু এখন তেমনভাবে মন খুলে কথা বলে না। কেন যে এ-বাড়ি সম্বন্ধে এমন চটিতং হয়ে বসে আছে তা কিছুতেই বুঝতে পারি না। অথচ ঘনশ্যামের সঙ্গে একসময় ওর খুব ভাল ছিল। এই বাড়িতে তিনজনে কত আড্ডা মেরেছি। সেই লোক এখন এ-পাড়া মাড়ায় না।"

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হুটকো হালদারের। অকস্মাৎ সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে স্বামীর বন্ধুর কাছে বিভাবতী তাঁর মুখ খুললেন। যা এতোদিন ঘোষাল পরিবারের ব্যক্তিগত ঘটনা ছিল তা প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলো।

"হুটকোদা, আপনার বোধ হয় জানা উচিত। অনেক বছর আগে, সেই যেবার আপনি এবাড়ির সবাইকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে গেলেন রঙমহলে, সেখানে ঠাকুরঝির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সনাতনবাবুর। ঠাকুরঝির তখনও বিয়ে হয়নি। তখন সনাতন কলেজ থেকে বেরিয়ে কোথায় সামান্য একটা কেরানিগিরি করছে। ভীষণ ভাল লেগেছিল ওঁর ঠাকুরঝিকে। লজ্জার মাথা খেয়ে নিজের মায়ের মাধ্যমে, চুপি চুপি বিয়ের প্রস্তাবও পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু বাবা এককথায় না বলে দিলেন। বাবা বলেছিলেন, চাল নেই, চুলো নেই পূর্ববঙ্গের বাঙাল, সে কোন সাহসে আমার মেয়ের স্বামী হতে চায় ? ঠাকুরঝির সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ হলো, যদিও আমার কর্তার মনে হয়েছিল চেনা-জানার মধ্যে বিয়েটা হলে মন্দ হতো না। কিন্তু সনাতনবাবু তখন সামান্য কেরানি, ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন। তাঁর যে কোনো ভবিষ্যৎ আছে তা কে বলবে ? সনাতনবাবু সেই আঘাত থেকেই বোধ হয় এখনও জ্বলছেন ! কোথাও অপমান হলে মানুষ সারাজীবন ধরে তা ভুলতে পারে না।"

"মিত্রা। আমাদের সঙ্ঘমিত্রা, সে কি ব্যাপারটা জানতো ?" প্রশ্ন করেন বিস্মিত হুটকো। এতো বড়ো ঘটনা এতোদিন হুটকোর অজানা ছিল ভাবতে অবাক লাগে।

বিভাবতী বললেন, "মিত্রা ব্যাপারটা শুনেছিল, লজ্জাও পেয়েছিল। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু মতামত দেয়নি। আমার স্বামী মুখ খুলতে সাহস পাননি। জানেনই তো ঘোষাল পরিবারের গর্ব এবং শ্বশুরমশায়ের মেজাজ। তিনি বলেছিলেন, ঐ চ্যাংড়াটা যেন এ-বাড়িতে আর না ঢোকে। তারপর হুড়োহুড়ি করে ঘটক লাগালেন শ্বশুরমশাই, ওঁর সারাক্ষণ ভয় সনাতনের ব্যাপারটা না বাইরে জানাজানি হয়ে যায়। এরপর ব্যাপারটা তো আপনি জানেন, রাজযোটক মিল করে বড়ঘরে

বড়লোকের ছেলের সঙ্গে সঙ্ঘমিত্রার বিয়ে হলো। শাশুড়ী ঠাকরুণ ভাবতেন, ঠাকুরের অভিশাপ লেগে গিয়েছে। হাজার হোক, রেগুলার বেলুড় মঠে-যাওয়া ছেলে এই সনাতন। বাঙাল বলে ঘোষাল বাড়িতে বিয়ে হলো না ভাবতে নিশ্চয় মনে ব্যথা পেয়েছে। তবে আমরা তারিফ করি সনাতন বাবুর।"

"কেন?" প্রশ্ন করলেন হুটকো হালদার।

বিভাবতী বললেন, "হুটকোদা এখানকার বেশির ভাগ ছেলে এমন ঘটনার পরে ভেঙে পড়তো, দেবদাসের স্টাইলে মাতাল হতো এবং নিজের সর্বনাশ করতো। সনাতনবাবু ওপথে গেলেনই না, তিনি নিজের পথ খুঁজে নিয়েছেন। এই ক'বছরে ভাগ্য ফিরিয়ে এখন ঘোষালদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন। শুনেছি, ঘটি মেয়ে বিয়ে করবেনই বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তা সে প্রতিজ্ঞাও তো রক্ষে হয়েছে।"

হুটকো কোনো কথা বললেন না। সনাতনকে তিনি এখন ভালভাবে বুঝতে পারছেন। বড্ড চাপা প্রকৃতির মানুষ, হুটকোর কাছেও নিজের ইচ্ছা কখনও প্রকাশ করেনি। তখন যদি একবার জানা যেতো সনাতনের মধ্যে এতো রোমান্স রয়েছে, তাহলে তেড়েফুঁড়ে লাগা যেতো।

আজ আর কথা এগলো না। হুটকো দেখলেন, ঘনশ্যামের আদরের বোন বিধবার বেশে ঘোষালবাড়িতে এসেছেন। জপে-তপে উপবাসে, অমাবস্যায়, অম্বুবাচী, একাদশীতে আগেকার সেই হৃদয়কাঁপানো শরীরের কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। কোনওরকমে বেঁচে থাকা—আজকাল মিত্রার প্রিয় আবাস বারাণসীতে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম। ওখানেই অনেক সময় কেটে যায়।

তবু কী আশ্চর্য! সঙ্ঘমিত্রা বললো, "কেমন আছেন হুটকোদা? আপনি অনেক বছর থিয়েটার দেখাননি। রঙমহলে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণর কী একটা নাটক হচ্ছে!"

মুহূর্তের মধ্যে হুটকোর মাথায় কিছু স্পেশাল আইডিয়া খেলে গেলো। আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন হুটকো। বললেন, "অতি উত্তম

প্রস্তাব। পাকড়াও করা যাক, পুঁটুদেবীর স্বামীকে। তারপর সদলবলে চলো রঙমহলে।”

“আমার স্বামীর সঙ্গে থিয়েটার যাওয়া! তা হলে ক’ বছর যে ওয়েট করতে হবে, কতবার যে টিকিট ক্যানসেল করতে হবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই।”

“বেশ! ঘনশ্যাম অর নো ঘনশ্যাম শোনো, আমি চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি। আর জেনে রাখো, হুটকো হালদার যখন একটা প্রস্তাব অ্যানাউন্স করেছে তখন আমরা থিয়েটার দেখতে যাবোই।”

বিভাবতী জানালেন, পুত্র অশোক আসছে আমেদাবাদ থেকে, সুতরাং দল হাল্কা হবে না।



পুঁটু ও মিত্রাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে গিয়ে দুই বন্ধুর ওপরেই ভীষণ চটিতং হয়ে উঠেছেন হুটকো। ব্যাপারটা কেউ বুঝুক না বুঝুক গৃহিণী বুঝছেন। নিজের মনেই, হুটকো বলছেন, “ঠাকুর ওদের চৈতন্য দাও।”

তার পরেও যা ঘটেছে তা অলৌকিক বলেই হুটকোর ধারণা। হুটকো হালদার সেদিন হাওড়ার থেকে বেরিয়েছিলেন কাশীপুর উদ্যানবাটির উদ্দেশে ভায়া হাওড়া ব্রিজ। কিন্তু পথেই ব্যাপারটা

ঘটলো। উদ্যানবাটি যাওয়া হলো না। হন্তদন্ত হয়ে হুটকো হাজির হলেন সনাতনের নেতাজি সুভাষ রোড অফিসে।

"সনাতন, ভীষণ কাণ্ড! দুটো প্রাইভেট বাসে রেষারেষি, এ ওকে ওভারটেক করছে, প্রথমে খেলার ছলে, তারপর ওদের রক্তে নেশা ধরে গিয়েছে। হাওড়া ব্রিজ থেকে নামবার সময় একটা বাস ধাক্কা মারলো রেলিঙে, আর এক ড্রাইভার সামলাতে না পেরে উঠে পড়লো ফুটপাতে। স্টিয়ারিংখানা বুকে বেধে গিয়ে ড্রাইভারের মুখ দিয়ে বালতি বালতি রক্ত বেরুচ্ছে। আমি সেই গাড়িতে ছিলাম। সনাতন, এতো রক্ত এর আগে আমি কখনও দেখিনি।"

বন্ধুর কথা সনাতন শুনলো, কিন্তু কোন শিক্ষা নিলো না বোধ হয়। তার মন্তব্য "ওভারটেক করতে পারবে না বুঝলে কেউ ওভারটেক করে! পুলিশও তেমনি!"

হুটকো বললেন, "কোথায় যেন পড়েছিলাম সনাতন, ওভারটেকের নেশায় পৃথিবীর সব ড্রাইভারের ধারণা হয় সে নিরাপদে ওভারটেক করতে পারবে।"

সনাতন মুখ বুজে শুনলেন, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না।

হুটকো বুঝলেন, সনাতন সান্যাল এতো বুদ্ধিমান হয়েও তাঁর ইঙ্গিতটা গ্রহণ করতে পারছেন না। প্রতিশোধের নেশা মানুষকে অনেক সময় বোকা করে তোলে।

মনের দুঃখে হুটকো হালদার এবার ছুটলেন ঘনশ্যাম ঘোষালের অফিসের দিকে। ঘনশ্যামও ওভারটেক এবং দুর্ঘটনার সব বিবরণ মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, "এই দুনিয়ায় ওভারটেক করার একটা বিশেষ আর্ট আছে, হুটকো। সেই বিদ্যে আয়ত্ত না করে আজকাল কলকাতার সব বাস ড্রাইভার ওভারটকে করতে চায়।"

ঘনশ্যামের চৈতন্যোদয়ের কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন না হুটকো। বরং নিজের দম্ভে নিজে ডুবে থেকে ঘনশ্যাম মন্তব্য করলেন, "বোকা সব!"

দুর্ঘটনার রাত্রে বাড়ি ফিরে হুটকো স্বপ্ন দেখলেন, তিনি বাসে চড়ে আবার হাওড়া ব্রিজ পেরোচ্ছেন। দুটো বাস বারবার পরস্পরকে ওভারটেক করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। বাস দুটো চালাচ্ছে তাঁর ছাত্রজীবনের পুরনো দুই বন্ধু ঘনশ্যাম ঘোষাল ও সনাতন সান্যাল।

ধড়ফড় করে ঘুম থেকে উঠে পড়লেন হুটকো। সেই রাত্রেই ফোন করলেন ঘনশ্যামকে। এত রাতে ঘুমোতে না গিয়ে সে তখন একটা পিটিশন লিখছে স্যানট্যানের বিরুদ্ধে। ঘনশ্যাম টেলিফোনেই স্বীকার করলেন, "রণনীতিটা রাত্রে সাজানো অনেক সহজ। বাইরের কোনও হাঙ্গামা থাকে না, হুটকো।"

হুটকো কী ভেবে নিজের চেয়ারে এসে বসলেন। গতকাল গৃহিণী গিয়েছেন কন্যার শ্বশুরালয়ে। বাড়িতে তিনি একা। চেয়ার থেকে হুটকো নজর দিলেন দেওয়ালে টাঙানো চাটুজ্যে মশায়ের দিকে। ফ্রেমে বাঁধানো ছবি হয়ে ঠাকুর হাসছেন। ঠাকুরের হাসি থেকে মাথায় যেন স্ট্র্যাটেজি আসছে! "ঘনশ্যাম, সনাতন, শুধু তোমাদের মাথায় নয়, হুটকো হালদারের মতন গোলা লোকের মাথাতেও ঠাকুরের আশীর্বাদে মাঝে মাঝে স্ট্র্যাটেজির ঝলক আসে। এই যে কিছুদিন হোমিওপ্যাথি পড়লাম, ওখানেও ওই পথ দেখানো রয়েছে—বিষে বিষক্ষয়।"

হুটকো একবার ভাবলেন, সনাতনকে জিজ্ঞেস করবেন, কোনকালে কে তোমাকে জামাই করেনি বলে এতোদিন এইভাবে হিংস্র হয়ে থাকবে? সামান্য একটা অপমানের ধাক্কা তোমার প্রয়োজন ছিল। তাই পেয়ে রোশের মাথায় তুমি পর্বতশৃঙ্গ জয় করলে। ফ্রম কেরানি টু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, টু বেকারি, টু বিস্কুট মেকার, টু কনফেকশনারি, টু সিমেন্ট, টু কনস্ট্রাকশন—তুমি সত্যিকারের রাজা হয়েছো। কিন্তু ওভারটেকের নেশায় মেতে উঠেছো তুমি।"

"আর ঘনশ্যাম, তোমারও মন কিছুতে ভরছে না। তুমি সব সময় চাইছো দাঁতের বদলে দাঁত, ইটের বদলে পাটকেল। তোমার রাজপথে তুমি সামনে কাউকে থাকতে দেবে না।"



গল্পের শেষ অংশে পৌঁছে গেছি আমরা। হুটকো অবশ্যই প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, "আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি। এই দুনিয়ায় কোনও চিতাবাঘই তার রঙ পাল্টাবে না।"

মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে হুটকোর স্ত্রী জিজ্ঞেস করেছেন, "এর পরিণতি কী ?"

অজানা আশঙ্কায় চোখ বন্ধ করেছেন হুটকো। "কোর্ট পুলিশ মামলা মোকদ্দমা থেকে বিস্ফোরণ পর্যন্ত সব কিছু ঘটতে পারে। বড়লোকের রক্ত গরম হলে আর উপায় থাকে না। লড়তে লড়তে একজন যখন শেষ হবে, তখন আর একজন জিতবে। তারপর শান্তি হবে, কুরুক্ষেত্রে যেমন শান্তিপর্ব।"

হুটকো বিছানায় শুয়ে শুয়ে কী যেন ভাবছিলেন। হঠাৎ তড়াং করে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। হতাশার শেষস্তরে যখন চলে যাচ্ছিলেন হুটকো ঠিক তখনই ঠাকুর হেসে উঠলেন। এরপর হুটকো অনুভব করলেন তার মাথায় যেন নতুন কোনো আইডিয়া প্রবেশ করলো। এমন গুরুতর সমস্যার যে এমন স্বাভাবিক এবং সহজ সমাধান রয়েছে তা যেন ঠাকুরই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

কৃতজ্ঞ হুটকো প্রথমে কয়েক মিনিট চোখ বন্ধ করে জপ করলেন,

তারপর বিছানা থেকে উঠে গৃহিণীর সঙ্গে নিতান্ত গোপনে কিছুক্ষণ তাঁকে আলোচনা করতে দেখা গেলো। স্বামীর কথা শোনামাত্র হুটকো গৃহিণীর মুখেও যেন হাসির ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। সানন্দে তিনি স্বামীকে বললেন, "দেখো চেষ্টা করে।"

পরের দিন সকালবেলায় বিস্মিত ঘনশ্যাম আবিষ্কার করলেন তাঁর বন্ধু হুটকো যেন রাতারাতি তাঁর মতামত পাল্টে ফেলেছেন। ভুলেও আর মিটমাটের কথা বলছেন না তিনি। হুটকোর নতুন থিওরি, "শত্রুর শিকড় পর্যন্ত তুলে ফেলতে হবে। শাস্ত্রেও তাই বলছে। ঘনশ্যাম তুমি মাথা খাটিয়ে কাজ করছো, কিন্তু আরও মাথা ঘামাতে হবে তোমাকে।"

খুব খুশি হলেন ঘনশ্যাম। বন্ধুকে বললেন, "হুটকো, তুমি পাশে থাকলে আমি অনেক কিছুই করতে পারি।"

"আমি যে সব সময় তোমার পাশে আছি তা তুমিও জেনে রাখো, পুঁটুও জেনে রাখো। শত্রুতার একটা পাকা সমাধান না করে গেলে তোমাদের ছেলেটা চিরকাল ভুগবে। তাকেও কোর্টঘর শেখাতে হবে।"

ঘনশ্যাম তাঁর বন্ধুকে বললেন, "শুনে খুশি হবে, স্যানট্যানের অন্যায় বিজ্ঞাপনটার বিরুদ্ধে এম.আর.টি.পি-তে কেস করে দিয়েছি। আনফেয়ার ট্রেড প্র্যাকটিস—বিজনেসটা যুদ্ধ, কিন্তু তা বলে যা খুশি তা করা যায় না। খেয়েছে ইনজাংশন আমাদের সনাতন। আমাদের বিজ্ঞাপনটাও অবশ্য ওরা ইনজাংশন দিয়ে বন্ধ করেছে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো ওই পি-আর এজেন্সি। সনাতনের সাময়িক বিপর্যয়ের খবরটা কাগজে এমনভাবে বেরিয়েছে যেন এস বি জি বিস্কুটই প্রথম রাউন্ডে হেরেছে।"

"খবরের কাগজের এই একচোখামি তো ভাল কথা নয়," হুটকো প্রবোধ দিলেন।

ঘনশ্যাম হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী করা যায় বলো তো ? কোনও বিলিতি পি-আর এজেন্সিকে ব্রীফ দেবো ?"

হুটকো উত্তর দিলেন, "আরও কঠিন বদলা নিতে হবে ঘনশ্যাম।

ওই জনসংযোগ বিজনেসের গোড়ায় চলে যেতে হবে আমাদের। দখল করে নিতে হবে ওই ছোট্ট আদান-প্রদান কোম্পানি। না হলে ওখান থেকে ভাঙিয়ে নিতে হবে যেন তেন প্রকারেণ ওই মিজ্ সান্যালকে। ওই মহিলাই তো অপারেশনটা চালাচ্ছে।"

উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন ঘনশ্যাম। "ওয়ান্ডারফুল! তুমি মনে করো, সেটা সম্ভব?"

হুটকো উত্তর দিলেন, "হোয়াই নট? তুমি একবার গ্রিন সিগন্যাল দিয়ে দেখো না।"

খুব খুশি হলেন ঘনশ্যাম। "আদান-প্রদানের ওই মেয়ে যদি একবার আমার ক্যাম্পে চলে আসে তখন সনাতন বুঝবে কত প্যাডিতে কত রাইস!"

"তুমি বলছো ওই মিজ্ বিভাবরী সান্যাল বুদ্ধিমতী?" ঝালিয়ে নেন হুটকো।

"সে কথা বলে! মানুষের মুখ দেখলেই আমি বুঝতে পারি।"

খুশিতে ডগমগ হয়ে হুটকো বেরিয়ে পড়লেন ঘনশ্যামের বাড়ি থেকে।

এরপর হুটকো হালদার বন্ধু সনাতনের অফিসে হাজির হলেন। বন্ধুকে তিনি তাতালেন, "তোমাকে এক নম্বর হতেই হবে সনাতন। এমনভাবে এক নম্বর হতে হবে যে যখন তুমি-আমি কেউ থাকবো না তখনও যেন এই স্যানট্যান এক নম্বর থাকবে।"

সনাতন বলে, "আমার পাকা স্ট্রাটেজি ছ'কা রয়েছে। পরবর্তী সাত বছর আমি কখন কী করবো তা সবসময় চোখের সামনে ভাসছে।"

"একটা জীবনে যা করলে তা মন্দ না? সনাতন।"

হাসল সনাতন। প্রশ্ন করলো, "কিন্তু ইজ ইট এনাফ?"

"মোটেই পর্যাপ্ত নয়, সনাতন। মোক্ষমভাবে হারিয়ে দিতে হবে সবাইকে—এমনভাবে আচমকা আক্রমণ করতে হবে যে অন্যপক্ষ দিশাহারা হয়ে যাবে।"

"দু'-একটা আইডিয়া দাও না, ভাই," বন্ধুর ওপর খুব খুশি হচ্ছেন সনাতন।

হুটকো বললেন, "কাল রাতে ঠাকুর স্বপ্নে এই অধমের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। ওঁর অদ্ভুত সব কথা—যেমন : হেরে গিয়েও জেতা যায়, জিতে গিয়েও হারা যায়। ফিক করে হাসলেন আমাদের ঠাকুর, কোনও ব্যাখা করলেন না, তারপর উধাও হয়ে গেলেন।"

এরপর দুই বন্ধুর দুই জাদরেল সহধর্মিণীর সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করছেন হুটকো হালদার। সনাতনের স্ত্রী তো রঙমহলে থিয়েটার দেখবার জন্যে ব্যগ্র। সপরিবারে থিয়েটার দেখতে রাজি করিয়েছেন স্বামীকে। সব দায়দায়িত্ব কিন্তু হুটকোদার।

পুঁটু ওরফে বিভাবতীর সঙ্গেও অনেকক্ষণ চুপিচুপি কথা হয়েছে হুটকোর। থিয়েটার দেখার প্রস্তাবটা ওখানেও বিপুল উৎসাহে পাস হয়ে গিয়েছে। পুত্র অশোককে হুটকো বললেন, "তুমিও আসছো। নর্থ ক্যালকাটায় থিয়েটার না দেখলে কলকাতার কিছুই দেখা হল না—সাধে কি আর ঠাকুর ঘুরঘুর করতেন।



বুকের মধ্যে প্রবল উত্তেজিনা লুকিয়ে রেখে রঙমহলের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন হুটকো। সামনেই ঘোষাল ফ্যামিলি মাইনাস ঘনশ্যাম। তার দেখা নেই। সোজা আপিস থেকে এখানে চলে আসবার কথা। বেল বাজার সময় হলো বলে। হুটকো জিজ্ঞেস করলেন

অশোককে, "তোমার বাবার কী ব্যাপার বলো তো ?" অশোক ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

ওদিকে হঠাৎ একটু দূরে সান্যাল ফ্যামিলিকে দেখা গেলো, মাইনাস সনাতন। একটা অপরাধ করেছেন হুটকো, ব্যাপারটা একটু আলো-আঁধারিতে রেখেছেন। অচলাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কর্তা কই ?" অচলার উত্তর, "এখানে তো সোজা আসবে।" বিভাবরী একটু বিরক্ত। "বাবার ব্যাপারই ওই ! লাস্ট মোমেন্টে কোনও কাজে ঠিক জড়িয়ে পড়বেন।"

হুটকো-গৃহিণীকে এবার নাটকের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে হলো। দু'দলই তাঁর নেতৃত্বে হলঘরের ভিতরে চলে গেলেন। কেবল হুটকো বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। গিন্নি জানেন কোন্ সিটে কাকে বসাতে হবে।

যা এখনও বলা হয়নি, কর্তারা যে আজ এখানে আসবেন না তা পূর্বপরিকল্পিত। অফিস ছেড়ে বেবুবার একটু আগেই ঘনশ্যাম অচেনা টেলিফোন কল পেয়েছেন, অন্য পার্টি এখনই কারখানায় বা অফিসে বড় রকমের হামলা চালাতে পারে। জরুরি পরিস্থিতির জরুরি মোকাবিলা করতে হবে, এখন থিয়েটারে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। হুটকো বেশ খুশি, পরিকল্পনামাফিক কাজ এগিয়ে চলেছে।

বিরতির সময় বেশ কয়েকটা খাবার প্যাকেট নিয়ে হুটকো হলের ভিতরে ঢুকেছেন। পুঁটুকে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, "মনে আছে ? বহু বছর আগে এখানে কারা এসেছিলেন ?" তখনও প্রিন্স অব ওয়েলস্‌টি ভূমিষ্ঠ হননি এ কথাও মনে করিয়ে দিলেন হুটকো। কতদিন কেটেছে কিন্তু তেমন কিছু পাল্টায়নি।

সেবারে এই হলে সনাতন ও মিত্রা খুব কাছাকাছি বসেছিল। এবারেও প্রেক্ষাগৃহের নাটক শুরু হলো। অচলা সান্যাল ও বিভাবতী ঘোষালের মধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে। বিভাবতী জানালেন, "হুটকোদা আমরা একই কলেজে পড়েছি, যদিও অচলা আমার এক বছরের জুনিয়র ছিল ! দু'জনেরই হিসট্রি ছিল, বিনীতা ব্যানার্জির কাছে বকুনি খেয়েছি।"

পুঁটু বললেন, "আমার ভীষণ বানান ভুল হতো, হুটকোদা।"

হুটকোদার তাৎক্ষণিক উত্তর, "দেখতে সুন্দর হলে বানান ভুলের জন্য লাইফে কিছুই এসে যায় না।"

হুটকো মনে মনে ভাবলেন, "কী আশ্চর্য, এতদিন একই শহরে সবাই বাসবাস করছে। অথচ আলাপ হয়নি মেমসায়েবদের।"

বিভাবরীকে হুটকো হাল্কা সুরে বলে রাখলেন, "মনে রেখো, তোমার নামটা আমিই পাঠিয়েছিলাম সুদূর বম্বে থেকে!"

বিভাবরী জিজ্ঞেস করলো, "হাওড়াতে আপনাদের নামগুলো অমন অদ্ভুত হতো কেন? গুঁইরাম, হাঁদু, হ্যাদা, হুটকো!"

"ইস্কুলের মাস্টারমশাই রেগেমেগে আমার নাম দিয়েছিলেন হুটকো। কিন্তু এখন বুঝি এর পিছনে গভীর তাৎপর্য রয়েছে। হুট করে এসেছি এই দুনিয়ায়, হুট করেই চলে যাবো, সুতরাং আমি অবশ্যই হুটকো।"

কথা শুনে সবাই খুব হাসলো প্রাণ খুলে।

ভাগ্য ভাল হুটকোর। দু' পার্টির টিকিটই যে হুটকো কেটেছেন চুপিচুপি তা কেউ বুঝতে পারেনি। ব্যাপারটা যেন ভবিতব্য! আর কর্তাদের শেষ মুহূর্তের অনুপস্থিতি কেমন রহস্যময় থেকে গিয়েছে। দুজনেই স্ত্রীকে বলেছেন, "আজ থিয়েটারে গেলে বিজনেসের বিপদ হতো। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেলো না, কোথাও কোনও ষড়যন্ত্র পাক খাচ্ছিল।"

হুটকো সেই রিপোর্ট পেয়ে মনে মনে বলেছেন, "অনেক সময় বিপদ থেকেও সুযোগ আসে, কাসুন্দের সবাই ঠাকুরের এই কথা জানে।"

অতএব তৎপর হও। সুতরাং প্রবল তৎপরতা চালিয়েছেন হুটকো, তবে দুই বন্ধুর মধ্যে নয়, তাঁদের গৃহিণীদের মধ্যে।

দুই বন্ধুকে হুটকো তাতিয়েছেন, "এমনভাবে অন্যপক্ষকে হারাতে হবে যেন আর কখনও তারা জেতবার কথা না ভাবে! যাকে বলে কিনা মোক্ষম হারানো।"

আর গৃহিণীদের হুটকো জিজ্ঞেস করেছেন, "কেমন বুঝছেন।"

বিভাবতী বলেছেন, "মেয়েটি তো চমৎকার !"

হুটকো চুপি চুপি বিভাবতীকে বলেছেন, "কর্তা তো ওই মেয়েকে নিজের কোম্পানিতে ভাঙাবার চেষ্টা করছেন, নট নোয়িং যে মেয়েটি সান্যাল ফ্যামিলির মেয়ে।"

অচলা অকপটে স্বীকার করেছেন, "ছেলেটি খুব ভাল। বাপ-মা কপাল করে এসেছে।"

হুটকোর পরামর্শ, "কর্তাকে তাতান—ওই ছেলেও আমরা ওদের হাত থেকে কেড়ে নেবো।"

অচলা প্রবল উৎসাহ বোধ করছে। সে বলছে, "আজেবাজে রাগ দেখিয়ে তো লাভ নেই, হুটকোদা। এই মেয়ের বিয়ে তো আমাকেই দিতে হবে। ওঁর তো ওসব খেয়াল নেই, স্রেফ সারাক্ষণ ঘোষালদের সঙ্গে টেক্কা দিচ্ছেন।"

এবার একটু ভয় ধরেছে হুটকোর। "এই যে ওর অজান্তে পাত্রপাত্রী থিয়েটার দেখে এলো তা শুনলে সনাতন আমাকে আস্ত রাখবে না।"

এবারে অচলা ফোঁস করে উঠলো। "করুক না কিছু আপনাকে, হুটকোদা।"

"যদি তেমন বিপদে পড়ে যাই তাহলে তুমি একটু মা চণ্ডীর রূপ দেখিয়ে দিও, অচলা," বললেন হুটকো হালদার।

অচলা বললো, "সব ফাঁস করে দেবো। নিজের বিয়ের সময় কনে দেখা হয়েছিল কোথায় ? আপনার বন্ধুই আমার মামাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, নিয়ে এসো এই রঙমহলে। তারপর তো হাজার কথাবার্তা হলো দু' পক্ষে—বাঙাল ঘটির বিয়ে তো সহজ কথা নয় !"

বলাবাহুল্য, হুটকো তখনও ভাবতে পারছেন না, দুই পক্ষ কোনও ব্যাপারে ভুলেও একমত হবেন। কিন্তু দুই গৃহিণী ব্যাপারটা চমৎকার বুঝে গিয়েছেন। হুটকোর দেওয়া আইডিয়াটা ভীষণ ভাল লেগে গিয়েছে। "এমন সুযোগ মরে গেলেও ছাড়ছি না," ঘোষণা করেছেন *বিভাবতী ঘোষাল ও অচলা সান্যাল।*



শেষপর্যন্ত যা হয়ে থাকে তাই হলো!

শুভবিবাহের কার্ডের ডিজাইন করতে গিয়ে দু' পক্ষের বিজ্ঞাপন এজেন্সির মেমসায়েবদের ফেন্ট হবার অবস্থা! ঘনশ্যাম ঘোষালের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে সনাতন সান্যালের একমাত্র কন্যার বিবাহ! এতো অসম্ভব!

অনেক ভেবেচিন্তে মিজ দামানিয়ার মন্তব্য : "ক্লায়েন্টের সিদ্ধান্তর সমালোচনা আমাদের এজেন্সিতে কখনওই করা হয় না। মনে রাখতে হবে, এইটাই আন্তর্জাতিক ট্রেন্ড—এর নাম স্ট্রাটেজিক অ্যালায়েন্স—দুই বিরোধী পক্ষের সংঘাত নয়, দু'জনের কৌশলগত মিলন। অ্যালায়েন্স ও মার্জার! দুনিয়াতে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কিছুই থাকবে না, সব বিজনেস মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে।"

বিবাহবাসরে সনাতন সান্যাল তাঁর প্রিয় বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাই হুটকো, কে শেষপর্যন্ত জিতল বলো তো?"

"অবশ্যই তুমি," উত্তর দিলেন হুটকো। "ঘোষালেরা বাঙাল জামাই করেনি, কিন্তু বাঙালকে বউমা করতে বাধ্য হলো।"

ঘনশ্যামও একই প্রশ্ন করলেন তাঁর স্কুলজীবনের বন্ধুকে। "হুটকো, আমি কি হেরে গেলাম?"

হুটকো হুঙ্কার ছাড়লেন, "ঘনশ্যাম, তুমিই হিরো—জিততে এসে সনাতন সান্যাল তোমার কাছে গোহারান হেরে গেলো। কে না জানে এদেশে ছেলেরাই সব।"

দুই বন্ধুকে একই কথা বলে হাওড়া কাসুন্দের হুটকো হালদার এবার দেওয়ালে টাঙানো ঠাকুরের ছবিতে কপাল ঠেকালেন এবং তারপর হা-হা করে হাসতে হাসতে বললেন, "ওরে আমাকে একখানা এস-বি-জি এবং একখানা স্যানটান বিস্কুট দে। ঠাকুরকে নিবেদন করে আমি নিজেই উপবাস ভঙ্গ করবো।"

